মনোজ বসুর

॥ গল্প-সংগ্রহ ॥

প্রথম খণ্ড

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড । কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ—ফাল্গুন, ১৩৬৪

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলকাতা ১২

মুদ্রক—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদ-চিত্র
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই
বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

সূচীপত্র

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরে বাংলাসাহিত্যের ছোটগল্পের বহু-বিচিত্র ও বহু-শাখায়িত অগ্রগতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাহিত্যের এই বিশেষ বিভাগটিকে যাঁরা জীবন-রসের গভীর অভিজ্ঞতায় ও বিচিত্র-ভঙ্গিম আঙ্গিক উদ্ভাবনে এক সার্থকতর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন, মনোজ বসু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রায় ত্রিশ বছরের সুদীর্ঘ সাধনায় ছোটগল্পের বহুমুখী কলাবিধি ও বিচিত্রবিষয়াশ্রয়ী জীবন-রসিকতায় তিনি বাণীসিদ্ধ।

যেকালে তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন, তখন প্রচলিত জীবনাচরণের বিরুদ্ধে তৎকালীন তরুণতর লেখক সম্প্রদায়ের মনে এক প্রবল বিদ্রোহ বহ্নিমান হয়ে উঠেছিল। একদিকে যুদ্ধোত্তর যুগের সংশয়াতুর মানসিকতা, অন্যদিকে পশ্চিমী দর্শন-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রভাব বাংলাসাহিত্যের তরুণ পথিকদের সামনেও নবজীবনের এক প্রতিশ্রুতি এনেছিল। নাগরিক জীবন ও নগর-নির্ভর মধ্যবিত্তের জীবন একালের শিল্পী-মানসে নূতন রূপ নিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। 'কল্লোল যুগ'-এর খ্যাতকীর্তি কাহিনীকারের ভাষাতে বলা যাক: "'কল্লোল' যে রোমান্টিসিজম খুঁজে পেয়েছে সহরের ইট-কাঠ লোহা-লক্কড়ের মধ্যে, মনোজ তাই খুঁজে পেয়েছে বনে-বাদায় খালে-বিলে পতিতে-আবাদে। সভ্যতার কৃত্রিমতায় 'কল্লোল' দেখেছে মানুষের ট্র্যাজেডি, প্রকৃতির পরিবেশে মনোজ দেখেছে মানুষের স্বাভাবিকতা। একদিকে নেতি, অন্যদিকে আপ্তি। যোগবলের আরেক দৃপ্ত উদাহরণ মনোজ বসু।"

মনোজ বসু নিঃসন্দেহে গ্রাম-বাংলার দরদী রূপকার। এই পরিচয় নিয়েই বাংলাসাহিত্যে তাঁর উজ্জ্বল আবির্ভাব। কিন্তু গ্রাম-বাংলার রূপ-রস লালন যদিও তাঁর মনের গভীরে একটি স্নিগ্ধ-শ্যাম লাবণ্য-রেখা এঁকে দিয়েছে, তবুও পরবর্তীকালে তাঁর দৃষ্টির পরিধি প্রসারিত হয়েছে—দেশ-কালের নানা রূপান্তর তাঁর গল্পগুলির মধ্যেও সেই চলমান জীবনেরই ঐশ্বর্য ছড়িয়েছে। তবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি

ও প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ মানুষের সহজ সুখ-দুঃখের কাহিনী তাঁর কুমারী-লেখনীকে সর্বপ্রথম আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা-ব্যর্থতার জোয়ার-ভাটায় স্পন্দিত করে তুলত। নদী-মাতৃক বাংলা—তারই এক গ্রামাঞ্চল, যেখানে 'ঋতুতে ঋতুতে বিলের রূপ' বদলায়—ধানক্ষেত আর শাপলা-কলমির অজস্রতা যেখানে রূপের আলো ছড়ায়। নাগরিক জীবনের বিষনিঃশ্বাসী বাতাস যেখানকার বাতাসকে কলুষিত করতে পারে নি, আর যেখানকার লোকজীবনকে রূপ দিয়েছে যাত্রা-ভাসান ও কবিগানের অন্তরঙ্গ সুর।

সাহিত্য-সাধনার এই প্রাথমিক পর্বের কথা বলতে গিয়ে মনোজ বসু সেই রূপকথা-স্নিগ্ধ কাহিনী শুনিয়েছেন : "এই বিল ও বিলের প্রান্তবর্তী মানুষগুলো তাদের সুখ-দুঃখ আশা-উল্লাস নিয়ে আমার মন জুড়ে রয়েছে। বিশাল বাংলাদেশকে চিনেছি আমি এদের মধ্য দিয়ে। এদের বিরহে বিষাক্ত হয়ে উঠত শহরের কলেজি জীবন। হঠাৎ মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে এদের মধ্যে অজ্ঞাতবাসে যেতাম। যেন ইট-পাথরের শুকনো ডাঙা থেকে ডুবসাঁতার দিতে যেতাম জীবনের রস-প্রাচুর্যের ভিতর। আলাদা ছিলাম না তাদের থেকে। তাদের কথা বলতাম, গল্প লিখতে গেলে প্রতিটি ছত্রে তারাই এসে উঁকি-ঝুঁকি মারত। এমনি করে তাদের মানস-সান্নিধ্য লাভ করতাম আমি, নাগরিক নিঃসঙ্গতার বেদনা ভুলে যেতাম। চোখের কত অশ্রু অন্তরের কত উল্লাস মিশিয়ে যে আমার সেই আমলের গল্পগুলোর সৃষ্টি !"

লেখকের এই মুগ্ধমনের আত্মকাহিনী তাঁর মানসলোকের মর্মবাণীকেই রূপায়িত করেছে। দক্ষিণ-বাংলার জনপদ-জীবনকে ঘিরেই তাঁর জীবনদৃষ্টি নূতন নূতন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে জয়যুক্ত হয়েছে। তাঁর মানুষগুলিও স্বাভাবিক ও অরুগ্ন—মানসিক রুগ্নতায় তারা বিকৃত ও বিবর্ণ হয়ে ওঠে নি। প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্য, জীবনের সহজ রস ও অবিকৃত সুস্থ মানুষ—মনোজ বসুর ছোটগল্পগুলি এই তিনের সমন্বয়ে রসলোকের এক ত্রিবেণী-তীর্থ।

॥ ২ ॥

'বনমর্মর' মনোজ বসুর সর্বপ্রথম গল্প-সঙ্কলন। এই গ্রন্থটিতে নটি গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। প্রথম গল্প 'বনমর্মর' লেখকের মনোজীবনের স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করেছে। বনের মর্মরধ্বনির নিগূঢ় অন্তঃপুরে যে আলো-আঁধারের রহস্য-

নিকেতন আছে, তাকেই তিনি এক কবিত্বময় সঙ্কেত-ভাষণে রূপ দিয়েছেন। রহস্যময় আরণ্যক-জগৎ শঙ্কর-ডেপুটিকে হাতছানি দিয়ে আহ্বান করেছে—একালের মানুষ সেই আদিম আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। রহস্যময় আরণ্যক পৃথিবী চারশো বছর আগের ভৌমিক-বাংলার প্রেম ও বীরত্বের স্মৃতি-রঞ্জিত একটি কাহিনীর যবনিকা উন্মোচিত করেছে। দক্ষিণ বাংলার রূপকথা-উপকথা-জনশ্রুতি-কিংবদন্তী মনোজ বসুর শিল্পদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। জনশ্রুতি-কিংবদন্তী ইতিহাস নয় সত্য, কিন্তু লোকজীবনের দীর্ঘকালের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জড়িত হয়ে এর একটি স্বতন্ত্র রসমূল্য তৈরী হয়। 'বনমর্মর' ইতিহাসের রাজপথের নয়, গলিপথের কাহিনী। কিন্তু চারশো বছরের বিস্মৃতির কালো যবনিকার আড়ালে তরুণ জানকীরাম ও তরুণী বধূ মালতীমালার কাহিনীকে লেখক এক চিরন্তন স্মৃতি-বেদনার তীর্থে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সঙ্গীত ও চিত্রের টানা-পোড়েনে গল্পটির লঘুস্পর্শ সূক্ষ্ম-চিকন বয়ন-কৌশলটি সহজেই চোখে পড়ে। স্মৃতি-রোমাঞ্চিত রাত্রির প্রহরগুলি রোমান্সলোকের আস্বাদনে ভরে উঠেছে—যেন একটি চিত্ররূপময় গীতি-কবিতা: "ঐ যেখানে আজ পুরানো ইটের সমাধিস্তূপ, ওখানে বড় বড় কক্ষ অলিন্দ বাতায়ন ছিল, উহারি কোনোখানে হয়তো একদা তারা-খচিত রাত্রে ময়ূরপঙ্খীর উচ্ছ্বসিত বর্ণনা শুনিতে শুনিতে এক তন্বঙ্গী রূপসী রাজবধূর চোখের তারা লোভে ও কৌতুকে নাচিয়া উঠিতেছিল, শব্দ হইবে বলিয়া স্বামী হয়তো বধূর পায়ের নূপুর খুলিয়া দিল, নিঃশব্দে খিড়কি খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া দুইটি চোর সুপ্তপুরী হইতে বাহির হইয়া ঘাটের উপর নৌকায় উঠিল, রাজবাড়ির কেউ তা জানিল না। ফিসফাস কথাবার্তা……স্বচ্ছ মেঘের আড়ালে চাঁদ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল……শব্দ হইবার ভয়ে দাঁড়ও নামায় নাই……এমনি বাতাসে বাতাসে ময়ূরপঙ্খী মাঝদীঘি অবধি ভাসিয়া চলিল"—

গল্পটির পূর্বাপর একটি সূক্ষ্মসার গীতিরসের স্পন্দন। অরণ্যভূমির আলো-ছায়া-সঙ্কেতে নেপথ্যলোকের রস-রহস্য পত্নীহারা শঙ্করের স্মৃতি-চারণার সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে। গল্পটির আর-একটি উল্লেখযোগ্য দিক আছে। শঙ্কর-সুধারানীর দাম্পত্য-জীবনের সংক্ষিপ্ত অথচ সুখ-স্নিগ্ধ খণ্ডচিত্রটি নিঃসন্দেহে এই অতীতচারী স্বপ্নাবেশকে গাঢ়তর করে তুলেছে। জানকীরাম-মালতীমালার চারশো বছর আগেকার জীবননাট্যের দ্রষ্টা শঙ্কর। শঙ্করের ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনীটুকু বাস্তব পৃথিবী ও কল্প-পৃথিবী, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে

যোগসূত্র স্থাপন করেছে। এই অতিসূক্ষ্ম ভিত্তির ওপরে গল্পটি দাঁড়িয়ে আছে।

তবু প্রকৃতিই গল্পটির আসল নায়িকা—মালতীমালা বা সুধারানী নয়—আর শঙ্কর তো এই অন্তরগূঢ় রহস্যলোকের দ্রষ্টামাত্র। প্রকৃতি আদিম—তারই কোলে যুগ-যুগান্তরের মানব-নাট্য অভিনীত হয়। তাই অরণ্যমর্মরে নিত্যকালের মানবমনের বাসনাগুলিই মর্মরিত হয়ে ওঠে। মানব-জীবন-রহস্যও লেখক প্রকৃতির সেই আদিম প্রাণসত্তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন: "ভাবিল, সেদিনের সেই সুধারানী, তার হাসি চাহনি, তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রত্যেকটি স্পন্দন পর্যন্ত এই জগৎ হইতে হারায় নাই—কোনখানে সজীব হইয়া বর্তমান রহিয়াছে, মানুষ তার খোঁজ পায় না। ঐ-সব জনহীন বন-জঙ্গলে এইরূপ গভীর রাত্রে একবার খোঁজ করিয়া দেখিলেই হয়।" প্রকৃতির নিগূঢ় মর্মমূলের মধ্যে চিরন্তন মানব-লীলারসের উপলব্ধিতে ও অতি-প্রাকৃত রহস্যলোকের উদ্ঘাটনে এই গল্পটি লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠগল্পের পর্যায়ভুক্ত।

এই সঙ্কলনটির 'প্রেতিনী' গল্পটিও অতি-প্রাকৃত রসের। কিন্তু এর পরিবেশ রচনায় লেখককে কোনো বিশেষ ধরনের আয়োজন করতে হয় নি। সাহিত্যে অতি-প্রাকৃত রস ফোটাতে গেলে অনেক সময় এক অপরিচিত ও রহস্যময় পটভূমিকা সৃষ্টি করতে হয়। কোলরিজ অতি-প্রাকৃত রসের খ্যাতনামা শিল্পী, কিন্তু তিনিও এই রস ফুটিয়ে তোলার জন্য মেরুপ্রদেশের অপরিচিত সামুদ্রিক পরিবেশ কিংবা মধ্যযুগের প্রাচীন প্রাসাদের রহস্য-নির্জন পটভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন। 'প্রেতিনী' গল্পে অতি-প্রাকৃত শিহরণটিকে লেখক আমাদের পরিচিত পৃথিবীর মধ্যেই ফুটিয়ে তুলেছেন। হরিচরণের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী প্রভা। প্রভার চরিত্রটি এই স্বল্প-পরিসর গল্পটিতে চমৎকার ফুটেছে। প্রভার ছেলেমানুষী ভাব ও সহজ হৃদয়াবেগের মধ্যে কোথায় যেন একটি প্রচ্ছন্ন বেদনা ছিল। স্বামীর সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে অভিমানের ভেতর দিয়ে একটি তীব্র তিক্ত অভিযোগের কথাও যেন শোনা যায়। তাই তার মৃতা সপত্নীর গল্প শোনার ফাঁকে ফাঁকে একদিকে সে যেমন মৃতার প্রতি একটি তীব্র আকর্ষণ ও সহানুভূতি অনুভব করেছে, তেমনি অভিমান-ক্ষুব্ধ হৃদয় অভিযোগের ভাষায় মুখর হয়ে উঠেছে: '—জানি, জানি, তোমরা তা খুব পার। তোমরা ভালোবাস না ছাই! সব মুখস্থ-করা কথা। আজ যদি ঝড় ওঠে, নৌকো ডুবে যায়, আমি মরি—কালকেই আর একজনের সঙ্গে কত

সোহাগ হবে ! তখন আমার কথা কেউ বলতে গেলে অমনি মুখ চেপে ধরবে'—

প্রভা তার মৃতা সপত্নী সরযূর প্রতি এক গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছে—তাই কলমিডাঙার পথ দিয়ে যখন তাদের নৌকো যাচ্ছিল তখন সে 'দিদির বাপের বাড়ি' যাওয়ার জন্য আবদার শুরু করেছে। বটতলার শ্মশানঘাটে সরযূর প্রেতমূর্তি আবির্ভূত হওয়ার কাহিনী গল্পটির মধ্যে আকস্মিকভাবে এক প্রেত-পিঙ্গল পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। বাঁশঝাড়ের মাথায় বাতাসের আর্তধ্বনি, চারদিকে নীরন্ধ্র অন্ধকার, আকাশে ঘনঘটা ! হরিচরণ তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য বলেছে : 'যাকে-তাকে এ-কথা বলা যায় না কি ? ও তোমাকেই শুধু বললাম—বুঝলে প্রভা, সে শুধু তোমার নামেই সতীন, ভালোবাসার ভাগ পায় নি'—এই একটি সাধারণ উক্তির সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে একটি মর্মভেদী হাহাকার শোনা যায়—যেন সরযূর প্রেতমূর্তি স্বামীর ভালোবাসার জন্য এখনো কেঁদে বেড়ায়। সরযূর প্রেতমূর্তি নিঃসন্দেহে হরিচরণের মনের সৃষ্টি—তার পূর্বতন ভৌতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে একজাতীয় অপরাধী-চেতনা মর্ত্য-প্রেম-লোলুপা প্রেতিনীর আবির্ভাব ঘটিয়েছে। 'সরযূর ভূত' প্রভার ঘাড়েই শুধু চাপে নি, হরিচরণও যে কখন অজ্ঞাতসারে সেই ভৌতিক অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তা নিজেও বুঝতে পারে নি। সরযূর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যে প্রেতমূর্তি বটতলার শ্মশানঘাটে দেখা গিয়েছিল তা নিতান্তই স্থুল ও বহিরাশ্রয়ী, কিন্তু দ্বিতীয়বার প্রেতমূর্তিদর্শন হরিচরণের অপরাধী মনের অন্তর্লোকের সৃষ্টি—সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্বসম্মত। গল্পটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' গল্পটির তুলনা করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গল্পের শরবৎ ঋজুতা, বাহুল্য-বর্জিত ক্ষিপ্রগতি ও কবিকল্পনার অনন্যতা এখানে না থাকলেও গ্রাম-বাংলার পরিচিত পরিবেশের মধ্যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের ইঙ্গিত-রেখায় অতিপ্রাকৃত সত্যটি অপরূপ হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের মধ্যে বাংলার স্তিমিত-মন্থর গৃহজীবন ও নীড়াশ্রয়ী মানুষের প্রীতি-মধুর সম্পর্ক-বৈচিত্র্যের লাবণ্য-মণ্ডিত রূপটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মনোজ বসু বাংলা ছোটগল্পের সেই মহৎ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার পেয়েছেন। 'অশ্বত্থামার দিদি' গল্পটিতে বাঙালীর গৃহ-জীবনের

সেই করুণ-সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে। মজুমদার-স্টেটের সাত আনা শরিক স্বর্গীয় যতুনাথ মজুমদার উজ্জ্বলপুরে খাজনা আদায় করতে এসে দরিদ্রঘরের রূপসী কন্যা উমাকে পছন্দ করে তাকে পুত্রবধূ করে ঘরে আনলেন। বালিকা উমার আবাল্য সঙ্গী ছিল তার ছোট ভাই হারান। বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ি আসার আগে উমা তার ভাইটিকে আশ্বাস দিয়ে এসেছিল যে সে বড় হলেই তাকে নিয়ে এসে রুইমাছের মাথা দিয়ে ভাত বেড়ে দেবে। কিন্তু দীর্ঘ তিন বছরের মধ্যে উমা তার বাপের বাড়ি যায় নি, হারানও তার দিদির বাড়ি আসে নি। কালীপুজোর রাত্রিতে তিলসোনার মজুমদার-বাড়িতে যাত্রাগানের আয়োজন হয়েছে। চিকের আড়াল থেকে উমা অশ্বত্থামার অভিনয় দেখে চোখের জল ফেলছিল। যাত্রার দলের অশ্বত্থামাবেশী সুন্দর ছেলেটি দুধের জন্য যখন কান্নাকাটি শুরু করেছিল, তখন উমার মনে হল তার গরিব অবোধ ভাইটিই বোধ হয় দুধের জন্য কাঁদছে। যাত্রাদলের লোকেরা যখন খেতে এল তখন তার শিশুপুত্রের জন্য রক্ষিত দুধটুকুও অশ্বত্থামাকে দিয়ে দিল। পল্লীগ্রামের যাত্রাদলের একটি বাস্তবসম্মত ছবি ফুটে উঠেছে। বাংলার পারিবারিক জীবনের সহজ-সুন্দর পরিবেশের মধ্যে ভ্রাতৃস্নেহের নির্মল রসধারাকে লেখক একটি স্নিগ্ধ-সহজ সহানুভূতির সঙ্গে রূপ দিয়েছেন।

'বাঘ' গল্পটিতে পল্লীজীবনের সহজ নিস্তরঙ্গ প্রবাহের মধ্যে যন্ত্র-জীবনের প্রতীক গ্রামোফোনের আকস্মিক আবির্ভাব যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে, তারই বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। হরসিত পরামানিক এক গ্রামোফোন নিয়ে এসে পল্লীজীবনের মধ্যে তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে। গ্রামের সহজ-বিশ্বাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে মুগ্ধ করে বেশ দু-পয়সা রোজগার করেও নিচ্ছে। এই কলের গানকে কেন্দ্র করে পল্লীর মানুষের বিচিত্র আচার-আচরণের কৌতুক-সমুজ্জ্বল বর্ণনা করা হয়েছে। গল্পটির এক কোটিতে হরসিত পরামানিকের কলের গান, আর এক কোটিতে সঙ্গীত-রসিক তিনকড়ি বাঁড়ুজ্জের বেদনাময় কাহিনী। চকমিলানো প্রকাণ্ড বাড়িটা মানুষের অভাবে খাঁ খাঁ করে—তিনকড়ি বাঁড়ুজ্জে, তাঁর স্ত্রী ও মা-হারা দৌহিত্র মণ্টু—এই তিনজন সেখানকার অধিবাসী। বৃদ্ধ এখনও সুখে-দুঃখে তাঁর জীবনের প্রিয় সঙ্গী সেতারটি নিয়ে বসেন। কিন্তু কলের গান—'কোম্পানি বাহাদুরের কল'—বাঁড়ুজ্জের এতদিনের নির্ধারিত আসনটি আজ কেড়ে নিয়েছে। এমন কি তাঁর দৌহিত্র বালক মণ্টুও তাঁকে সেই কথাই শুনিয়ে যায়। এই তুলনামূলক ব্যঞ্জনা গল্পটির প্রাণ।

গল্পের শেষে নেত্যঠাকরুনের ঘটি চুরির ব্যাপারটি একটি প্রবল অ্যান্টি-ক্লাইমেক্সের মতো। গল্পটি একটি স্কেচ বা নক্শাশ্রেণীর।

'স্বাজা' গল্পটিতে দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনের নিষ্ঠুর ছলনার অভিনয় এক অপূর্ব শিল্পসম্পূর্ণতায় অভিব্যক্ত হয়েছে। সুধীর অনেকদিন পরে বাড়ি আসার সংবাদ দিয়েছে। তার সেই পত্রাংশটুকুকে কেন্দ্র করেই কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। পুত্রগর্বে স্ফীত পিতা নিবারণ পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে সুধীরের ঐশ্বর্যের লম্বা-চওড়া বর্ণনা দিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। সুধীরকে ধরলেই যে সে অনায়াসে কলকাতায় চাকুরি দিতে পারে, এ কথা বলতেও ভোলে না। বধূ কিরণও স্বামীর এই অভাবিত সম্পদের কথা মনে করে শূন্যে স্বপ্ন-সৌধ রচনা করে। সুধীর গম্ভীর ও ম্লানমুখে বাড়ি এসেছে—সামান্য চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি সে পেয়েছিল, কিন্তু সাতদিন হল তার নোটিশ হয়েছে। অথচ তার বাবা নিবারণ গ্রামের মধ্যে পুত্রের সৌভাগ্যের কথা এত অতিরঞ্জিত করে বলেছে যে, একদিনের মধ্যেই সুধীরের প্রাণান্ত অবস্থার উপক্রম। কারও ছেলের চাকরি করে দিতে হবে, ড্রামাটিক ক্লাবের ড্রেস কিনে দিতে হবে—এই-জাতীয় আবদারে সুধীরের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল। এমন কি কিরণ পর্যন্তও স্বামীর প্রকৃত অবস্থা জানে না, অবোধ বধূ কলকাতা যাওয়ার স্বপ্ন রচনা করেছে। সেই রাত্রিতেই সকলে ঘুমিয়ে পড়ার পর সুধীর তার প্রকৃত অবস্থার কথা জানিয়ে কিরণকে একখানি চিঠি লিখে নগদ সাত সিকে পয়সা নিয়ে গৃহত্যাগ করেছে।

গল্পটিতে ছোটগল্পের আঙ্গিকটি নিপুণ রেখায় অঙ্কিত হয়েছে। একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে গল্পটি দানা বেঁধে উঠেছে, পল্লবিত হয়েছে—সমাপ্তও হয়েছে একখানি চিঠিতে, এ যেন সমে ফিরে আসা। গল্পটি কেন্দ্র-সংহত, নিটোল ও বিন্দুবৃত্ত। খাঁটি ছোটগল্পের একটি আশ্চর্য-সুন্দর উদাহরণ। নিবারণের অসম্ভব উক্তি ও বিস্মিত গ্রাম্য মানুষের প্রতিক্রিয়া যে কৌতুককর আনন্দোচ্ছল পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল, সুধীরের শেষ চিঠিতে তা বেদনায় বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। লেখক কৌতুককর অসঙ্গতিগুলির অন্তরালে অদৃষ্ট-বিড়ম্বিত জীবনের তিক্ত পরিহাসকে একটু ইঙ্গিত করেছেন মাত্র। সেই স্বল্প-সঙ্কেত-সূত্রটিই গল্পটিকে ঘনবদ্ধ করে তুলেছে।

'উপসংহার' গল্পটি হালকা সুরের। নবগোপালের কাব্যপ্রিয়তা নিয়ে গল্পটিতে কৌতুক করা হয়েছে। নবগোপাল কবিতা লেখে, কিন্তু লোহার

ব্যাপারী প্রৌঢ় জনার্দন সেনের মতো তার কবিতার এমন ধৈর্যশীল শ্রোতা আর নেই। গল্পটিতে আর একটি চরিত্র আছে—জনার্দনের কন্যা কাতু। জনার্দন হিসেবী মানুষ—নবগোপালকে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মিথ্যে উৎসাহও দিয়ে থাকে। কাতুর বিবাহকে কেন্দ্র করে জনার্দন ও তার গৃহিণীর প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। গল্পটির কৌতুকরস একটি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে পরিণত হয়েছে, কাতুর সর্বশেষ রহস্যময় ব্যবহারটির মধ্যে হয়তো নূতন আর এক অধ্যায়ের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু লেখকের সংযত লেখনী সেইখানেই দাঁড়ি টেনে দিয়েছে। বেশী বিশ্লেষণে ছোটগল্পের ইঙ্গিতময়তা ও কাহিনী-বিন্যাসের সরলতা নষ্ট হতে পারত।

মিষ্টি-মধুর দাম্পত্য-জীবনের রোমান্স রচনায়ও মনোজ বসু কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। জীবনের অতলান্ত রহস্য-জিজ্ঞাসা যেমন তাঁকে প্রশ্ন-চঞ্চল করে তুলেছে, তেমনি ওই জীবনেরই উপরিভাগের লীলা-ললিত স্রোতরেখা ও মৃদু কলতান তাঁকে মুগ্ধ করেছে। 'রাত্রির রোমান্স' গল্পটি এক তরুণ দম্পতির কূজন-গুঞ্জন ও প্রেম-অভিমানের একটি রস-মধুর আলেখ্য। উষা ও মনোময়ের নৈশ আলাপনটিই গল্পটির প্রধান অংশ জুড়ে আছে। উষা মনোময়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চায়—কারণ সারাদিনের গৃহকর্মের মধ্যে এইটুকুই মাত্র অবকাশ। মনোময়ের দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে অগত্যা রুদ্ধ অভিমানে গোবর্ধন পালিতের 'অদৃষ্টের অভিশাপ' পড়তে থাকে। উপন্যাসের নায়িকার অনুসরণে সে প্যাডের কাগজে 'চিরবিদায়' কথাটি লিখে রেখে স্বামীর শয্যাত্যাগের বহু পূর্বেই রান্নাঘরে আশ্রয় নিয়েছে। মনোময়ও এই চিঠি পেয়ে বিব্রত হয়ে এঘর সেঘর খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে রান্নাঘরে উষাকে আবিষ্কার করেছে। সে তখন ননদ রাধারানীর সঙ্গে লঙ্কা-লবণ সহযোগে কাঁচা আম 'নিঃশব্দ মনোযোগের' সঙ্গে আহারে ব্যস্ত। বাঙালীর পারিবারিক জীবনের এইজাতীয় প্রসন্ন-মধুর কৌতুক-রসোচ্ছল চিত্র রচনায় লেখকের দক্ষতা অনস্বীকার্য।

'পিছনের হাতছানি' গল্পটি একটি স্নিগ্ধ-সুকুমার স্মৃতিরসের কাহিনী। জীবন-যুদ্ধে সিদ্ধকাম গিরিজার অতীত স্মৃতিসূত্রটি ধরে একটি নিটোল কাহিনী গড়ে উঠেছে। পিতৃহীন গিরিজা একদা তার মাতুলালয়ে স্থান পেয়েছিল, সেখান থেকেই সে এণ্ট্রান্স পাশ করে কাকিনাড়ায় পাটকলের চাকরিতে

ঢুকেছিল। আজ সে সেখানকার বড়বাবু। গৃহিণী সুমতি ও পুত্রকন্যা নিয়ে তার বাড়ির চালচলন আজ বড়লোকের মতো। একটি চিঠির ওপর নির্ভর করেই গল্পটি রচিত হয়েছে। চিঠিখানি মনোরমার ওরফে পুঁটির। পুঁটির বাবা সীতানাথবাবুর বাড়িতেই তার মামা একসময় গোমস্তার কাজ করত। স্বামীকে চাকরি দেওয়ার জন্য পুঁটি চিঠি লিখেছে। সেই চিঠিখানি ঘিরে গিরিজার অতীত জীবনটি মূর্ত হয়ে উঠেছে। ছাত্রজীবন, এণ্ট্রান্স পাশ করার পর সীতানাথবাবুর আপ্যায়ন, পুঁটির সঙ্গে তার বিয়ের কথাবার্তা, বালিকা পুঁটির শিশুসুলভ দুষ্টুমি ও চাঞ্চল্য, নিজের আকস্মিক বিবাহ, পুঁটির বিবাহ-সম্পর্কিত খুঁটিনাটি কথা—সমস্তই গিরিজার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

অতীত-স্মৃতি-ঘেরা পল্লীকাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে অতি-আধুনিক নাগরিক জীবনের সুরটিও শোনা যায়। মেয়েদের গানের মাস্টার এসেছেন, অর্গ্যান বেজে ওঠে,—অর্থী-প্রার্থীদের স্তূপীকৃত আবেদনপত্রে টেবিল ভরে ওঠে। এই দু-জগতের ব্যবধানকেও গল্পটির মধ্যে সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। বিত্ত-কৌলীন্যের শীর্ষস্থানে বসে তাই গিরিজা অতীত দিনের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে। গিরিজা ভেবে পায় না কেন পুঁটির স্বামী এখানে আসছে, সেখানে তার কিসের অভাব? সে ভাবে 'যদি সত্যই পুঁটির সঙ্গে তার বিবাহ হইয়া যাইত, অভাবের মধ্যে পুঁটি ঝগড়া করিত, কাঁদাকাটি করিত, তবে বড় অসহ্য হইলে ছাতা মাথায় সে পাটের ক্ষেতের ধারে গিয়া বসিত, তবু নীলমণির মতো এখানে ধরনা দিতে আসিত না।' গিরিজার মনে হয়েছে চাকরির চেয়ে ভূষণডাঙার পাটের মরসুম অনেক বেশী মূল্যবান! অতীত স্মৃতির রোমন্থনের ভেতর দিয়ে নাগরিক জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি ও বিত্ত-কৌলীন্যও সুখ-দুঃখমিশ্রিত পল্লীজীবনের তুলনায় নিষ্প্রভ হয়ে উঠেছে।

'ফার্স্ট বুক ও চিত্রাঙ্গদা' গল্পটি একটু নূতন ধরনের। দুটি প্লট এখানে একসূত্রে গেঁথে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। পশুপতি দরিদ্র ও আদর্শবাদী শিক্ষক—বৈচিত্র্যহীন জীবনের মধ্যে বিন্দুমাত্র সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্পনার অবকাশ নেই। রামোত্তম রায়ের পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হওয়ার পর তাদের কাছারিঘরের পাশের সঙ্কীর্ণ ঘরখানিতে সে আশ্রয় পেয়েছে। গৃহিণী প্রভাসিনী অভাব-অনটনের কথা জানিয়ে চিঠি দেয়, ছোট ছেলে কমলও বড় বড় অক্ষরে বাবার কাছে ছবির বইয়ের জন্য আবদার করে। ছবির বইয়ের

কথায় পশুপতির মনে পড়েছে অনেকদিন আগের একটি ঘটনা। 'চিত্রাঙ্গদা' বই কিনে সে ছোট্ট একটি মেয়েকে সেই পাঁচটাকার বই দিয়ে এসেছিল—দীর্ঘকাল পরে তার সেই ঘটনাটাই মনে পড়েছে। ঝড়-বৃষ্টির রাত্রিতে তার ঘরে সুরেশ ও লীলার আকস্মিক আবির্ভাব ও অন্তর্ধান, পশুপতির শুষ্ক গদ্যাত্মক জীবনের মধ্যেও সুরভিত রোমান্সের সৃষ্টি করেছে। বিশ বছরের বিস্মৃতির ওপার থেকে বহুদূরবর্তী পশর নদীর তীরে তার নিজের সদ্যবিবাহিত জীবনের কবোষ্ণ আস্বাদনের কথাও মনে পড়েছে।—তরুণ দম্পতির ক্ষণিকের উপস্থিতি তার নিজেরই দাম্পত্য-জীবনের সুখ-স্মৃতির কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ তার মনে হয় যে মেয়েটিকে বহুকাল আগে সে চিত্রাঙ্গদা দিয়েছিল, লীলা ঠিক সেই মেয়েটি। দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত নীরস জীবনচর্যার মধ্যে রোমান্সের আকস্মিক আবির্ভাবকে গল্পটিতে ব্যঞ্জনাময় করে তোলা হয়েছে। প্লট-রচনার কৌশল ও সংস্থান-সৃষ্টির নাটকীয়তা গল্পটির আঙ্গিক-সৌকর্যের মূল কারণ। স্পষ্টতার চেয়ে ইঙ্গিতের তির্যক লীলাই এখানে লক্ষণীয়।

॥ ৫ ॥

'খদ্যোত' সঙ্কলনটির শেষের তিনটি গল্প ছাড়া অন্যান্য গল্পগুলি লেখকের অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের রচনা। এখানে মনোজ বসুর গল্পের একটি নূতন রূপ চোখে পড়ে। 'বনমর্মরে'র গল্পগুলির কাহিনীরস ও রোমান্টিক কাব্যানুভূতি এখানে নূতন শিল্পাদর্শে রূপান্তরিত হয়েছে। সাম্প্রতিক ছোটগল্পের কলাবিধি ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য নিয়ে নানা পরীক্ষা চলেছে। ছোটগল্পের রূপ-রচনার ক্ষেত্রেও তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও বুদ্ধিদীপ্ত জীবনসমালোচনার সুর ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু একটি নিটোল গল্প বলাই যেন ছোটগল্পের সবটুকু নয়। কারণ ছোটগল্পে বর্ণনার চেয়ে ব্যঞ্জনার স্থানই বেশী—বহুকথনে যার প্রায় কিছুই বলা সম্ভব হয় না, একটি মিতাক্ষর ইঙ্গিত-রেখায় তার সবটুকুই হয়তো উদ্ভাসিত হতে পারে। নাটকীয়তার আকস্মিক চমক, এপিগ্রামের তীক্ষ্ণাগ্র শরসন্ধান ও সিম্বলের আলো-আঁধারী লীলা ছোটগল্পের নিজস্ব ক্ষেত্রকে নিঃসন্দিগ্ধ করে তুলছে। 'খদ্যোত'-এর গল্পগুলির সংক্ষিপ্ততা বিস্ময়কর—এখানে কোনো বিষয়ই যেন দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে ভরাট করে তোলা হয় না, একটি রেখার আঁচড়ে অথবা তুলির মৃদুস্পর্শে গল্পটির অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা দ্যোতিত হয়। ছোট ছোট ঘটনা, খণ্ড খণ্ড ভাবানুভূতি নিপুণ রূপকরণে শিল্পিত হয়ে উঠেছে। চেকভের এই শ্রেণীর

ব্যঞ্জনা-তীক্ষ্ণ সূক্ষ্মশরীরী গল্পগুলি সম্পর্কে বলা হয়েছে : '...they remain wonderful mosaics of incident and impression.' 'খদ্যোত'-এর গল্পগুলি লিখতে যেন কোনো কাহিনীরই প্রয়োজন হয় নি—ছোট্ট একটু ঘটনার টুকরো, কিংবা একটি বিশেষ ধরনের সংস্থান (situation) অথবা মনের একটি সূক্ষ্ম ভাবানুভূতিই যেন যথেষ্ট। উপাদান নেই বললেই হয়, উপকরণও যৎসামান্য,—কিন্তু তার ভেতর থেকেই এক-একটি অনবদ্য শিল্পরূপ গড়ে তোলা হয়েছে। 'বনফুলে'র ছোটগল্পগুলিতে এইজাতীয় টেকনিক লক্ষ্য করা যায়। ছোটগল্পের বিচিত্র আঙ্গিক-নির্মিতিতে ও সুমিতাক্ষর গূঢ় ভাব-দ্যোতনায় 'খদ্যোতে'র গল্পগুলি মনোজ বসুর নিপুণ বাণীসিদ্ধির পরিচায়ক।

'অসময়' গল্পটির মধ্যে যে মধুর ছলনাটুকু আছে তা উপভোগ্য। কিন্তু এই ছলনা যখন ধরা পড়ে যায় তখন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের নির্মম দারিদ্র্যের রূপ আত্মপ্রকাশ করে। সন্তু নামকরা খেলোয়াড় ও গায়ক, আর বাসন্তী ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাশ। দুজনেই উদয়াস্ত জীবনযুদ্ধ করে অথচ দৈন্যকে ঢাকার জন্য মিথ্যা ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে। বাসন্তী নিজের দর বাড়াবার জন্য বড়লোকের ছেলে মলয় মিত্তিরের সঙ্গে মেট্রো সিনেমায় যাওয়ার একটি কল্পিত গল্প ফেঁদে বসে। সন্তুও বাসন্তীর কাছে জানিয়ে যায় যে মহারাজগঞ্জের প্রিন্স তাকে ডিনারে ডেকেছেন। অথচ দুজনাই দুজনের কল্পিত সৌভাগ্য-কাহিনী শুনে আত্মধিক্কার দেয়। কিন্তু এক জায়গায় ছাত্রী পড়াতে গিয়ে দুজনাই দুজনের কাছে হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। আসলে তারা পরস্পরকে ভালবাসে ও সান্নিধ্য কামনা করে। কিন্তু সামাজিক মূল্য বাড়ানোর জন্য ছলনা ও চাতুরীর আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তা ছাড়া গল্পটির মধ্যে একালের বুদ্ধিজীবী তরুণ-তরুণীর জীবনাচরণের একটি চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। 'শ্রীবাসু-দেবায়' গল্পটির টেকনিক অপূর্ব—যেন অতিসূক্ষ্ম সোনার সুতোয় বোনা। সঙ্কেত-লীলায় এক অদৃশ্য অপরিবর্তনীয় অসীমের তুলনায় মানব-জীবনের তুচ্ছতা ও ক্ষণভঙ্গুরতাই চকিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। মার্বেল-স্লাবের লেখার পরিবর্তনগুলি ও দেবতার অদৃশ্য ভাবান্তর যেমন ব্যঞ্জনাময়, তেমনি গভীর অর্থদ্যোতনার মিতাক্ষর অভিব্যক্তি।

কতকগুলি গল্পের রস জমে উঠেছে অ্যান্টি-ক্লাইমেক্সের প্রবল ধাক্কায়। এর ভেতর চরিত্র-কেন্দ্রিক ও ঘটনা-সংস্থানগত—দু-ধরনেরই অ্যান্টি-ক্লাইমেক্স সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়। 'কুণ্ডলা সেনের প্রেমিক' গল্পটি অভাবনীয়ভাবে গড়ে

ওঠা একটি ক্ষণদীপ্ত রোমান্টিক মুহূর্তের অতর্কিত উপসংহারের কাহিনী। শিক্ষয়িত্রী কুণ্ডলা সেন তার স্কুলের সেক্রেটারির ছেলে তৃপ্তিনারায়ণকে নিজহাতে চা খাইয়ে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে এল। কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি এসে তৃপ্তিনারায়ণ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে বাড়ি গেল। কুণ্ডলা তার এই আকস্মিক আচরণে বিস্মিত হল। পরের দিন তৃপ্তিনারায়ণের পড়ার সময় কুন্তলা তার হাত থেকে বই কেড়ে নিতে সে আর্তনাদ করে উঠল। প্রতিহিংসাপরায়ণা কুণ্ডলা তৃপ্তিনারায়ণের সঙ্গে তার সেদিনের ব্যাপারটিকে একটু বাড়িয়েই বলল। কিন্তু শেষে প্রকাশ পেল বাঁশতলা দিয়ে আসার সময় তৃপ্তিনারায়ণের ভূতের ভয় করছিল, তাই সেই রাস্তাটুকু এগিয়ে দেওয়ার জন্য একজন সঙ্গীর প্রয়োজন হয়েছিল। ক্ষণিকের অতিথির জন্য কুণ্ডলার মনে যে স্বপ্ন-সাধ রচিত হয়েছিল তা একমুহূর্তেই ধূলিসাৎ হয়েছে। গল্পটির আকস্মিক পট-পরিবর্তন ও হাস্যকর পরিণতি একটি অম্ল-মধুর আস্বাদনের সৃষ্টি করেছে। 'দুই জানলা' গল্পটিতে কাহিনী নেই বললেই হয়। আভাসে-ইঙ্গিতে মনে হবে যে এটি একটি প্রেমের গল্প। পুরীর হোটেলের সরু একটি ঘর—নিরিবিলিতে দুটি প্রাণী এখানে থাকতে চায়। লেখক এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যাতে পাঠক নিঃসন্দেহে মনে করবেন যে এ বর্ণনা একটি দম্পতি অথবা প্রেমিক-প্রেমিকার না হয়েই পারে না: "সঙ্কীর্ণ একটুখানি জায়গাই কাম্য তাদের। দুটিতে আছে কিংবা নেই—কারো নজরে পড়বে না। খাট না হলেই বা কি—মেজেতেও শুতে রাজি। এক হাত জায়গার মধ্যে পরম ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকবে। সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিলেই ব্যস, আর কোনো ঝামেলা নেই—নিশ্চিন্ত মুখোমুখি বসে দেদার ভবিষ্যতের ছবি আঁকো।" পাঠকের মন যখন প্রেম-মধুর রোমান্স-প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে সেই মুহূর্তেই তার আবেশময় তন্দ্রাতুর মনের ওপর অ্যান্টি-ক্লাইমেক্সের প্রবল আঘাত লেগেছে। গল্পের শেষে জানা গেল যে এদের দুজনের একজন হল আই-সি-এস অমলকান্তি যে 'লড়ায়ের বাজারে সরকারী সাড়ে তিন লাখ টাকা মেরে এখন শ্রীঘরে বাস করছে', আর একজন হল 'স্বনামধন্য সিঁধেল' কাসেম আলি।

'নতুন গল্প' নিতান্ত লঘুরসের কাহিনী, কিন্তু গল্পের কৌতুকরসোচ্ছল লঘুধর্মী পরিণতি রচনায় লেখকের মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগরের দামোদর পার হওয়ার কাহিনীটির সঙ্গে লেখক সুকৌশলে চন্দ্রনাথ শিকদারের মিথ্যে চাতুরীর গল্পকে যোগ করে যথার্থই 'নতুন গল্প'

লিখেছেন। কাহিনীর প্রারম্ভ ও পরিণতির মধ্যে যে অসঙ্গতি আছে, তাই হাস্যরসের উদ্রেক করেছে। 'ছবি' গল্পটিতে এই শ্রেণীর শিল্পকলা চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করেছে। অবনীর তরুণ মনে একটি সুন্দরীর ছবি নিবিড় মোহাবেশের সৃষ্টি করেছে—সেই ছবিকে ঘিরেই সে কল্পস্বপ্ন রচনা করে। নির্জন প্রাচীন পুরীতে এই ছবি যেদিন মূর্তিমতী ছিল, সেদিনের কথা ভেবে সে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে—এইভাবে বহু বিনিদ্র ও স্বপ্নমদির রাত্রির অবসান হয়। গিন্নীঠাকরুন ক্ষীরোদা যখন তার হিসেব ভুলের জন্য রণরঙ্গিণী মূর্তি ধরে ছাতার বাঁট দিয়ে অবনীর পিঠে এক ঘা বসিয়ে দিলেন, তখন অবনীর স্বপ্নভঙ্গ হল। কারণ ছবিটি সেই প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলারই তরুণ বয়সের। কল্পনায় যা মোহময়, বাস্তবে তারই মর্মান্তিক পরিণতি জীবনেরই একটি মোহহীন ও অভ্রান্ত বিশ্লেষণ ফুটিয়ে তুলেছে। 'কেন তুমি মূর্তি ধরে এলে রহিলে না ধ্যান-ধারণায়'—এ জাতীয় রোমান্টিক অনুশোচনা এখানে নেই।

॥ ৬ ॥

'খদ্যোত' সঙ্কলনটিতে বিচিত্র রসের গল্প-সঞ্চয়ন আছে। টেকনিকও সর্বত্র একজাতীয় নয়। 'বাতুলাশ্রম' গল্পটি পাগলাগারদের একটি কৌতুক-সমুজ্জ্বল স্কেচ। এক পাগল আর-এক পাগলকে পাগল বলে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসছে—এর চেয়ে কৌতুকের আর কি হতে পারে! দুনিয়ায় পাগলের সংজ্ঞা নিরূপণ করা যথার্থই দুরূহ। 'ঘড়ি-চুরি' গল্পটির রস-নিষ্পত্তি ঘটেছে আকস্মিক একটি নাটকীয় মুহূর্তের মধ্যে। ঘড়ি-চুরির সন্দেহে জমিদারপুত্র পরমেশের পোশাক-পরিচ্ছদ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল 'কলার ও হাতার যতটা বাইরে বেরিয়ে আছে, সেইটুকু পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। বাকি অংশ প্রায় নেই—যা আছে শতচ্ছিন্ন সেলাই করা।' রাজপুত্র পরমেশ তার দারিদ্র্য ঢেকে রাখার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ঘটনাচক্রে লোকচক্ষুর সম্মুখে তা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। গল্পটির শেষাংশে একটি করুণ ব্যঞ্জনা আছে। চরিত্র-প্রধান গল্পটির মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টির সম্ভাবনাও ছিল, কিন্তু করুণ রসের বিপরীত প্রবাহেই গল্পটির চূড়ান্ত রস-নিষ্পত্তি ঘটেছে। গল্পের চরিত্র ও ঘটনা অতিক্রম করে পরমেশের 'দুহাতে মুখ ঢেকে ছুটে' বেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটিই জেগে থাকে।

সূত্ররেখাঙ্কিত এই গল্পগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রেমের গল্পও সঙ্কলিত হয়েছে।

নর-নারীর সম্পর্ক-বৈচিত্র্যের বিস্তৃত বর্ণনা ও দীর্ঘবিশ্লেষণ এখানে অনুপস্থিত—শুধু ঘটনা-সংস্থানের বিচিত্র কৌশলে ও আকস্মিক চমকের বৈদ্যুতিক রেখায় গল্পগুলির সূক্ষ্ম-নিপুণ রূপকরণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। 'পদ্ম' গল্পটিতে পদ্ম ও রুবির সম্পর্কে সমরের দ্বৈতাচরণ এক আকস্মিক রূঢ় আঘাতে অনাবৃত হয়েছে। সহপাঠিনী রুবির কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে পদ্ম একটি মূল্যবান আংটি কিনেছে। সেই আংটি এক রস-বিহ্বল মুহূর্তে সে সমরের হাতে পরিয়ে দিয়েছে। ধার শোধ দিতে গিয়ে পদ্ম রুবির কাছে তার বিয়ের খবর শোনে এবং জানতে পারে যে তার বর আর কেউ নয়, সমর। এর পরেই এলো চরম মুহূর্ত। সমরের হাতে আংটি দেখতে না পেয়ে পদ্ম তীব্র বাক্যবাণে তাকে জর্জরিত করেছে। রুবির কাছ থেকে সে আংটি চেয়ে এনেছিল—সেই আংটি সমরকে ফিরিয়ে দিয়ে সে বলেছে: 'রুবিকে দিয়ে দেবেন। আঙুলে পরে এক বন্ধুর কাছে যাব, সেজন্য চেয়ে নিয়ে এসেছিলাম। দরকার হল না, সে বন্ধু মরে গেছে।' প্রতারিতা নারীর শান্ত মৃদু কণ্ঠে তীব্রোজ্জ্বল শ্লেষের ভাষা। গল্পটির দ্রুতসঞ্চারী গতি-পরিবর্তনের মধ্যে আয়রনির নির্মম দীপ্তি ঝলসিত হয়েছে। 'পোস্ট মাস্টার' গল্পটিতে প্রেম-মধুর রোমান্সের স্মিত-হাস্য-লাবণ্য উদ্ভাসিত হয়েছে। পোস্ট মাস্টার সুধাংশু ও বনমালীর মেয়ে শোভার হৃদয়ঘটিত সম্পর্কটি অত্যন্ত সন্তর্পণে গড়ে উঠেছে। শোভার বিয়ের চিঠিগুলিকে সরিয়ে ফেলার ভেতর দুজনারই ষড়যন্ত্র আছে। ঝাঁপার ব্যোমকেশ মিত্তিরের ছেলের সঙ্গে শোভার বিয়ের পাকা কথাবার্তা সবই ভেস্তে গেল। ব্যাপার বুঝে শোভার বাবা বনমালী সুধাংশুর সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেললেন। এই ধরনের মিষ্টি-মধুর নির্দোষ প্রেমের রোমান্স রচনায় মনোজ বসু সিদ্ধ। 'ভুবনমোহন' গল্পটির শেষেও আকস্মিক চমকসৃষ্টির ভেতর দিয়ে নির্মম শ্লেষের সুর ফুটে উঠেছে। গল্পটির শেষাংশটুকুর সংক্ষিপ্ততা বিস্মিত করে—মনোজীবনের অতিদুর্গম জটিল অংশ স্বল্প-ভাষণে ও সামান্য দু-একটি উজ্জ্বল রেখা-বিন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উদ্ভট চরিত্র-সৃষ্টিতে ও ঘটনা-সংস্থান সৃষ্টির মৌলিকতায় গল্পটি লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পের দাবি করতে পারে। নিঃসঙ্গ ভুবনমোহনের নীরস কঠিন মনে অলকার প্রতি আকস্মিক সমবেদনা থেকে গল্পটির উদ্ভব। অলকার নিমন্ত্রণ-পর্ব থেকে গল্পটি ক্রমাগত নিম্নমুখী হয়েছে—পর্বতের তুঙ্গ শিখর থেকে যেন পার্বত্য-নদী অবক্রিম ও ঋজু রেখায় নিম্নভূমিতে নেমে এসেছে—যেমন তার খরগতি তেমনি

তার বুদ্ধি-মার্জিত দীপ্তি। ভুবনমোহন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে শোনে যে অলকার 'মামাতো ভাইয়ের শালা' তার সব ভাত খেয়ে ফেলেছে এবং অলকাকেও বিয়ে করে নিয়ে বার্মা যাচ্ছে। ভুবনমোহন তাকে বার্মা যাওয়ার আগে ধারের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলে বাড়ি এসে দেখে কে এসে ইতিমধ্যে মেজে খুঁড়ে তার সেই টাকার ঘটি নিয়ে চম্পট দিয়েছে। গল্পটির পরিণতি শ্লেষাত্মক। 'চাবুক' গল্পটিতে প্রেমের আর-এক রূপ বর্ণিত হয়েছে। পল্লীগ্রামের অসংস্কৃত ও আদিম জীবনের মধ্যেও প্রেমের দাবানলের ছবি এঁকেছেন লেখক। বলাই ও দামিনী—আদিম জীবনের দুটি বন্য প্রতীক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দামিনী দুর্বল অথচ অর্থবান কানাইকে পতিত্বে বরণ না করে শক্তিমান বলাইয়ের কাছেই পরম নির্ভরতায় আত্মসমর্পণ করেছে। মধ্যযুগীয় বীরযুগের যুদ্ধ-ও-প্রেমমণ্ডিত রোমান্সেরই যেন একটি সহজ গ্রাম্য সংস্করণ। শুধু নাগরিক জীবনের বুদ্ধিজীবী নর-নারীর হৃদয়-দ্বন্দ্বই নয়, গ্রাম্যজীবনের প্রেম-মধুর রোমান্স, এমন কি নিতান্ত নিম্নকোটির অশিক্ষিত নরনারীর বন্য-বর্বর জীবনের মধ্যেও লেখক প্রেমের রহস্য আবিষ্কার করেছেন। রোমান্টিক দৃষ্টির এও এক দিক—ভীষণ-মধুর ও দুষ্প্রাপ্য-মনোহরের রহস্য-রূপ ফুটিয়ে তোলার দিকেই তার প্রবণতা।

'খদ্যোতে'র কতকগুলি গল্প সমকালীন দেশ-কালের ভাষ্যরূপ। জীবনের বহু-বিসর্পিত রূপ-রেখা মনোজ্ঞ বসুর সর্বঙ্কর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে দেশ-স্বাধীন হওয়ার পরবর্তীকাল পর্যন্ত প্রায় পনের বছরের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে তিনি গল্প লিখেছেন। সমকালীন দেশকালের বুদ্ধি-দীপ্ত ভাষ্যরচনা লেখকের কাল-সচেতনতার পরিচয় দেয়। 'জননী জন্মভূমিশ্চ' গল্পে লোক-নির্যাতিত জননায়ক লোকনাথের জীবনের বিরোধ ও অন্তঃসারশূন্যতার একটি ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হয়েছে। বক্তৃতা-সর্বস্ব রাজনৈতিক নেতার ব্যক্তিগত জীবনের চরম কলঙ্ককে স্যাটায়ারের নির্মম আঘাতে উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে। ইংরেজ বিদায় হওয়ার পর লোকনাথ জননেতা হয়ে উঠল—জননী ও জন্মভূমির গৌরবমন্ত্র তার কণ্ঠে। আসলে সে স্ত্রীঘাতী ও মাতৃপীড়ক। বাইরে দেশজননী সম্পর্কে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা করে বাড়িতে এসে নিজের মাকে ঠেঙানোই তার কাজ—একটু নুনের থেকে চুন হলেই এই স্ত্রীঘাতী রাজনৈতিক নেতা নিজের মাকে প্রহার করে থাকেন। তখন তাঁর বলতে বাধে না—

'বউ মেরে নেতা হয়েছি, তোমায় মেরে নির্ঘাত শহিদ হব এবার।'—অথচ বাইরের লোকের কাছে মাতৃভক্ত সন্তান রূপে তার পরিচয়। রাজনৈতিক নেতার জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা ও অসঙ্গতি নিয়ে এই ধরনের বলিষ্ঠ স্যাটায়ার বাংলাসাহিত্যে নিতান্ত দুর্লভ বললেই হয়। এক অনাসক্ত দৃষ্টির সাহায্যে বস্তুর মর্মভেদ করার শিল্পে মনোজ বসুর অধিকার সুবিদিত। 'কন্ট্রোল-আমলে' গল্পের বক্তা কন্ট্রোলের যুগের নানা অসাধুতার উল্লেখ করেছেন। যে সৎভাবে উপার্জন করেছে তাকে আজও দাঁড়িপাল্লা হাতে জিনিসপত্র মাপতে হচ্ছে, আর দ্বিজবর পালিত কন্ট্রোলের দৌলতে এখন মস্ত বড়লোক—'আজ দোমহলার উপর পা ঝুলিয়ে সে খবরের কাগজ পড়ে।' 'লঙ্গরখানা' গল্পের নামকরণ যাই হোক আসলে এর অন্তরালে আছে স্নিগ্ধোজ্জ্বল কৌতুকহাস্য। পাশাপাশি দুটি লঙ্গরখানার ব্যবস্থাপনা নিয়ে নমিতা ও সুবলের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। লঙ্গরখানার ব্যাপার শেষে গৌণ হয়ে ওঠে—তার আড়ালে প্রেমের মধুচক্র রচিত হয়। সুবলের সঙ্গে নমিতার বিবাহেই এর অনিবার্য পরিণতি ঘটেছে। 'দাঙ্গার একটি কাহিনী'-র মধ্যে লেখক মানব-মনের চিরন্তন অভীপ্সার একটি সুন্দর ছবি এঁকেছেন। হাসপাতালের পাশাপাশি দুটো বেডে দুই রোগী—একজন বুড়ো আর একজন ছোকরা। তাদের দুজনের খুব ভাব। অথচ ছোকরা ঐ বুড়ো লোকটাকেই ছোরা মেরে মিলিটারির গুলিতে জখম হয়েছে, এ কথা তারা কেউ জানে না। দাঙ্গায় দু-পক্ষেরই অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু তা সাময়িক। সাময়িক ঘটনা যত মারাত্মকই হোক না কেন মানবমনের চিরন্তন হৃদয়াবেগ ও প্রীতি-মধুর সম্পর্ককে দূর করতে পারে না। শিল্পী মনোজ বসু মানব-সত্যে আস্থাবান ও আশাবাদী। 'স্বাধীন ভারতে' স্বাধীন ভারতের জেলখানার একটি ব্যঙ্গাত্মক স্কেচ। 'মুখস্থ বক্তৃতা' গল্পটিও কৌতুকরসপ্রধান। হরসুন্দরের মুখস্থ বক্তৃতার বিপদের কথা ঘটনা-বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে সুন্দর করে ফোটানো হয়েছে। হরসুন্দর সাত সালে মুখস্থ বক্তৃতা দিতে গিয়ে সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়েছিলেন। বক্তৃতাটি লিখে দিয়েছিল তাঁরই সম্বন্ধী-পুত্র বলাই। এক সাহেবকে গুলি করার অপরাধে তার ফাঁসি হয়। দীর্ঘ তেতাল্লিশ বৎসর পরে স্বাধীন ভারতের ছাব্বিশে জানুয়ারিতে সভাপতি হয়ে তিনি সেই একই বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণের বিরাগভাজন হলেন। ঘটনা-সংস্থান-কৌশলে হরসুন্দরের কৌতুককর অসঙ্গতি অপূর্ব রসরূপ পেয়েছে।

লেখক এখানে রাজনৈতিক বিধাতার পরিহাসের কথাও সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করেছেন। উনিশ শ পাঁচে যার জন্য আমরা আত্মদান করেছি—তাকেই আমরা বেয়াল্লিশ বছর পরে স্বীকার করে নিয়েছি। লেখকের প্রচ্ছন্ন বেদনা-বোধটি লক্ষণীয়। 'রাজবন্দী' গল্পে ইংরেজ আমলের রাজবন্দী ও স্বাধীন ভারতের মন্ত্রী কুমুদনাথের অবস্থাগত পার্থক্যের ব্যঙ্গাত্মক চিত্রণের পাশে তৎকালীন জেলার ও অধুনা গান্ধীটুপি-পরা কণ্ট্রাক্টার বিনোদের রূপান্তরিত স্বরূপ চমৎকার ফুটেছে। 'গান্ধীটুপি' গল্পটিও ঐ একই সুরে লেখা। ইংরেজ আমলের কুখ্যাত বিপিন দারোগার স্বাধীন ভারতে মূর্তি পরিবর্তন করার হাস্যকর প্রচেষ্টার কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে। 'খদ্যোতে'র গল্পগুলিতে ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ততা ও সূক্ষ্মতাকে লেখক আশ্চর্য কৌশলে আয়ত্ত করেছেন। বুদ্ধির দীপ্তিতে ও আকস্মিক চমকসৃষ্টিতে লেখক খদ্যোতের মতো ক্ষণকালীন আলোকের সৃষ্টি করেছেন বটে, কিন্তু সেই আলোর শিখায় জীবনের অতলান্ত রহস্যতল উদ্ভাসিত হয়েছে।

॥ ৭ ॥

'খদ্যোতে'র শেষের তিনটি গল্প অপেক্ষাকৃত আগের লেখা। কিন্তু রচনার টেক্‌নিকের সঙ্গে সঙ্কলনটির অন্যান্য গল্পের একটি আত্মিক সংযোগসূত্র আছে। 'প্রথম কথা' গল্পটি মনস্তত্ত্বমূলক। ফণিভূষণ তার নববধূর মুখ দিয়ে বহু কৌশলে একটি কথাও বের করতে পারে নি, কিন্তু একটি ব্যাপারে আকস্মিক-ভাবে বধূর শুধু মুখই ফুটল না, বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাজ্ঞান প্রকাশিত হল। নৌকারোহীরা সকলেই যখন ফণীকে ডাঙায় নেমে রান্না করার জন্য অনুরোধ করল, তখন নববধূ তার পথরোধ করে বলল: 'আপনি যদি যান ওখানে, আমি এই গাঙে ঝাঁপ দিয়ে মরব।'—বধূর এই উক্তিটির মধ্যে সম্ভ্রমবোধ ও ব্যক্তিত্বের একটি বৈদ্যুতিক দীপ্তি ফুটে উঠেছে। সামান্য একটি কথার ইঙ্গিতে লেখক মনের গভীরতলকে আলোকিত করে তুলেছেন। 'আংটি' গল্পটিকে একটি চরিত্র-প্রধান গল্প বলা যায়। শুধু কলা-কৌশলময় আবহ ও ঘটনা সৃষ্টিতেই নয়, বিচিত্র ও উদ্ভট চরিত্ররচনায়ও যে লেখক কত বড় শিল্পী তার একটি সার্থক পরিচয় এই গল্পটিতে। গল্পটি প্রধানত আশুতোষের উদ্ভট খেয়াল ও অদ্ভুত চরিত্রের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও লোক-চরিত্র সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা মনোজ বসুকে যথার্থ জীবন-

রসিক করে তুলেছে। একটি সামান্য আংটিকে ঘিরে আশুতোষের উৎকেন্দ্রিক মনোভাব ও বাতিকগ্রস্ততার নিপুণ বর্ণনা করা হয়েছে। 'শাস্তি' গল্পটি স্নিগ্ধ-মধুর আস্বাদনে সুখপাঠ্য। কমলা ও পান্নালাল—পল্লীবাংলার ছুটি ভাইবোনের স্নেহময় বাৎসল্যের সম্পর্কটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পান্নালালের কৌতূহল, অভিমান ও দিদির ওপর অকৃত্রিম ভালবাসা—কিশোর চরিত্রের গহনতল পর্যন্ত আলোকিত করেছে। দিদির বিরুদ্ধে এত অভিযোগ, কিন্তু জামাইবাবুর কাছে সেই দিদির জন্যই সে মাফ চেয়ে নিয়েছে। বিচিত্র কিশোর চরিত্র! 'কৃষ্ণা' গল্পটিতে কৃষ্ণা ও লীলার অবস্থা-বৈচিত্র্যের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। কৃষ্ণা লীলাকে পরাজিত করতে এসে নিজেই পরাজিত হয়েছে। দুই বান্ধবীর কথোপকথনের ভেতর দিয়ে লেখক জীবনেরই গভীর অভিব্যক্তির কথা প্রকাশ করেছেন—জীবনের পূর্ণতা বিধাতা-পুরুষের এক রহস্যলীলা!

'স্বয়ংবরা' গল্পটি এর আগে কোনো বইয়ে সঙ্কলিত হয় নি। গল্পটি পরিণাম-রমণীয় কমেডির মধুর-আস্বাদনে প্রসন্ন। ঘটনা সাজানোর কৌশলে ও প্লট রচনার বৈচিত্র্যে গল্পটি জমে উঠেছে। পাকিস্তান হয়েছে—রণজিৎ চৌধুরীর বাগানবাড়ি দখল করে বসেছে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা। চৌধুরীদের পুলিনই এর জন্য দায়ী। বৃদ্ধ অশ্বিনী ধর তার অবিবাহিতা মেয়ে বীণাকে নিয়ে বিপদে পড়েছেন—মেয়েকে বিয়ে না দিয়ে শেষ আশ্রয়টুকুই বা ছাড়েন কেমন করে! তাকে উচ্ছেদ করতে এসে ম্যানেজার বিনয়, ছোটবাবু ইন্দ্রজিৎ, এমন কি বিপত্নীক বড়বাবু পর্যন্ত বীণাকে বিয়ে করতে রাজি হন। পুলিন ও বীণার যুগ্ম-চক্রান্তে সমস্তই ব্যর্থ হল। শেষ পর্যন্ত পুলিনের সঙ্গে বীণার বিয়ে হল। ঘটনার দ্রুতসঞ্চারী গতি নাটকীয়—গল্পটির মধ্যে একটি কমেডি-মূলক একাঙ্কিকার সম্ভাবনা আছে—এ যেন আমাদের সমাজজীবনের ছোট্ট একটি 'কমেডি অব্ ইণ্ট্রিগ'।

'মনোজ বসুর গল্পসংগ্রহ' প্রথম খণ্ডের গল্পগুলিতেই তাঁর বিচিত্রমুখী ও লীলা-কুশলী শিল্পদৃষ্টির পরিচয় আছে। গীতিকবিতার মোহ ও রোমান্সরসের বর্ণবিচিত্র সমারোহের সঙ্গে মিশেছে বুদ্ধিধর্মী বিশ্লেষণ ও বাস্তব-ঘনিষ্ঠ জীবন-প্রজ্ঞা। তাই তাঁর কল্পদৃষ্টি যেমন 'বনমর্মরে'র নিগূঢ় রহস্য-জিজ্ঞাসায় অধীর, তেমনি জীবনের ক্ষণ-দীপ্ত 'খদ্যোত'-মুহূর্তগুলিরও তিনি নিপুণ ভাষ্যকার। একদিকে ঐশ্বর্যদীপ্ত অলঙ্কৃত ভাষায় রাজকীয় উৎসব, আর একদিকে স্বল্প-

সঙ্কেত সূক্ষ্ম রূপকরণের লঘুলীলা; একদিকে মিলন-মধুর রোমান্সের স্ফটিক পানপাত্র, আর একদিকে নির্মম নেমিসিসের উদ্যত শাসন ও বক্র-বিদ্রূপ! জীবন-যজ্ঞশালার বিচিত্র হোমানলের তিনি অনাসক্ত দ্রষ্টা।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ
ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮
কলিকাতা

রথীন্দ্রনাথ রায়

মনোজ বসুর
গল্প-সংগ্রহ

ব ন ম র্ম র

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে উৎসৃষ্ট

গ ল্প সূ চী

মৌজাটি নিতান্ত ছোট নয়। অগ্রহায়ণ হইতে জরিপ চলিতেছে, খানাপুরি শেষ হইল এতদিন। হিঞ্চে-কলমির দামে আঁটা নদীর কূলে বটতলার কাছাকাছি সারি সারি তিনটি তাঁবু পড়িয়াছে। চারিদিকে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ।

শঙ্কর-ডেপুটি সদর-ক্যাম্প হইতে আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উপলক্ষ একটা জটিল রকমের মকদ্দমা। ছোকরা মানুষ, ভারি চটপটে—পত্নীবিয়োগের পর হইতে চাঞ্চল্য যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। আসিয়াই আমিনের তলব পড়িল।

আমিনকে ডাকিতে পাঠাইয়া একটা চুরুট বাহির করিল। চুরুটের কৌটায় সেই সাত মাস আগেকার শুকনো বেলের পাতা ক-টি এখনও রহিয়াছে।

সাত মাস আগে একদিন বিকালবেলা তাহাদের দেশের বাড়িতে দোতলার ঘরে ঢুকিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—সুধারানী, কালকে কি বার?

সুধা বলিয়াছিল—পাঁজি দেখগে যাও, আমি জানি নে। তারপর হাসিয়া চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া বলিয়াছিল—চলে যাবেন, তাই ভয় দেখানো হচ্ছে। ভারি কিনা ইয়ে—

শঙ্করও খুব হাসিয়াছিল। বলিয়াছিল—যদি মানা করো, তবে না হয় যাই নে।

—থাক!

কোনো জবাব না দিয়া সুধারানী অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় কোঁচাইয়া পাট করিতে লাগিল। শঙ্কর তাহার হাত ধরিয়া কাছে আনিল।

—শোনো সুধারানী, উত্তর দাও।

—বা-রে, পরের মনের কথা আমি জানি বুঝি!

—নিজের তো জান?

তবু কথা কহে না দেখিয়া শঙ্কর বলিতে লাগিল—আমি চলে যাব বলে তোমার কষ্ট হচ্ছে কিনা সেই কথাটা বলো আমায়—না বললে শুনছি নে কিছুতে।

—না।

—সত্যি বলছ?

—না—না—না। বলিয়া হাত ছাড়াইয়া সুধা বাহির হইয়া যাইতেছিল। শঙ্কর পলায়নপরার সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

—মিছে কথা। দেখি, আমার দিকে চাও—কই, চাও দিকি সুধারানী।

সুধা তখন দুই চক্ষু প্রাণপণে বুজিয়া আছে। মুখ ফিরাইয়া ধরিতেই ঝরঝর করিয়া গাল বহিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িল। আঁকিয়া-বাঁকিয়া পাশ কাটাইয়া বধূ পলাইল।...

শেষ রাতে বৃষ্টি নামিয়াছে। লক্ষ্মণ বাহির হইতে ডাকিল—ছোটবাবু, ঘাটে স্টীমার সিটি দিয়েছে।

সুধারানী গলায় আঁচল বেড়িয়া প্রণাম করিল। কহিল—দাঁড়াও একটু। তাড়াতাড়ি কুলুঙ্গির কোণ হইতে সন্ধ্যাকালে গোছাইয়া-রাখা বিল্বপত্র আনিয়া হাতে দিল।

—দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা! হপ্তায় একখানা করে চিঠি দিও, যখন যেখানে থাক, বুঝলে?

আরও একটা দিনের কথা মনে পড়ে, এমনি এক বিকালবেলা মামুদপুর ক্যাম্পে সে জরিপের কাজ করিতেছে, এমন সময় চিঠি আসিল, সুধারানী নাই।

ইতিমধ্যে নকশা ও কাগজপত্র লইয়া ভজহরি আমিন সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

—দু শ দশ—এগারো—তার উত্তরে এই হলো গে দু শ বারো নম্বর প্লট—বলিয়া ভজহরি নকশার উপর জায়গাটা চিহ্নিত করিল। বলিতে লাগিল—অনাবাদী বন-জঙ্গল একটা, মানুষজন কেউ যায় না ওদিকে, তবু এই নিয়ে কত মামলা।

হঠাৎ একবার চোখ তুলিয়া দেখিল, সে-ই কেবল বকিয়া মরিতেছে, শঙ্কর বোধ করি একবারও কাগজপত্রের দিকে তাকায় নাই—মামলের উত্তরের

মাঠের দিকে এক নজরে তাকাইয়া আপন মনে দিব্যি শিস দিতে শুরু করিয়াছে, চুরুটের আগুন নিভিয়া গিয়াছে।

বলিল—হাঁা, ঐ যে তালগাছ ক-টার ওধারে কালো কালো দেখা যাচ্ছে—জঙ্গলের আরম্ভ ঐখানে। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক, কিন্তু ওর মধ্যে জমি অনেক···এইবারে রেকর্ড একবার দেখবেন হুজুর, ভারি গোলমেলে ব্যাপার।

—হাঁ হাঁ না—এই রকম বলিতে বলিতে একটু অপ্রস্তুত হইয়া শঙ্কর কাগজ-পত্রে মন দিল। পড়িয়া দেখিল, দু শ বারোর খতিয়ানে মালিকের নাম লেখা হইয়াছে, শ্রীধনঞ্জয় চাকলাদার।

ভজহরি বলিতে লাগিল—আগে ঐ একটা নাম শুধু লিখেছিলাম। তারপর দেখুন ওর নিচে নিচে উড-পেন্সিল দিয়ে আরও সাতটা নাম লিখতে হয়েছে। রোজই এই রকম নতুন নতুন মালিকের উদয় হচ্ছে। আজ অবধি একুনে আটজন তো হলেন—যে রেটে ওঁরা আসতে লেগেছেন দু-একদিনের মধ্যে কুড়ি পুরে যাবে বোধ হচ্ছে, এই পাতায় কুলোবে না।

শঙ্কর কহিল—কুড়ি পুরে যাবে, যাওয়াচ্ছি আমি—রোসো না। আজই খতম করে দেব সব। তুমি ওদের আসতে বললে কখন?

—সন্ধ্যের সময়। গেরস্ত লোক সারাদিন কাজকর্মে থাকে—একটু রাত হয় হবে, জ্যোৎস্না রাত আছে—তার আর কি?

আরও খানিকটা কাজকর্ম দেখিয়া শঙ্কর সহিসকে ঘোড়া সাজাইতে হুকুম দিল।

বলিল—মাঠের দিক দিয়ে চক্কোর দিয়ে আসা যাক একটা—এ রকম হাত-পা কোলে করে তাঁবুর মধ্যে কাঁহাতক বসে থাকা যায়? এ জায়গাটা কিন্তু তোমরা বেশ সিলেক্ট করেছ, আমিন মশাই। ওগুলো ভাঁটফুল, না? কিন্তু গাছের দশা দেখে হাসি না কাঁদি—

বলিতে বলিতে আবার কি ভাবিল। বলিল—ঘোড়া থাকগে, এক কাজ করলে হয় বরং—চলো না কেন দুজনে পায়ে পায়ে জঙ্গলটা ঘুরে আসি। মাইলখানেক হবে—কি বল? বিকেলে ফাঁকায় বেড়ালে শরীর ভালো থাকে। চলো—চলো—

মাঠের ফসল উঠিয়া গিয়াছে। কোনোদিকে লোক-চলাচল নাই। শঙ্কর আগে আগে যাইতেছিল, ভজহরি পিছনে। জঙ্গলের সামনেটা খাতের মতো—

অনেকখানি চওড়া, খুব নাবাল। সেখানে ধান হইয়া থাকে, ধানের গোড়াগুলো রহিয়াছে। পাশ দিয়া উঁচু আল বাঁধা।

সেখানে আসিয়া শঙ্কর কহিল—গাঙের বড় খাল-টাল ছিল এখানে?

ভজহরি কহিল—না হুজুর, খাল নয়—এটা গড়খাই। সামনের জঙ্গলটা ছিল গড়।

—গড়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজারামের গড়। রাজারাম বলে নাকি কে-একজন কোনকালে এখানে গড় তৈরি করেছিলেন। এখন তার কিছু নেই, জঙ্গল হয়ে গেছে সব।

তারপর দুজনে নিঃশব্দে চলিতে লাগিল।

মাঝে একবার শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—বাঘ-টাঘ নেই তো হে?

ভজহরি তাচ্ছিল্যের সহিত জবাব দিল—বাঘ! চারিদিকে ধুধু করছে ফাঁকা মাঠ, এখানে কি আর···তবে হ্যাঁ, অন্যান্যবার শুনলাম কেঁদো-গোবাঘা দু-একটা আসত। এবারে আমাদের জ্বালায়—

বলিয়া হাসিল। বলিতে লাগিল—উৎপাতটা আমরা কি কম করছি হুজুর? সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই—কম্পাস নিয়ে চেন ঘাড়ে করে করে সমস্তটা দিন। ঐ পথ যা দেখছেন, জঙ্গল কেটে আমরাই বের করেছি, আগে পথঘাট কিছু ছিল না—এ অঞ্চলের কেউ এ বনে আসে না।

বনে ঢুকিয়া খানিকটা যাইতেই মনে হইল, এই মিনিট দুয়ের মধ্যেই বেলা ডুবিয়া রাত্রি হইয়া গেল।

ঘন শাখাজাল-নিবদ্ধ গাছপালা, আম আর কাঁঠাল গাছের সংখ্যাই বেশি, পুরু বাকল ফাটিয়া চৌচির হইয়া গুঁড়িগুলি পড়িয়া আছে যেন এক-একটা অতিকায় কুমির, ছাতাধরা সবুজ···ফাঁকে ফাঁকে শরগাছা···একদা মানুষেই যে ইহাদের পুঁতিয়া লালন করিয়াছিল আজ আর তাহা বিশ্বাস হয় না। কত শতাব্দীর শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা মাথার উপর দিয়া কাটিয়া গিয়াছে, তলার আঁধারে এইসব গাছপালা আদিম কালের কত সব রহস্য লুকাইয়া রাখিয়াছে, কোনো-দিন সূর্যকে উঁকি মারিয়া কিছু দেখিতে দেয় নাই।···

এই রকম একটানা কিছুক্ষণ চলিতে চলিতে শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল।

—এখানটায় তো ফাঁকা বেশ! জল চকচক করছে—না?

আমিন বলিল—ওর নাম পঙ্খদীঘি।

—খুব পাঁক বুঝি ?

—তা হবে, কেউ আবার বলে পঙ্খী-দীঘির থেকে পঙ্খদীঘি হয়েছে।

বলিয়া ভজহরি গল্প আরম্ভ করিল—

সেকালে এই দীঘির কালো জলে নাকি অতি সুন্দর ময়ূরপঙ্খী ভাসিত। আকারেও সেটি প্রকাণ্ড—দুই কামরা, ছয়খানি দাঁড়। এত বড় ভারি নৌকা, কিন্তু তলির ছোট্ট একখানা পাটা একটুখানি ঘুরাইয়া দিয়া পলকের মধ্যে সমস্ত ডুবাইয়া ফেলা যাইত। দেশে সে সময় শাসন ছিল না, চট্টগ্রাম অঞ্চলের মগেরা আসিয়া লুটতরাজ করিত, জমিদারদের মধ্যে রেষারেষি লাগিয়াই ছিল। প্রত্যেক বড়লোকের প্রাসাদে গুপ্তদ্বার ও গুপ্তভাণ্ডার থাকিত, মান-সম্ভ্রম লইয়া পলাইয়া যাইবার—অন্ততপক্ষে মরিবার—অনেক সব উপায় সম্ভ্রান্ত লোকেরা হাতের কাছে ঠিক করিয়া রাখিতেন। কিন্তু নৌকার বহিরঙ্গ দেখিয়া এসব কিছু ধরিবার জো ছিল না। চমৎকার ময়ূরকণ্ঠী রঙে অবিকল ময়ূরের মতো করিয়া গলুইটি কুঁদিয়া তোলা—শোনা যায়, এক-একদিন নিষুম রাত্রে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে রাজারামের বড় ছেলে জানকীরাম তাঁর তরুণী পত্নী মালতী-মালাকে লইয়া চিত্রবিচিত্র ময়ূরের পেখমের মতো পাল তুলিয়া ধীর বাতাসে ঐ নৌকায় দীঘির উপর বেড়াইতেন। এই মালতীমালাকে লইয়া এ অঞ্চলের চাষারা অনেক ছড়া বাঁধিয়াছে, পৌষ-সংক্রান্তির আগের দিন তাহারা বাড়ি বাড়ি সেই সব ছড়া গাহিয়া নূতন চাউল ও গুড় সংগ্রহ করে, পরদিন দল বাঁধিয়া সেই গুড়-চাউলে আমোদ করিয়া পিঠা খায়।

গল্প করিতে করিতে তখন তাহারা সেই দীঘির পাড়ের কাছে আসিয়াছে। ঠিক কিনার অবধি পথ নাই, কিন্তু নাছোড়বান্দা শঙ্কর ঝোপঝাড় ভাঙিয়া আগাইতে লাগিল। ভজহরি কিছুদূরে একটা নিচু ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নল-খাগড়ার বন দীঘির অনেক উপর হইতে আরম্ভ হইয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে, তারপর কুচো-শেওলা শাপলার ঝাড়। ঝুঁকিয়া-পড়া গাছের ডাল হইতে গুলঞ্চলতা ঝুলিতেছে। একটু দূরের দিকে কিন্তু কাকচক্ষুর মতো কালো জল। সাড়া পাইয়া ক-টা ডাকপাখি নলবনে ঢুকিল। আর খানিকটা ডাইনে বিছুটি-আসশ্যাওড়ার কাঁটাঝোপের নিচে এককালে যে বাঁধানো ঘাট ছিল, এখনও বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সেই ভাঙাঘাটের অনতিদূরে পাতলা পাতলা সেকেলে ইটের পাহাড়।

কতদিন পূর্বে বিস্মৃত শতাব্দীর কত কত নিভৃত সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রে জানকীরাম হয়তো প্রিয়তমাকে লইয়া ওখান হইতে টিপিটিপি এই পথ বহিয়া এই সোপান বহিয়া দীঘির ঘাটে ময়ূরপঙ্খীতে চড়িতেন। গভীর অন্ধকারছায়ে সেই আসন্ন সন্ধ্যায় ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের সমস্ত সংবিৎ হঠাৎ কেমন আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

—ধ্যেত, আমার ভয় করে—কেউ যদি দেখে ফেলে!

—কে দেখবে আবার? কেউ কোথাও জেগে নেই, চলো মালতীবালা—লক্ষীটি, চলো যাই।

—আজ থাক, না না—তোমার পায়ে পড়ি, আজকের দিনটে থাক শুধু।

ঐ যেখানে আজ পুরানো ইটের সমাধিস্তূপ, ওখানে বড় বড় কক্ষ অলিন্দ বাতায়ন ছিল, উহারই কোনোখানে হয়তো একদা তারা-খচিত রাত্রে ময়ূরপঙ্খীর উচ্ছ্বসিত বর্ণনা শুনিতে শুনিতে এক তরুণী রূপসী রাজবধূর চোখের তারা লোভে ও কৌতুকে নাচিয়া উঠিতেছিল, শব্দ হইবে বলিয়া স্বামী হয়তো বধূর পায়ের নূপুর খুলিয়া দিল, নিঃশব্দে খিড়কি খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া দুইটি চোর স্বপ্নপুরী হইতে বাহির হইয়া ঘাটের উপর নৌকায় উঠিল, কেউ তা জানিল না। ফিসফাস কথাবার্তা···স্বচ্ছ মেঘের আড়ালে চাঁদ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল···শব্দ হইবার ভয়ে দাঁড়ও নামায় নাই···এমনি বাতাসে বাতাসে ময়ূরপঙ্খী মাঝদীঘি অবধি ভাসিয়া চলিল—

ভাসিতে ভাসিতে দূরে—বহুদূরে—শতাব্দীর আড়ালে কোথায় তাহারা ভাসিয়া গিয়াছে!

ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের কেমন ভয় করিতে লাগিল। গভীর নির্জনতার একটি ভাষা আছে, এমন জায়গায় এমনি সময় আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তাহা স্পষ্ট অনুভব হয়। চারিপাশের বনজঙ্গল অবধি ঝিম-ঝিম করিয়া যেন এক অপূর্ব ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভয় হইল, আরও কিছুক্ষণ সে যদি এখানে এমনিভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, জমিয়া নিশ্চয় গাছের গুঁড়ির মতো হইয়া এই বনরাজ্যের একজন হইয়া যাইবে; আর নড়িবার ক্ষমতা থাকিবে না। ··সহসা সচেতন হইয়া বারংবার সে নিজের স্বরূপ ভাবিতে লাগিল, সে সরকারী কর্মচারী···তার পসার-প্রতিপত্তি···ভবিষ্যতের আশা··· মনকে ঝাঁকা দিয়া দিয়া সমস্ত কথা স্মরণ করিতে লাগিল। ডাকিল—আমিন মশাই!

ভজহরি কহিল—সন্ধ্যে হয়ে গেল, হুজুর।

—যাচ্ছি।

ক্যাম্পের সামনাসামনি হইয়া শঙ্কর হাসিয়া উঠিল। কহিল—ডাকাত পড়েছে নাকি আমাদের তাঁবুতে? বাপরে বাপ! এবং হাসির সহিত ক্ষণপূর্বের অনুভূতিটা সম্পূর্ণরূপে উড়াইয়া দিয়া বলিতে লাগিল—চুরুট টেনে টেনে তো আর চলে না—হুঁকো-কলকের ব্যবস্থা করতে পার আমিন মশাই, খাঁটি স্বদেশী মতে বসে বসে টানা যায়?

আমিনও হাসিয়া বলিল—অভাব কি? মুখের কথা না বেরুতে গাঁ থেকে বিশটা রুপোবাঁধা হুঁকো এসে হাজির হবে, দেখুন না একবার—

গ্রামের ইতর-ভদ্র অনেকে আসিয়াছিল, উহাদের দেখিয়া তটস্থ হইয়া সকলে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। মিনিট দশেক পরে শঙ্কর তাঁবুর বাহিরে আসিয়া মামলার বিচারে বসিল। বলিল—মুখের কথায় হবে না কিছু, আপনাদের দলিলপত্তোর কার কি আছে দেখান একে একে। ধনঞ্জয় চাকলাদার আগে আসুন।

ধনঞ্জয় সামনে আসিল। কোষ্ঠীর মতো জড়ানো একখানা হলদে রঙের কাগজ, কালো ছাপ-মারা পোকায় কাটা, সেকেলে বাংলা হরফে লেখা। শঙ্কর বিশেষ কিছু পড়িতে পারিল না, ভজহরি কিন্তু হেরিকেনটা তুলিয়া ধরিয়া অবাধে আগাগোড়া পড়িয়া গেল। কে একজন দয়ালকৃষ্ণ চক্রবর্তী নামজাদ রাজারামের গড় একশ বারো বিঘা নিষ্কর জায়গা-জমি সায় বাগিচা-পুষ্করিণী তারণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয়ের নিকট সুস্থ শরীরে সরল মনে খোশকোবলায় বিক্রয় করিতেছে।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—ঐ তারণচন্দ্র চাকলাদার আপনার কেউ হবেন বুঝি ধনঞ্জয়বাবু?

ধনঞ্জয় সোৎসাহে কহিতে লাগিল—ঠিক ধরেছেন হুজুর, তারণচন্দোর আমার প্রপিতামহ। পিতামহ হলেন কৈলাসচন্দোর—তাঁর বাবা। তিরাশি সন থেকে এই সব নিষ্করের সেস গুনে আসছি কালেক্টরিতে, গুডিভ সাহেবের অফিসের চিঠে রয়েছে। কবলার তারিখটে একবার লক্ষ্য করে দেখবেন, হুজুর—

আরও অনেক কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু উপস্থিত অনেকে না না—করিয়া উঠিল। তাহারাও রাজারামের গড়ের মালিক বলিয়া নাম লেখাইয়াছে, এতক্ষণ অনেক কষ্টে ধৈর্য ধরিয়া শুনিতেছিল, কিন্তু আর থাকিতে পারিল না।

ধমক খাইয়া সকলে চুপ করিল। শঙ্কর ভজহরিকে চুপিচুপি কহিল—তুমি ঠিকই লিখেছ, চাকলাদার আসল মালিক, আপত্তিগুলো তুলো—ডিসমিস করে দেব।

ভজহরি কিন্তু সন্দিগ্ধভাবে এদিক-ওদিক বার দুই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আসল মালিক ধরা বড় শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে, হুজুর—

বারো-শ উনিশ সনের পুরোনো দলিল দেখাচ্ছে যে!

ভজহরি কহিতে লাগিল—এখানে আটঘরা গ্রামে একজন লোক রয়েছে, দু-সিকে কবুল করুন তার কাছে গিয়ে—উনিশ সন তো কালকের কথা, হুবহু আকবর বাদশার দলিল বানিয়ে দেবে। আসল নকল চেনা যাবে না।

বস্তুত ধনঞ্জয়ের পর অন্যান্য সাতজনের কাগজপত্র তলব করিয়া দেখা গেল, ভজহরি মিথ্যা বলে নাই—ঐ রকম পুরানো দলিল সকলেরই আছে। এবং বাঁধুনিও প্রত্যেকটির এমনি নিখুঁত যে যখনই যাহার কাগজ দেখে একেবারে নিঃসন্দেহ বুঝিয়া যায়, রাজারামের গড়ের মালিক একমাত্র সেই লোকটাই। এ যেন গোলক-ধাঁধায় পড়িয়া গেল। বিস্তর ভাবিয়া-চিন্তিয়া সাব্যস্ত হইল না কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে রাখা যায়।

হাল ছাড়িয়া দিয়া অবশেষে শঙ্কর বলিল—দেখুন মশাইরা, আপনারা ভদ্রসন্তান—

হাঁ—হাঁ—করিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল।

—এই একটা প্লট একসঙ্গে ঐরকম ভাবে আটজনের তো হতে পারে না?

সকলেই ঘাড় নাড়িল। অর্থাৎ—নয়ই তো—

—আপনারা হলফ করে বলুন, এর সত্যি মালিক কে।

ভদ্রসন্তানেরা তাহাতে পিছপাও নহেন। একে একে সামনে আসিয়া ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলিল—দু শ বারোর প্লট একমাত্র তাহারই, অপর সকলে চক্রান্ত করিয়া মিথ্যা কথা কহিতেছে।

লোকজন বিদায় হইয়া গেলে শঙ্কর বলিল—না, এরা সাটোয়ারি বটে। দেখে-শুনে সম্ভ্রম হচ্ছে।

ভজহরি মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, এ রকম সে অনেক দেখিয়াছে।

শঙ্কর বলিতে লাগিল—তোমার কথাই মেনে নিলাম যে কাঁচা দলিলগুলো জাল। কিন্তু সেগুলো রেজেস্ট্রি? দেখো, এদের দূরদৃষ্টি কত দেখো একবার—কবে কি হবে দু পুরুষ আগে থেকে তাই তৈরী হয়ে আসছে। চুলোয় যাকগে দলিলপত্তোর—তুমি গাঁয়ে খোঁজখবর করে কি পেলে বল? যা হোক একরকম রেকর্ড করে যাই—পরে যেমন হুকুম হবে।

ভজহরি বলিল—কত লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আসবার আগে কত সাক্ষিসাবুদ তলব করেছি, সে আরও মজা—এক-একজনে এক-এক রকম বলে। বলিয়া সহসা প্রচুর হাসিতে হাসিতে বলিল—নরলোকে আশকারা হল না, এখন একবার কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করতে পারলে হয়।

শঙ্কর কথাটা বুঝিতে পারিল না।

ভজহরি বলিতে লাগিল—কুমার বাহাদুর মানে জানকীরাম। সেই যে তখন ময়ূরপঙ্খীর কথা বলছিলাম, গাঁয়ের লোকেরা বলে—আশপাশের গ্রাম নিশুতি হয়ে গেলে জানকীরাম নাকি আসেন—উত্তর মাঠের ঐ নাক-কাটির খাল পেরিয়ে তেঘরা-বকচরের দিক থেকে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে রোজ রাত্তিরে মালতীমালার সঙ্গে দেখা করে যান—সে ভারি অদ্ভুত গল্প,—কাজকর্ম নেই তো এখন?

* * * * *

তারপর রাত্রি অনেক হইল। তিনটি তাঁবুরই আলো নিভিয়াছে, কোনো দিকে সাড়াশব্দ নাই। শঙ্করের ঘুম আসিতেছিল না। একটা চুরুট ধরাইয়া বাহিরে আসিল, আসিয়া মাঠে খানিক পায়চারি করিতে লাগিল।

ভজহরি বলিয়াছিল—কেবল জঙ্গল নয় হুজুর, এই মাঠেও সন্ধ্যের পর একলা কেউ আসে না। এই মাঠ সেই যুদ্ধক্ষেত্র, নদীপথে শত্রুরা এসেছিল। বেলা না ডুবতে রাজারামের পাঁচ শ ঢালী ঘায়েল হয়ে গেল, সেই পাঁচ শ মড়ার পা ধরে টেনে টেনে পরদিন ঐ নদীতে ফেলে দিয়েছিল…

উলুবনের উপর পা ছড়াইয়া চুপটি করিয়া বসিয়া শঙ্কর আনমনে ক্রমাগত চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

চার শ বৎসর আগে আর একদিন সন্ধ্যায় [illegible] এই মাঠের উপর এমনি চাঁদ উঠিয়াছিল। তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়া সমস্ত মাঠে ভয়াবহ

শান্তি থমথম করিতেছে। চাঁদের আলোয় স্তব্ধ রণভূমির প্রান্তে জানকীরামের জ্ঞান ফিরিল। দূরে গড়ের প্রাকারে সহস্র সহস্র মশালের আলো···আকাশ চিরিয়া শত্রুর অশ্রান্ত জয়োল্লাস···দুই হাতে ভর দিয়া অনেক কষ্টে জানকীরাম উঠিয়া বসিয়া তাঁহারই অনেক আশা ও ভালোবাসার নীড় ঐ গড়ের দিকে চাহিতে চাহিতে অকস্মাৎ দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল। ললাটের রক্তধারা ডান হাতে মুছিয়া ফেলিয়া পিছনে তাকাইয়া দেখিলেন, কেবল কয়েকটা শিয়াল নিঃশব্দে শিকার খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—কোনো দিকে কেহ নাই···

সেই সময়ে ওদিকে অন্দরের বাতায়নপথে তাকাইয়া মালতীমালাও চমকিয়া উঠিলেন, তবে কি একেবারেই—? অবমানিত রাজপুরীর উপরেও গাঢ় নিঃশব্দতা নামিয়া আসিয়াছে। দাসী বিবর্ণমুখে পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মালতীমালা আয়ত কালো চোখে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—শেষ?

খবর আসিল, গুপ্তদ্বার খোলা হইয়াছে, পরিজনেরা সকলে বাহির হইয়া যাইতেছে।

দাসী বলিল—বউমা, উঠুন—

বধূ বলিলেন—নৌকা সাজানো হোক।

কেহ সে কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। নদীর ঘাটে শত্রুর বহর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সে সন্ধানী-দৃষ্টি ভেদ করিয়া জলপথে পলাইবার সাধ্য কি!

মালতীমালা বলিলেন—নদীর ঘাটে নয় রে, দীঘির ময়ূরপঙ্খী সাজাতে হুকুম দিয়েছি। খবর নিয়ে আয়, হল কি না—

সেদিন সন্ধ্যায় রাজোদ্যানে কনকচাঁপা গাছে যে ক-টি ফুল ফুটিয়াছিল তাড়াতাড়ি সেগুলি তুলিয়া আনা হইল, মালতীমালা লোটন-খোঁপা ঘিরিয়া তার কতকগুলি বসাইলেন, বাকিগুলি আঁচল ভরিয়া লইলেন। সাধের মুক্তাফল দুটি কানে পরিলেন, পায়ে আলতা দিলেন, মাথায় উজ্জ্বল সিঁদুর পরিয়া কত মনোরম রাত্রির ভালোবাসার স্মৃতি-মণ্ডিত ময়ূরপঙ্খীর কামরার মধ্যে গিয়া বসিলেন।

নৌকা ভাসিতে ভাসিতে অনেক দূর গেল। তখন বিজয়ীরা গড়ে ঢুকিয়াছে, নদীর পাড় দিয়া দলে দলে রক্তপতাকা উড়াইয়া জনমানবশূন্য প্রাসাদে ঢুকিতে লাগিল। সমস্ত পুরবাসী গুপ্তপথে পলাইয়াছে।

বিশ-পঁচিশটি মশালের আলো দীঘির জলে পড়িল।

—ধর, ধর নৌকা—

মালতীমালা তলির পাটাখানি খুলিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে দীর্ঘ মাস্তুলটিও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নৌকা কেহ ধরিতে পারিল না, কেবল কেমন করিয়া কোন ফাঁক দিয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠিল আঁচলের চাঁপাফুল কয়েকটি—

তারপর ক্রমে রাত্রি আরো গভীর হইয়া গড়ের উঁচু চূড়ার আড়ালে চাঁদ ডুবিল। আকাশে কেবল উজ্জ্বল তারা কয়েকটি পরাজিত বিগত-গৌরব ভগ্নজানু জানকীরামের ধূলিশয্যার উপর নির্নিমেষ দৃষ্টি বিসারিত করিয়া ছিল। সেই সময়ে কে-একজন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া অতি সন্তর্পণে আসিয়া রাজকুমারকে ধরিয়া তুলিল।

—চলুন, প্রভু—

—কোথা?

—বটতলায়। ওখানে ঘোড়া রেখেছি, ঘোড়ায় তুলে নিয়ে চলে যাব।

—গড়ের আর আর সব?

বিশ্বস্ত পরিচালক গড়ের ঘটনা সব কহিল। বলিল—কোনো চিহ্ন নেই আর জলের উপরে কনকচাঁপা ছাড়া—

কই? বলিয়া জানকীরাম হাত বাড়াইলেন। বলিলেন—আনতে পারনি? ঘোড়ায় তুলে দিতে পার আমায়? দাও না আমায় তুলে দয়া করে—আমি একটা ফুল আনব শুধু—

নিষেধ মানিলেন না। খটখট খটখট করিয়া সেই অন্ধকারে উত্তরমুখো বাতাসের বেগে ঘোড়া ছুটিল। সকালে দেখা গেল, পরিখার মধ্যে যেখানে আজকাল ধান হইয়া থাকে—জানকীরাম পড়িয়া মরিয়া আছেন, ঘোড়ার কোনো সন্ধান নাই।

সেই হইতে নাকি প্রতিরাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে। রাতদুপুরে সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন মধ্য-আকাশে আসিয়া পৌছে, আশপাশের গ্রামগুলিতে নিষুপ্তি ক্রমশ গাঢ়তম হইয়া উঠে, সেই সময়ে রাতের পর রাত ঐ গভীর নির্জন জঙ্গলের মধ্যে চারশ বছর আগেকার সেই রাজবধূ পদ্মদীঘির হিম-শীতল অতল জলশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ান। ভাঙা ঘাটের সোপান বহিয়া বিড়াল-আঁচড়ার গভীর কাঁটাবন দুই হাতে ফাঁক করিয়া সাবধানে লঘু চরণ ফেলিয়া তিনি ক্রমশ আগাইতে থাকেন। তবু বনের একটানা ঝিঁঝির আওয়াজের সঙ্গে পায়ের নূপুর ঝুন-ঝুন করিয়া বাজিয়া উঠে, কুঙ্কুমে-মাজা মুখ…গায়ে

শ্বেতচন্দন আঁকা···সিঁথায় সেই চার শতাব্দী আগেকার সিঁদুর লাগানো···পায়ে রক্তবরন আলতা, আজও চিত্র-বিচিত্র কাঁচলি ও মেঘডম্বুর শাড়ি হইতে জল ঝরিয়া ঝরিয়া বনভূমি সিক্ত করে···বনের প্রান্তে আমের গুঁড়ি ঠেস দিয়া দক্ষিণের মাঠে তিনি তাকাইয়া থাকেন···

আবার বর্ষায় যখন ঐ গড়খাই কানায় কানায় একেবারে ভরিয়া যায়, ঘোড়া তখন জল পার হইয়া বনের সামনে পৌছিতে পারে না, মালতীমালা সেই কয়েকটা মাস আগাইয়া ফাঁকা মাঠের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ান। দুধসর ধানের সুগন্ধি খেতের পাশে পাশে ভিজা আলের উপর হিম-রাত্রির শিশিরে পায়ের আলতার অস্পষ্ট ছোপ লাগে, চাষারা সকালবেলা দেখিতে পায়, কিন্তু রোদ উঠিতে না উঠিতে সমস্তই নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া যায়।

চুরুটের অবশিষ্টটুকু ফেলিয়া দিয়া শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। মাঠের ওদিকে মুচিপাড়ায় পোয়ালগাদা, খোড়োঘর, নূতন-বাঁধা গোলাগুলি কেমন বেশ শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। চৈত্রমাসের সুশুভ্র জ্যোৎস্নায় দূরের আবছা বনের দিকে চাহিতে চাহিতে চারিদিককার সুপ্তিরাজ্যের মাঝখানে বিকালের দেখা সেই সাধারণ বন হঠাৎ অপূর্ব রহস্যময় ঠেকিল। ঐখানে এমনি সময়ে বিস্মৃত যুগের বধূ তাকাইয়া আছে, নায়ক তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া সেই দিকে যাইতেছে, কিছুই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। মনে হয়, সন্ধ্যাকালে ওখানে সে যে অচঞ্চল নিষ্ক্রিয় ভাব দেখিয়া আসিয়াছে, এতক্ষণ জঙ্গলের সে রূপ বদলাইয়া গিয়াছে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি আজও যাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই তাহারই কোন একটা অপূর্ব ছন্দ-সঙ্গীতময় গুপ্তরহস্য এতক্ষণ ওখানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার সুধারানীর কথা মনে পড়িল—সে যা-যা বলিত, যেমন করিয়া হাসিত, রাগ করিত, ব্যথা দিত, প্রতিদিনকার তুচ্ছাতিতুচ্ছ সেই সব কথা। ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের চোখে জল আসিয়া পড়িল। জাগরণের মধ্যে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া কোনোদিন সে আর আসিবে না।···ক্রমশ তাহার মনে কারণ-যুক্তিহীন একটা অদ্ভুত ধারণা চাপিয়া বসিতে লাগিল। ভাবিল, সে দিনের সেই সুধারানী, তার হাসি চাহনি, তার ক্ষুদ্রহৃদয়ের প্রত্যেকটি স্পন্দন পর্যন্ত এই জগৎ হইতে হারায় নাই—কোনোখানে সজীব হইয়া বর্তমান রহিয়াছে, মানুষে তার খোঁজ পায় না। ঐ সব জনহীন বন-জঙ্গলে এইরূপ গভীর রাত্রে

একবার খোঁজ করিয়া দেখিলে হয়। শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, কেবল মালতীমালা সুধারানী নয়, সৃষ্টির আদিকাল হইতে যত মানুষ অতীত হইয়াছে, যত হাসি-কান্নার ঢেউ বহিয়াছে, যত ফুল ঝরিয়াছে, যত মাধবী-রাত্রি পোহাইয়া গিয়াছে, সমস্তই যুগের আলো হইতে এমনি কোথাও পলাইয়া রহিয়াছে। তদ্‌গত হইয়া যেই মানুষ পুরাতনের স্মৃতি ভাবিতে বসে অমনি গোপন আবাস হইতে তারা টিপিটিপি বাহির হইয়া মনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। স্বপ্নঘোরে সুধারানী এমনি কোনোখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কত রাতে তার পাশে আসিয়া বসিয়াছে, আদর করিয়াছে, ঘুম ভাঙিলে আবার বাতাসে মিলাইয়া পলাইয়া গিয়াছে!···

বটতলায় বটের ঝুরির সঙ্গে ঘোড়া বাঁধা ছিল, ঐখানে আপাতত আস্তাবলের কাজ চলিতেছে, পৃথক ঘর আর বাঁধা হয় নাই। নিজে নিজেই জিন কষিয়া স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো শঙ্কর ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল। ঘোড়া ছুটিল। সুপ্ত গ্রামের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনুকম্পা হইতে লাগিল—মূর্খ তোমরা, জঙ্গলের বড় বড় কাঁঠাল গাছগুলাই তোমাদের কেবল নজরে পড়িল এবং গাছ মারিয়া তক্তা কাটাইয়া দু পয়সা পাইবার লোভে এত মকদ্দমা-মামলা করিয়া মরিতেছ। গভীর নিঝুম রাত্রে ছায়ামগ্ন সেই আম-কাঁঠাল-পিত্তিরাজের বন, সমস্ত ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল, পদ্মদীঘির এপার-ওপার যাঁদের রূপের আলোয় আলো হইয়া যায়, এতকাল পাশাপাশি বাস করিলে একটা দিন তাঁদের খবর লইতে পারিলে না!

গড়খাই পার হইয়া বনের সামনে আসিয়া ঘোড়া দাঁড়াইল। একটা গাছের ডালে লাগাম বাঁধিয়া শঙ্কর আমিনদের সেই জঙ্গল-কাটা সঙ্কীর্ণ পথের উপর আসিল। প্রবেশমুখের দুইধারে দুইটি অতিবৃহৎ শিরীষ গাছ, বিকালে ভজহরির সঙ্গে কথায় কথায় এসব নজর পড়ে নাই, এখন বোধ হইল মায়াপুরীর সিংহদ্বার উহারা! সেইখানে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সে সেই ছায়াময় নৈশ বনভূমি দেখিতে লাগিল। আর তাহার অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না, মৃত্যু-পারের গুপ্ত রহস্য আজি প্রভাত হইবার পূর্বে ঐখান হইতে নিশ্চয় আবিষ্কার করিতে পারিবে। আমাদের জন্মের বহুকাল আগে এই সুন্দরী পৃথিবীকে যারা ভোগ করিত, বর্তমান কালের দুঃসহ আলো হইতে তারা সব তাদের অদ্ভুত রীতি-নীতি বীর্য ঐশ্বর্য প্রেম লইয়া সৌরালোকবিহীন ঐ বন-রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। আজ জনহীন মধ্যরাত্রে যদি এই সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া নাম

ধরিয়া ধরিয়া ডাক দেওয়া যায়, শতাব্দীপারের বিচিত্র মানুষেরা অন্ধকারের যবনিকা তুলিয়া নিশ্চয় চাহিয়া দেখিবে।

কয়েক পা আগাইতে অসাবধানে পায়ের নিচে শুকনা ডালপালা মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া যেন মর্মস্থানে বড় ব্যথা পাইয়া বনভূমি আর্তনাদ করিয়া উঠিল। স্থির গম্ভীর অন্ধকারে নির্নিরীক্ষ্য সান্ত্রিগণ তাহাকে বাক্যহীন আদেশ করিল—জুতা খুলিয়া এসো।

শুকনা পাতা খসখস করিতেছে, চারিপাশে কত লোকের আনাগোনা··· জ্যোৎস্নার আলো হইতে আঁধারে আসিয়া শঙ্করের চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছে বলিয়াই সে যেন কিছু দেখিতে পাইতেছে না। মনের ঔৎসুক্যে উদ্বেগাকুল আনন্দে কম্পিত হস্তে পকেট হইতে তাড়াতাড়ি সে টর্চ বাহির করিয়া জ্বালিল।

জ্বালিয়া চারিদিক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে—শূন্য বন। বিশ্বাস হইল না, বারংবার দেখিতে লাগিল।···আর-একটা দিনের ব্যাপার শঙ্করের মনে পড়ে। দুপুরবেলা, বিয়ের কয়েকটা দিন পরেই সুধারানী ও আর কে-কে তার নূতন দামি তাসজোড়া লইয়া চুরি করিয়া খেলিতেছিল। তখন তার আর-এক গ্রামে নিমন্ত্রণে যাইবার কথা, সন্ধ্যার আগে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কি গতিকে যাওয়া হইল না। বাহির হইতে খেলুড়েদের খুব হৈ-চৈ শোনা যাইতেছিল ; কিন্তু ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতে সকলে কোন দিক দিয়া কি করিয়া যে পলাইয়া গেল—শঙ্কর দেখিয়াছিল, কেবল তাসগুলি বিছানার উপর ছড়ানো···

টর্চের আলোয় কাঁটাবনের ফাঁকে ফাঁকে সাবধানে দীঘির সোপানের কাছে গিয়া সে বসিল। জলে জ্যোৎস্না চিকচিক করিতেছে। আলো নিভাইয়া চুপটি করিয়া অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল।

ক্রমে চাঁদ পশ্চিমে হেলিয়া পড়িল। কোনো দিকে কোনো শব্দ নাই, তবু অনুভব হয়—তার চারিপাশের বনবাসীরা ক্রমশ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে। প্রতিদিন এই সময়ে তারা একটি অতি দরকারি নিত্যকর্ম করিয়া থাকে, শঙ্কর যতক্ষণ এখানে থাকিবে ততক্ষণ তা হইবে না—কিন্তু তাড়া বড্ড বেশি। নিঃশব্দে ইহারা তার চলিয়া যাওয়ার প্রতীক্ষা করিতেছে।

হঠাৎ কোনদিক হইতে হু-হু করিয়া হাওয়া বহিল, এক মুহূর্তে মর্মরিত বনভূমি শচকিত হইয়া উঠিল। উৎসবক্ষেত্রে নিমন্ত্রিতেরা এইবার যেন আসিয়া

পড়িয়াছে, অথচ এদিকে কোনো কিছুর যোগাড় নাই। চারিদিকে মহা শোরগোল পড়িয়া গেল। অন্ধকার রাত্রির পদধ্বনির মতো সহস্রে সহস্রে ছুটাছুটি করিতেছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে এখানে-ওখানে কম্পমান ক্ষীণ জ্যোৎস্না, সে যেন মহামহিমার্ণব যারা সব আসিয়াছে, তাহাদের সঙ্গের সিপাহিসৈন্যের বল্লমের সুতীক্ষ্ণ ফলা। নিঃশব্দচারীরা অঙ্গুলি-সঙ্কেতে শঙ্করকে দেখাইয়া দেখাইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল—এ কে? এ কোথাকার কে—চিনি না তো!

উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শ্রবণশক্তি দিয়া শঙ্কর আরও যেন শুনিতে লাগিল, কিছুদূরে সর্বশেষ সোপানের নিচে কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে! কণ্ঠ অনতিস্ফুট, কিন্তু চাপা কান্নার মধ্য দিয়া গলিয়া গলিয়া তার সমস্ত ব্যথা বনভূমির বাতাসের সঙ্গে চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অন্ধকারলিপ্ত প্রেতের মতো গাছেরা মুখে আঙুল দিয়া তাহাকে বারংবার থামিতে ইশারা করিতেছে—সর্বনাশ করিল, সব জানাজানি হইয়া গেল!…

কিন্তু কান্না থামিল না। নিশ্বাস রোধ করিয়া ঐ অতুল জলতলে চার শ বছরের জরাজীর্ণ ময়ূরপঙ্খীর কামরার মধ্যে যে মাধুরীমতী রাজবধূ সারাদিনমান অপেক্ষা করে, গভীর রাতে এইবার সে ঘোমটা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া নিত্যকার মতো উৎসবে যোগ দিতে চায়। যেখানে শঙ্কর পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিল, তাহার কিছু নিচে জলে-ডোবা সিঁড়ির ধাপে মাথা কুটিয়া কুটিয়া বোবার মতো সে বড় কান্না কাঁদিতে লাগিল।

তারপর কখন চাঁদ ডুবিয়া দীঘিজল আঁধার হইল, বাতাসও একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, গাছের পাতাটিরও কম্পন নাই—কান্না তখনও চলিতেছে। অতিষ্ঠ হইয়া কাহারা দ্রুতহাতে চারিদিকে অন্ধকারের মধ্যে ঘন কালো পর্দা খাটাইয়া দিতে লাগিল—শঙ্কর বসিয়া থাকে, থাকুক—তাহাকে কিছুই উহারা দেখিতে দিবে না।

আবার টর্চ টিপিয়া চারিদিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিল। আলো জ্বলিতে না জ্বলিতে গাছের আড়ালে কি কোথায় সব যেন পলাইয়া গিয়াছে, কোনো-দিকে কিছু নাই।

তখন শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে কহিতে লাগিল—আমি চলিয়া যাইতেছি, তুমি আর কাঁদিও না, হে লজ্জারুণা রাজবধূ, মৃণালের মতো দেহখানি তুমি দীঘির তল হইতে তুলিয়া ধরো, আমি তাহা দেখিব না। অন্ধকার রাত্রি,

অনাবিষ্কৃত দেশ, অজানিত গিরিগুহা, গভীর অরণ্যভূমি এ সব তোমাদের। অনধিকারের রাজ্যে বসিয়া থাকিয়া তোমাদের ব্যাঘাত ঘটাইয়া কাঁদাইয়া গেলাম, ক্ষমা করিও—

যাইতে যাইতে আবার ভাবিল, কেবল এই সময়টুকুর জন্য কাঁদাইয়া বিদায় লইয়া গেলেও না হয় হইত। তাহা তো নয়। সে যে ইহাদের একেবারে উদ্বাস্তু করিতে এখানে আসিয়াছে। জরিপ শেষ হইয়া একজনের দখল দিয়া গেলে বন কাটিয়া লোকে এখানে টাকা ফলাইবে। এত নগর-গ্রাম মাঠ-ঘাটেও মানুষের জায়গায় কুলায় না,—তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে, পৃথিবীতে বন-জঙ্গল এক কাঠা পড়িয়া থাকিতে দিবে না। তাই শঙ্করকে সেনাপতি করিয়া আমিনের দলবল যন্ত্রপাতি নকশা কাগজপত্র দিয়া ইহাদের এই শত শত বৎসরের শান্ত নিরিবিলি বাসভূমি আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া দিয়াছে। শাণিত খড়্গের মতো ভজহরির সেই সাদা সাদা দাঁত মেলিয়া হাসি—উৎপাত কি আমরা কম করছি হুজুর? সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, কম্পাস নিয়ে চেন ঘাড়ে করে করে······

কিন্তু মাথার উপরে প্রাচীন বনস্পতিরা ভ্রূকুটি করিয়া যেন কহিতে লাগিল—তাই পারিবে নাকি কোনো দিন? আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাল ঠুকিয়া জঙ্গল কাটিতে কাটিতে সামনে তো আগাইতেছ আদিকাল হইতে, পিছনে পিছনে আমরাও তেমনি তোমাদের তাড়াইয়া চলিয়াছি। বন-কাটা রাজ্যে নূতন ঘর তোমরা বাঁধিতে থাক, পুরানো ঘর-বাড়ি আমরা ততক্ষণ দখল করিয়া বসিব।···

হা-হা হা হা-হা তাহাদেরই হাসির মতো আকাশে পাখা ঝাপটাইতে ঝাপটাইতে কালো এক ঝাঁক বাদুড় বনের উপর দিয়া মাঠের উপর দিয়া উড়িতে উড়িতে গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।···

বনের বাহির হইয়া শঙ্কর ঘোড়ায় চাপিল। ঘোড়া আস্তে আস্তে হাঁটাইয়া ফিরিয়া চলিল। পিছনের বনে ডালে ডালে ঝাঁক-বাঁধা জোনাকি, আমের গুটি ঝরিতেছে তার টুপটাপ শব্দ, অজানা ফুলের গন্ধ···বারবার পিছন দিকে সে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতে লাগিল; অনেক দূরে কোথায় কুকুর ডাকিতেছে, কাহাদের বাড়িতে আকাশ-প্রদীপ আকাশের তারার সহিত পাল্লা দিয়া দপদপ করিতেছে···এইবার গিয়া সেই নিরালা তাঁবুর মধ্যে ক্যাম্প-খাটটির উপর পড়িয়া পড়িয়া ঘুম দিতে হইবে! যদি এই সময় মাঠের এই অন্ধকারের মধ্যে

সুধারানী আসিয়া দাঁড়ায়···কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুর, একপিঠ চুল এলাইয়া টিপিটিপি দুষ্টামির হাসি হাসিতে হাসিতে যদি সুধারানী ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া দুই চোখ ভরিয়া তার দিকে তাকাইয়া থাকে···মাথার উপর তারাভরা আকাশ, কোনো দিকে কেউ নাই—ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া শঙ্কর তাহার হাত ধরিয়া ফেলিবে, হাত ধরিয়া কঠোর স্বরে শুনাইয়া দিবে—কি শুনাইবে সে? শুধু তাহাকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিবে—কি করেছি আমি তোমার?

এই সময়ে হঠাৎ লাফ দিয়া ঘোড়া একটা আল পার হইল। শঙ্করের হুঁশ হইল, এতক্ষণের মধ্যে এখনও গড়খাই পার হয় নাই—জঙ্গল বেড়িয়া ঘোড়া ক্রমাগত ধানখেতের উপর দিয়াই চলিয়াছে। জুতা-পায়ে জোরে ঠোকর দিল, আচমকা আঘাত পাইয়া ঘোড়া ছুটিল। গড়খাইয়ের যেন শেষ নাই, যত চলে ততই ধানবন, দিক ভুল হইয়া গিয়াছে, মাঠে না উঠিয়া ধানবন ঘুরিয়া মরিতেছে। শঙ্করের মনে হইতে লাগিল, যেমন এখানে সে মজা দেখিতে আসিয়াছিল, ঘোড়াসুদ্ধ তাহাকে ঐ বনের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সমস্ত রাত ছুটিলেও কেবল বন প্রদক্ষিণ করিতে হইবে—নিষ্কৃতি নাই—গড়খাই পার হইয়া মাঠে পৌঁছানো রাত পোহাইবার আগে ঘটিবে না। জেদ চাপিয়া গেল, ঘোড়া জোরে—আরও জোরে—বিদ্যুতের বেগে ছুটাইল, ভাবিল এমনি করিয়া সেই অদৃশ্য ভয়ানক বাঁধন ছিঁড়িবে। আর একটা উঁচু আল, অন্ধকারে ঠাহর হইল না, ছুটিতে ছুটিতে হুমড়ি খাইয়া ঘোড়া সমেত তাহার উপর পড়িল। শঙ্করের মনে হইল, ঘোড়ার ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে আলের উপর কে জোরে আছাড় মারিল। তীব্র আর্তনাদ করিতে করিতে সে নিচে গড়াইয়া পড়িল। ঘোড়াও ভয় পাইয়া গেল, শঙ্করকে মাড়াইয়া ফেলিয়া ঝড়ের মতো মাঠে গিয়া উঠিল। শুকনা মাঠের উপর দ্রুতবেগে খুর বাজাইতে লাগিল—খটখট খটখট। রাত্রির শেষ প্রহর, আকাশে শুকতারা জ্বলিতেছে। চার শ বছর আগে যেখানে একদা জানকীরাম পড়িয়া মরিয়া ছিলেন, সেইখানে অর্ধমূর্ছিত শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, সেই জানকীরাম কোন দিক হইতে আসিয়া তাহাকে ফেলিয়া ঘোড়া কাড়িয়া লইয়া উত্তর-মাঠের ওপারে তেঘরা-বকচরের দিকে চলিয়া যাইতেছেন। ঘোড়ার খুরের শব্দ আঁধার মাঠে ক্রমশ মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

রাজা

উড়ো খবর নয়—পোস্টকার্ডের চিঠি, সুধীর নিজ হাতে লিখিয়াছে—

> বাবা, বহুদিন আপনাদের কুশল-সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত আছি। শনিবার বারোটার গাড়িতে বাড়ি পৌঁছিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিব এবং বিস্তারিত সাক্ষাৎমতে নিবেদন করিব—

শনিবার অর্থাৎ আগামী কাল। নিবারণ তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে খবর জানাইলেন। পুরা দুইটি বছর অন্তে ছেলে বাড়ি আসিতেছে। ছুটি পায় নাই বলিয়া নহে, বরঞ্চ এতদিন ছুটি ছিল দিবা-রাত্র চব্বিশ ঘণ্টাই। চাকরির উমেদারিতে এ যাবৎ যত হাঁটাহাঁটি করিয়াছে, তাহার সমষ্টিতে বোধকরি পদব্রজে ভারতবর্ষ হইতে ল্যাপল্যাণ্ড অবধি পরিভ্রমণ সারা হইয়া যায়। যাহা হউক চাকরি জুটিয়াছে, ভালো চাকরি—এবং এই প্রথম ছুটি।

পাঁজি খুলিয়া নিবারণ মনোযোগসহকারে শনিবার তারিখটার গোড়া হইতে আগা অবধি পড়িয়া ফেলিলেন, একটা কিছু পূজাপার্বণ চোখে পড়িল না। ছুটিটা কিসের সাব্যস্ত হইল না। বুধবারে ঈদের বন্ধ আছে বটে, চিঠির তারিখটা শনিবার কি বুধবার লিখিয়াছে—দৃষ্টি-বিভ্রম হইতে পারে, ভালো করিয়া আর একবার মিলাইয়া দেখিতে বালিশের নিচে হাত দিলেন, তারপর বিছানা উলটাইয়া ফেলিলেন, তবু চিঠি পাওয়া গেল না। যতদূর মনে পড়ে, বালিশের তলায় রাখা ছিল, তবে যায় কোথায়?

চিঠি তখন চলিয়া গিয়াছে উত্তরের ঘরে বাদামতলার দিককার জানালার কাছে। চোরে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে—চোর কিরণমালা। চার-পাঁচ লাইনের চিঠি, কিন্তু খুকির জ্বালায় কথা কয়টা স্থির হইয়া পড়িবার জো আছে? থাবা দিয়া ধরিতে যায়। অবশেষে ছোট ননদ পটলীকে অনেক খোশামোদ করিয়া তাহার কোলে খুকিকে পাড়ায় পাঠাইয়া দিল। তারপর কিরণ এদিক-ওদিক তাকাইয়া আর একবার সবেমাত্র কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়াছে, আবার বিপদ! শাশুড়ী আসিয়া ঢুকিলেন। কিরণ চিঠি ঢাকিয়া ফেলিল। শাশুড়ী সেকেলে মানুষ, অতশত দেখেন না; আসিয়াই বলিলেন—বৌমা, বিছানার চাদর ওয়াড়-টোয়াড়গুলো খুলে দাও তো শিগগির—এখন ক্ষারে সেদ্ধ করে রাখি, ভোর থাকতে থাকতে কেচে দেব—কেমন?

বধূ সায় দিয়া বলিল—হ্যাঁ মা, কি রকম বিচ্ছিরি ময়লা হয়ে গেছে, দেখো না—

শাশুড়ী বলিলেন—খোকা বারোটার গাড়িতে যদি আসে···তার আগেই সব কেচে দেব। নোংরামি মোটে সে দুচক্ষে দেখতে পারে না। আর তোমাকেও বলে দিচ্ছি মা, এ রকম পাগলী মেয়ের মতো বেড়াতে পারবে না—কালকে সকাল-সকাল নেয়ে ফিটফাট থেকো। যে যেমন চায় তেমনি থাকতে হয়। শহরে-বাজারে থাকে, বোঝ না?

আনন্দে কিরণের বুকের ভিতরে কেমন করিতে লাগিল, হাসিও পাইল। খোকা—বুড়ো খোকা—অত বড় গোঁফওয়ালা ছেলে, এখনও মা কিনা খোকা বলিয়া ডাকেন!

এদিকে বাইরে নিবারণের গলা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। ঘটনাটা এই—নটবর কামার বছর পাঁচ-সাত আগে একখানা বঁটি গড়াইয়া দিয়াছিল, তাহার দরুন এখনও তিন আনার পয়সা বাকি। উক্ত পয়সার তাগাদা করিতে আসিয়া এমনভাবে চাপিয়া ধরিয়াছে যে, তৃতীয় ব্যক্তি কেহ উপস্থিত থাকিলে নিশ্চয় মনে ভাবিত, ঐ তিন আনার পয়সা এখনই হাতে না পাইলে বেচারা সবংশে নির্ঘাত মারা যাইবে। কিন্তু নিবারণ বহুদর্শী ব্যক্তি, অপরে যে প্রকার ভাবুক—নটবরের জন্য তাঁহার দুশ্চিন্তা হইল না। বলিলেন—রোসো, এইবারে ঠিক—আর একটা দিন মোটে—কাল সুধীর বাড়ি আসবে, কাল আর নয়, পরশু সকালের দিকে এসো একবার—পাই পয়সাটি অবধি হিসেব করে নিয়ে যেও। নাও কলকেটা ধরো—

বলিয়া হুঁকা হইতে নটবরের হাতে কলিকা নামাইয়া দিয়া আবার শুরু করিলেন—শোন নি নটবর, বল কি—শোন নি, কানে তুলো দিয়ে থাক না কি? আমার সুধীরের মস্ত বড় চাকরি হয়েছে, দেড়শ টাকা মাইনে—

কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া বলা নিবারণের অভ্যাস, এ গ্রামের সকলেই ইহা জানে। পাওনাদার এবং আত্মীয়স্বজন বহুবার নিবারণের মুখে শুনিয়াছে—চাকরি ঠিক হয়ে গেছে, এখন সাহেব বিলাত থেকে পৌঁছতে যা দেরি। এবারে আর ভুয়ো নয়, আসছে মাসের পয়লা থেকে নিশ্চয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহেব কখনও বিলাত হইতে আসিয়া পৌঁছে নাই এবং মাসের পর মাস অনেক পহেলাই কালসমুদ্রে তলাইয়া গিয়াছে। সুধীরের চাকরির কথা তাই লোকে বড় বিশ্বাস করে না। তবে এবারের কথা স্বতন্ত্র। দোকানে বসিয়া হাপর টানিতে টানিতে

নটবরও যেন কাহার মুখে শুনিয়াছে, সুধীরের ভারি কপাল-জোর, ভালো চাকরি পাইয়াছে। এখন ঐ দেড়শ টাকার কথা যদি বাদ-সাদ দিয়া অন্তত সত্যকার টাকা পঁচিশেও দাঁড়ায়, তবু নটবরের তিন আনা আদায় হইবার উপায় হইয়াছে। সে পুলকিত হইল।

নিবারণ পুত্রগর্বে স্ফীত হইয়া বলিতে লাগিলেন—সেদিন দাকোপার পাঁচু ঘোষের সঙ্গে দেখা—পিসি আর বৌকে নিয়ে কালীঘাট গিয়েছিল। সুধীর দেখতে পেয়ে এই টানাটানি—বাসায় না নিয়ে ছাড়লই না। পাঁচু বলে—দাদা, বলব কি—মস্ত তিনমহল বাড়ি ভাড়া করেছে, ঝি-চাকর যে কতগুলো গুনে ঠিক করতে পারলাম না। মাইনে দেড়শ আর উপরি—সকালে আপিসে যায় খালি পকেটে, সন্ধ্যাবেলা দু পকেট যেন ছিঁড়ে পড়ে। টাকার বোঝা নিয়ে হেঁটে আসতে পারবে কেন, গাড়ি করে ফিরতে হয়। দেখা হলে একবার পাঁচু ঘোষকে জিজ্ঞাসা করে দেখো।

নটবরের গা শির-শির করিয়া উঠিল—এই সেদিনের সুধীর, তাহার দোকানের সামনে দিয়া খালি পায়ে জেলেপাড়া হইতে মাছ লইয়া আসিত। বলিল—তা বেশ—বড্ড ভালো কথা, আর আপনার দুঃখ কি চৌধুরি মশাই, রাজ্যেশ্বর ছেলে—

নিবারণ বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—তোমরা পাঁচ জনে ভালো বললেই ভালো। পাঁচু যা বললে—বুঝলে—শুনে তাক লেগে যায়—পেত্যয় হয় না। রাজরাজড়ার কাণ্ডই বটে। শুনেছ বোধ হয়, এবার আমরা বাড়িসুদ্ধ কলকেতায় চলে যাচ্ছি, সুধীর আসছে সেই সব ঠিকঠাক করতে—

নিবারণ চুপিচুপি কথা বলিবার লোক নহেন, বিশেষত ছেলের এই সৌভাগ্যের কথা। ঘরের ভিতর হইতে কিরণ শুনিতে পাইল, সুধীর দেড়শ টাকার চাকরি পাইয়া রাজরাজড়ার কাণ্ড আরম্ভ করিয়াছে। কিরণ একবারও কলিকাতায় যায় নাই এবং সত্যকার রাজারা যে কি প্রকার কাণ্ড করিয়া থাকে তাহাও সঠিক আন্দাজ করিতে পারে না। গ্রামে শখের থিয়েটার আছে, অতএব রাজা সে অনেকবার দেখিয়াছে—গায়ে জরির ঝকমকে পোশাক, মাথায় মুকুট। সুধীরের মাথার উপর মুকুট বসাইয়া দিলে কি রকম দেখায় তাহাই সে সকৌতুকে কল্পনা করিতে লাগিল। নিবারণ সত্যবাদী যুধিষ্ঠির নয়, তাহা কিরণ জানে। তবু আজিকার কথাগুলি মিথ্যা বলিয়া ভাবিতে কিছুতেই প্রাণ চাহে না। অনেকবার অনেক আশা করিয়া শেষে সমস্ত মিথ্যা হইয়া

গিয়াছে, এবারে মিথ্যা হইলে সে মরিয়া যাইবে। এইটুকু জীবনে সে অনেক দুঃখ পাইয়াছে, সে এক সাতকাণ্ড রামায়ণ। ছেলেবেলায় কিরণের মা মরিয়া গেলে বাবা আবার বিবাহ করেন। নূতন মা কিরণকে মোটে দেখিতে পারিত না, এখন আর তাহাকে বাপের বাড়ি লইয়া যাইবার নামও কেহ করে না।··· সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে, বাদাম গাছের ফাঁকে চাঁদ উঠিল। কিরণের মনে হইল যেন কোন অনির্দেশ্য স্থানে বসিয়া তাহার অনেক দিনের হারানো মা তাকাইয়া দেখিতেছেন এবং বড় খুশি হইয়াছেন যে সুধীর রাজা হইয়াছে, আর সে—তাঁহার সেই জন্মদুঃখিনী মেয়ে, এতকালের পর হইয়াছে রাজার পাটরানী! আয়না ও চুলের দড়ি পাড়িল ; আবার ভাবিল—দূর হোক গে, চুল বাঁধব না আর আজ, বেলা একেবারে গেছে। রান্নাঘরে আসিয়া উনান ধরাইতে গিয়া ভাবিল—এত সকাল সকাল কিসের রান্না! ছেলেমানুষের মতো খিলখিল করিয়া হাসিতে ইচ্ছা করে, তাহার যেন কি হইয়াছে, তাহাকে ঠিক ভূতে ধরিয়াছে···

পটলি পাড়া বেড়াইয়া আসিয়া খুকিকে কিরণের কোলে ঝপ করিয়া ফেলিয়া দিল। তখনই ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়। কিরণ ডাকিল—ও পটলি, যাচ্ছিস কোথা? শোন্—সুশীলাদের বাড়ি গেছলি? তার বর নাকি এসেছে—কলকেতায় বাসা করেছে, তাকে নিয়ে যাবে, সত্যি? পটলি দৃকপাত না করিয়া কোমরে আঁচল জড়াইয়া উঠানে কুমির-কুমির খেলিতে গেল।

উঠানে যেন ডাকাত পড়িয়াছে, পাড়ার ছেলেমেয়েদের কোলাহলে কান পাতা যায় না। পটলি হইয়াছে কুমির আর উত্তর ও পূর্ব ঘরের দাওয়া হইয়াছে ডাঙা। সেই ডাঙার উপর হইতে উঠানরূপ নদীতে সকলে যেই নাহিতে নামে, পটলি দৌড়াইয়া তাহাদের ধরিতে যায়। রান্নাঘর হইতে মেয়ে কোলে কিরণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।···খুকির মোটে চারিটা দাঁত উঠিয়াছে, কিরণ খুকির গালের মধ্যে একবার একটা আঙুল দিয়াছে আর অমনি সে কামড়াইয়া ধরিল।

—ওরে রাক্কুসী ছাড় ছাড়—মরে গেলাম, ভারি যে দাঁতের দেমাক হয়েছে তোমার!

কিরণ হাত ছাড়াইয়া লইল। খুকি হাসিতে লাগিল। কিরণ খুকির দিকে তাকাইয়া মুখ নাড়িয়া বলে—অত হেসো না খুকি, অত হেসো না। সব মানিক পড়ে গেল, সব মুক্তো ঝরে গেল।···মেয়ে মোটে এইটুকু, বুদ্ধি কত—

সব বোঝে, চৌকাঠ ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, আবার হাততালি দিয়া বলে—তা—তা—তা—

কিরণ বলিল—হাঁ করে হাবলার মতো দেখছ কি? ড্যাবডেবে চোখ মেলে একনজরে কি দেখছ আমার মানিক? খেলা দেখছ? তুমিও খেলো, বড় হও আগে। ঠাণ্ডা হয়ে বাবু হয়ে বোসো তো—এই যে দোলে—দোলে—

দোলন দোলন দুলুনি,
রাঙা মাথার চিরুনি
বর আসবে যখনি
নিয়ে যাবে তখনি—

খুকি তালে তালে কেমন দোলে! কিরণ মেয়েকে মুখের উপর তুলিয়া কচি কচি নরম হাত-বুক-গাল চাপিয়া ধরিতে লাগিল। খুকির খুব আনন্দ হইয়াছে, মাথা নাড়ে আর টানিয়া টানিয়া বলে—বা-আ-আ—বা—বা। মেয়ে বাবাকে দেখে নাই, সুধীর বাড়ি হইতে যাইবার সময় কেবল মধুর সম্ভাবনার কথাটি জানিয়া গিয়াছিল। কিরণ ফিসফিস করিয়া বলিল—খুকি, দেখিস—দেখিস, কালকে বাবা আসবে—তোর খোকা বাবা—মার যেমন কাণ্ড, অত বড় ছেলে, এখনও খোকা—হি-হি। ছেলেমানুষের মতো হাসিতে লাগিল। তারপর চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, কেহ কোনোখান হইতে শুনিতে পায় নাই তো? এমন সোনার চাঁদ তাহার কোলে আসিয়াছে—সুধীর তা জানে না, চোখে দেখে নাই, সুধীরের জন্য মনে করুণা হইল। আবার রাগ হইল—এই তো চিঠিপত্রে খবর পাইয়াছে, একবার কি এতদিনের মধ্যে মেয়েকে দেখিয়া যাইতেও ইচ্ছা করে না?

সেইদিন গভীর রাত্রে কিরণ বিছানায় শুইয়া আছে, ঘুম আর আসে না। মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে, দু-তিনবার উঠিয়া মাটির কলসি হইতে জল গড়াইয়া মুখে চোখে দিল। এইবার ঠিক ঘুম আসিবে, চোখ বুজিয়া শুইল। বেড়ার ফাঁকে জ্যোৎস্না আসিয়া অনেকদিন আগেকার স্নেহস্পর্শের মতো সর্বাঙ্গ জড়াইয়া ধরিল। দুই বছর কম সময় নয়।···সুধীরকে গ্রামসুদ্ধ সকলে অকর্মণ্য ঠাওরাইয়াছিল, সেই সঙ্গে কিরণেরও দোষ পড়িয়াছিল, নাকি বরকে আঁচলছাড়া হইতে দেয় না। শাশুড়ী স্পষ্ট কিছু বলিতেন না, কিন্তু ওর চেয়ে মুখোমুখি হইলেই যে ভালো হইত। শেষাশেষি এমন হইয়াছিল, সুধীর

বাড়ি হইতে বাহির হইলে সে বাঁচে। মুখ ফুটিয়া এ কথা বলিতে সাহস হইত না, কাহাকেও দোষ দিবার উপায় ছিল না, এক-এক সময়ে কিরণের মনে হইত—ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া ওঠে! যেদিন সুধীর রওনা হইল সেদিন সে খুশি হইয়াছিল, এখন সে-সব কথা ভাবিলে বড় কষ্ট হয়। আর লোকটিরও এমন ধনুক-ভাঙা পণ—চাকরি নাই-বা হইল, এতদিনের মধ্যে একবার বাড়ি আসিয়া গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত নাকি? কিন্তু সে দুঃখের দিন কাটিয়াছে, সুধীর হইয়াছে রাজা, কাজেই কিরণ রাজরানী—কাল সে বাড়ি আসিবে। কাল এতক্ষণ—

আগামী কাল এতক্ষণ যে কি হইতেছে চক্ষু বুজিয়া সে সেই মনোরম ভাবনা ভাবিতে লাগিল।

ঘরে ঢুকিয়া হয়তো দেখিবে ক্লান্ত সুধীর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, জলের গ্লাসটা খুঁজিতে খুঁজিতে হেরিকেন তুলিয়া কিরণ দেখিয়া লইবে। আলোটা মুখের কাছ দিয়া বার বার ঘুরাইবে, তবু চক্ষু খুলিবে না। পা ধুইয়া জলের ঘটি ঠনাত করিয়া তক্তপোশের নিচে রাখিবে, সজোরে দোরে খিল দিবে, তারপর খুকির মাথাটা বালিশের উপর সাবধানে তুলিয়া দিয়া মশারি গুঁজিতেছে—

সুধীর আলগোছে একখানা হাত বাড়াইয়া খপ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে।

আসলে সুধীর ঘুমায় নাই, ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া ছিল, কিংবা ঘুমাইলেও ইতিমধ্যে কখন জাগিয়াছে, আগে সাড়া দেয় নাই।

কিরণ বলিবে—বড্ড গরম, চল—দাওয়ায় বসিগে। কেমন ফুটফুটে জ্যোৎস্না দেখেছ?

সুধীর হাসিয়া বলিবে—ভয় করবে না? বাদামগাছে এক পা আর তাল গাছে এক পা—ঐ যে মস্ত একটা কি দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছ?

কিরণ বড় ভীতু। বিয়ের কিছুদিন পরে একদিন রাত্রিতে সে রাগ করিয়াছিল, তারপরে সুধীর ভূতের ভয় দেখাইয়া তাহাকে এমন বিপদে ফেলিয়াছিল সে কথা ভাবিলে হাসি পায়। সে সময়ে কি বোকাই না ছিল!

কিরণ বলিবে—ভয় দেখাচ্ছ, আমায় কচি খুকি পেয়েছ নাকি?

তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ আসিবে—কক্ষনো না, কচি খুকি ভাবব—সর্বনাশ! কুড়ি পেরুল, বুড়ি হতে আর বাকি কি?

—এখন আমার মোটেই ভয় করে না—কি দেখে বল, একলা-একলা এখনি

খালের ঘাটে চলে যাচ্ছি। তারপর কিরণ হঠাৎ আর-এক কথা জিজ্ঞাসা করিবে—কলকাতায় যে বাসা করেছ, সে নাকি তিনতলা? ছাত থেকে কেল্লা দেখা যায়? গড়ের মাঠ কতদুর? সুশীলার বর যেখানে বাসা করেছে সে বাড়ি চেন? তুমি আপিসে গেলে আমি দুপুরবেলা খুকিকে নিয়ে সুশীলাদের বাসায় বেড়াতে যাব কিন্তু—

অথবা এরূপও হইতে পারে।…হয়তো কাজকর্ম সারিয়া মেয়ে কোলে কিরণ যখন আসিয়া ঢুকিবে, তখন সুধীর শিয়রে আলো রাখিয়া নভেল পড়িতেছে। নভেল পড়া তো ছাই—কিরণকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বই রাখিয়া দিবে, তারপর হাত ধরিয়া বসাইবে। বলিবে—এত দেরি হল? ভালো আছ তো? কই, মেয়ে দেখাও—দেখি—দেখি—

দেখাইবে না তো, মেয়ের মুখ কিরণ কিছুতে দেখাইবে না। কেন, এই যে এত চিঠিপত্র দাও—মেয়ের কথা ভুলিয়াও একবার লিখিয়া থাক? মেয়ে কি গাঙের জলে ভাসিয়া আসিয়াছে—মেয়ের বুঝি মান নাই!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখাইতে হইবে। সুধীর পকেট হাতড়াইবে। ও মা, একছড়া খাসা হার চিকচিক করিতেছে, অতবড় হার ঐটুকু মেয়ের জন্যে! মজা দেখো না, চারটে দাঁত উঠেছে—তিন দিনের ভেতর দস্যি মেয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে চেপটা করে দেবে।

বাপ নিজের হাতে মেয়ের গলায় হার পরাইয়া দিবে। কিরণ বলিবে—রাত্তিরটা গলায় থাকুক, কাল সকালে কিন্তু মনে করে হার খুলে নিও—ফের নীল কাগজে মুড়ে ভালোমানুষের মতো মার হাতে নিয়ে দিও। হ্যাঁগা, তাই করতে হয়—মাকে বোলো, মা এই তোমার নাতনীর হার নাও—মা খুশি হয়ে খুকির গলায় পরিয়ে দেবেন, সে কেমন হবে বল তো?

ঘুমন্ত মেয়ে ন্যাকড়ার মতো বাপের বুকে লাগিয়া থাকিবে। সুধীর বলিবে—ইঃ, একেবারে যে তোমার মতো হয়েছে—চোখদুটো, গায়ের রঙ, পায়ের গড়ন, একচুল তফাত নেই—

সুখের হাসি হাসিয়া কিরণ বলিবে—কিন্তু নাকটা যে বাপের। বিয়ের সময় ঐ বোঁচা নাকের দাম ধরে দিতে হবে হাজার টাকা।

নাকের উচ্চতা কি পরিমাণ হইলে ঠিক মানানসই হয়, তাহার তর্ক উঠিবে—সে-ই তাহাদের পুরাতন তর্ক।

জ্যোৎস্নাময় চৈত্র-রাত্রির স্নিগ্ধ বাতাসে ঘরকানাচে বাদামগাছের পত্রমর্মর

…ঘুমের ঘোরে খুকির ছোট্ট বুকখানা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। বাহির-বাড়ির ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপের ফাটলে তক্ষক ডাকে, চারিদিকের অতল নিষুপ্তির মধ্যে কিছু সময় অন্তর তাহার রব শোনা যায়—কটর্‌র্‌র্ তক্ক তক্ক !…বিবাহের পরবর্তী স্বপ্নস্মৃতির টুকরা টুকরা আগামী দিনের মধুর কল্পনার সহিত মিলিয়া সেই রাত্রে একটি নিদ্রাহারা বিমুগ্ধ গ্রামবধূর মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সকালে রোদ না উঠিতেই ননদ-ভাজে খালের ঘাটে গিয়া বাসনের বোঝা নামাইল। বাসন মাজা তো উপলক্ষ, কেবল গল্প আর গল্প—এমনি করিয়া উহারা রোজ এক প্রহর বেলা কাটাইয়া আসে। স্টেশন হইতে সাঁকো পার হইয়া গ্রামে আসিতে হয়। কিরণ সাঁকো পিছন করিয়া বাসন মাজিতেছিল, হঠাৎ পটলি চেঁচাইয়া উঠিল—ও মা, এত সকালে এসে পড়ল? তাড়াতাড়ি এঁটো হাতেই কিরণ ঘোমটা টানিল। পটলি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—ও বৌদি, কলাবৌ সাজলি কেন? আমি কার কথা বললাম? আসছে আমাদের মুংলি গাইটা।

মুংলি গোরু আসিতেছিল ঠিক, কিন্তু পটলি যে ভঙ্গি করিয়া বলিয়াছিল, সেটা মুংলির সম্পর্কে নিশ্চয় নয়। পোড়ারমুখী মেয়ে এই বয়সে এমন পাকা হইয়াছে!

কিরণ বলিল—তাই বই কি! তুমি বড্ড ইয়ে হয়েছ, গুরুজনের সঙ্গে ঠাট্টা—তোমায় দেখাচ্ছি—বলিয়া বড় রাগিয়া শাসন করিতে গিয়া পারিল না, শাসন করিবে, না হাসি চাপিবে?

এদিকে নিবারণ ভারি ব্যস্ত। উঠিয়া আগে বেড়ার গায়ে ছাতিমগাছের কয়েকটা ডাল ছাঁটিয়া দিলেন, পথটা যেন আঁধার করিয়া ফেলিয়াছিল। তারপর নিশি গাঙ্গুলির বাড়ি গিয়া বলিলেন—একটা টাকা হাওলাত দিতে পার গাঙ্গুলি? কালকে নিও—

গাঙ্গুলি নিরাপত্তিতে টাকা বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন—সুধীর বাবাজি আজ আসছেন বুঝি! বাজারে যাচ্ছ? সাজা তামাকটা খেয়ে যাও, বেলা হয় নি। আর আমার কথাটা মনে আছে তো?

নিশি গাঙ্গুলির কথাটা হইতেছে, সুধীরকে বলিয়া তাহার আপিসে বা অন্য কোথাও মেজ ছেলে হেমন্তর একটা চাকরি করিয়া দিতে হইবে।

তামাক খাইয়া এবং গাঙ্গুলিকে বিশেষ প্রকারে আশ্বাস দিয়া নিবারণ উঠিলেন।

বাজারে মাছ কিনিতে গিয়া বিষম বিভ্রাট। চারিটা সরপুঁটি আসিয়াছে, তাহার ন্যায্য দর চার আনার বেশি এক আধেলাও নয়। নিতান্ত গরজ বলিয়া পাঁচ আনা অবধি দর দিয়া নিবারণ ঘণ্টাখানেক ধন্না দিয়া বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে খোশামোদ চলিতেছে—ও পাড়ুয়ের পো, তুলে দে—অলেজ্য দর হয় নি। ছেলে বাড়ি আসবে, বড় চাকরে—আমাদের মতো কচুঘেচু দিয়ে খাওয়া তো অভ্যেস নেই! দে বাবা তুলে দে—। কিন্তু পাড়ুয়ের পুত্র কিছুতেই ভিজিতেছিল না। এমন সময় অক্রূর মোড়ল আট-আনা বলিয়া ধাঁ করিয়া মাছ ক-টা লইল।

নিবারণ একেবারে মারমুখী। অক্রূরও ছাড়িবে কেন—গতকল্য মন দশেক গুড় বেচিয়াছে, গুড়ের দর যাহাই হউক, একসঙ্গে অতগুলি টাকা গাঁটে থাকায় তাহার মেজাজ ভিন্ন প্রকার।

গ্রামের জনকয়েক নিবারণকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া হাত ধরিয়া ভিড়ের ভিতর হইতে সরাইয়া লইয়া গেল। কিন্তু নিবারণের রাগ মিটে নাই—ছোটলোকের এত আস্পর্ধা—আসুক সুধীর, দেখা যাইবে কত ধানে কত চাল!

সুধীর যখন পৌঁছিল তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে। আজ আর আসিল না সাব্যস্ত করিয়া বাড়িসুদ্ধ সকলের খাওয়া-দাওয়া সারা হইয়াছে, কিরণ এইবার চারিটা মুখে দিবে। কি মনে করিয়া ও-ঘরে যাইতেছিল, এমন সময়ে দেখিল সাঁকোর উপর একটা ছাতি, শেষে আরও ভালো করিয়া দেখিল। তারপরে রান্নাঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

সুধীর আসিয়া ডাকিল—মা, ও মা, কোথায় সব?

সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে, টিনের একটি সুটকেস স্টেশন হইতে নিজেই বহিয়া আনিয়াছে, কলিকাতার বাসায় যে অগুন্তি চাকর-বাকর তাহার একটাও সঙ্গে আনে নাই।

মা আসিয়া পাখা করিতে লাগিলেন। পটলি খুকিকে কোলে লইয়া সামনে দাঁড়াইল। সুধীর এক নজর চাহিয়া দেখিল, চেহারা মলিন রুক্ষ—সে শ্রী নাই, হয়তো চাকরির খাটুনিতে, তার উপর পথের কষ্ট।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া একটু জিরাইবারও অবকাশ হইল না, ইতিমধ্যে গ্রামের হিতাকাঙ্ক্ষীরা আসিয়াছেন। শ্রীদাম মল্লিক সকলের চেয়ে প্রবীণ, সুধীর সর্বাগ্রে তাঁহার পায়ের ধূলা লইল। মল্লিক মহাশয় বলিলেন—শুনলাম সব কথা নিবারণের কাছে, শুনে যে কি আনন্দ হল! এখন বেঁচেবর্তে থাকো, অখণ্ড পরমাই হোক! বুড়ো বাপমাকে এইবারই নিয়ে যাচ্ছ তো? নিয়ে যাবে বই কি! গঙ্গায় চান করবে, হরিনাম করবে, এর চেয়ে আর ভাগ্যির কথা কি! আমাদের পোড়া কপাল—আমরাই পড়ে রইলাম পচা ডোবায়। বলিয়া একটি নিশ্বাস ফেলিলেন।

ভগবতী আচার্য কিঞ্চিৎ হস্তরেখাদি বিচার ও ফলিত-জ্যোতিষের চর্চা করিয়া থাকেন। বলিলেন—বলেছিলাম কিনা নিবারণ-দা, বৃহস্পতি তুঙ্গী—তোমার সুধীর রাজা হবে। ঊর্ধ্বরেখা আঙুলের গোড়া অবধি চলে এসেছে—বলি নি?

নিবারণের সে কথা মনে পড়ে না, কিন্তু ঘাড় নাড়িলেন।

নিশি গাঙ্গুলিও আসিয়াছিলেন। বলিলেন—বাবাজি, আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যের পর একবার অবিশ্যি করে যেও—তোমার খুড়িমা ডেকেছেন।

অমনি ড্রামাটিক ক্লাবের ছেলেরা সমস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিল—সে কি করে হবে? সন্ধ্যের পর সুধীরবাবু আমাদের রিহার্শাল দেখতে যাবেন যে। ওঁকেই এবার ক্লাবের সেক্রেটারি করা হবে—কালকে আমরা মিটিং করব।

সুধীর সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—সেক্রেটারি আমাকে কেন? আমাকে বাদ দাও, আমি থিয়েটারের কিছু বুঝি নে।

দলের একজন বলিল—তাতে কি হয়েছে, আমরাই সব বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দেব। এই ধরুন, আপাতত উদ্যান দুর্গ আর অন্তঃপুর-সংলগ্ন প্রাসাদ এই তিনটে সিন, গোটা পাঁচেক চুল-দাড়ি, দুটো রয়াল ড্রেস আর একটা হারমোনিয়ম কিনে দেবেন—ব্যস। আমাদের নারদ যে কি চমৎকার গান গায় শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। কিন্তু দুঃখের কথা কি বলব, জুতসই একটা দাড়ির অভাবে অমন প্লেটা নামাতে পারছি নে।

গাঙ্গুলি পুনশ্চ বলিলেন—যেমন করে হোক একবার যেতেই হবে বাবাজি, নইলে তোমার খুড়িমা ভারি কষ্ট পাবে। সারাদিন বসে বসে চন্দোরপুলি বানিয়েছে। আমি হেমন্তকে পাঠিয়ে দেব, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

অনেকের অনেকপ্রকার আবেদন, সুধীর উঠিল। জামা গায়ে দিবার জন্য ঘরে ঢুকিয়া দেখে, সেখানে মাত্র একটি প্রাণী—একলা কিরণ চুল বাঁধিতেছে। কিরণের বুকের ভিতর টিপটিপ করিতে লাগিল, যে দুষ্ট এই সুধীর!···কিন্তু তাহার সে দুষ্টামি আর নাই তো! শান্ত ভাবে জামাটা পাড়িয়া গায়ে দিল, একটা মুখের কথাও জিজ্ঞাসা করিল না।

ভাবখানা এমন, যেন তাহারা দুটিতে বরাবর বারো মাস একসঙ্গে ঘর-গৃহস্থালি করিয়া আসিতেছে।

পটলি খুকিকে আনিয়া বলিল—দাদা, একবার কোলে নাও না! দেখো, তোমায় দেখে কেমন করছে।

সুধীর দাঁড়াইল, একবার হাসিয়া মেয়ের দিকে তাকাইল, তারপর কহিল—এখন বড় ব্যস্ত রে। সব দাঁড়িয়ে রয়েছেন—থাকগে এখন।

ড্রামাটিক ক্লাবের যতগুলি লোক—কেহই কলিকাতাবাসী ভাবী-সেক্রেটারির সম্মুখে গুণপনার পরিচয় দিতে ত্রুটি করিল না। ফলে রিহার্শাল যখন থামিল, তখন চাঁদ মাথার উপরে। নারদ যাইবার মুখেও একবার দাড়ির তাগাদা দিল। সুধীর বলিল—ব্যস্ত হবেন না, কালকের মিটিঙে একটা এষ্টিমেট ঠিক হবে।

দু-তিনজন আসিয়া সুধীরকে বাড়ি অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া গেল।

দোরে খিল আঁটা, একটা জানালা খোলা ছিল। সুধীর দেখিল—মিটমিট করিয়া হেরিকেন জ্বলিতেছে, থালায় ও বাটিতে ভাত-ব্যঞ্জন ঢাকা দেওয়া এবং ঠিক তাহার পাশেই মাটির মেঝেয় কিরণ ঘুমাইয়া আছে। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া অবশেষে বেচারি ওখানেই শুইয়া পড়িয়াছে। মনটা কেমন করিয়া উঠিল, ডাকিল—কিরণ, ও কিরণ—

দু-বছর আগেকার সেই ডাক একেবারে ভুলিয়া যায় নাই তো!

কিরণ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দোর খুলিয়া দিল। সুধীর বলিল—তাড়াতাড়ি করছ কেন, বোসোই না। ভাতের দরকার নেই, গাঙ্গুলি-গিন্নির যা কাণ্ড—তিন দিন না খেলেও ক্ষতি হবে না।

কিরণ মৃদু হাসিয়া বলিল—তিন দিন থাকছ তো? বাবাকে আজ আসবার জন্যে লিখে দিলাম, পত্তোর পেয়ে মঙ্গলবার নাগাদ ঠিক এসে পড়বেন—এ তিনটে দিন থাকতে হবে কিন্তু।

সুধীর বলিল—মোটে তিন দিন ? এরি মধ্যে তাড়াতে চাও, ভারি নিষ্ঠুর তো তুমি ! তিন মাসের কম নড়ছি নে—দেখে নিও।

—আচ্ছা, আচ্ছা—দেখব।

কিরণ মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

—আর বড়াই কোরো না, মায়া-দয়া সব বোঝা গেছে ! আমরা না-হয় পর, নিজের মেয়েকেও কি একটিবার চোখের দেখা দেখতে ইচ্ছে করে না ?

সুধীর বলিল—সে কথা তো বলবেই কিরণ, তার সাক্ষি ভগবান। তারপর মুখখানা অতিশয় ম্লান করিয়া কহিতে লাগিল—শরীরের কি হাল হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ তো ? দু-বছর যা কেটেছে, অতিবড় শত্তুরের তেমন না-হয় ! জায়গা না পেয়ে একরকম রাস্তার ফুটপাথে শুয়ে কাটিয়েছি—এক পয়সার মুড়ি খেয়ে দিন কেটেছে, কদিন তাও জোটে নি। ভাগ্যিস রাস্তার কলের জলে পয়সা লাগে না !

কিরণের চোখ ছল-ছল করিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি বলিল—থাকগে, তুমি থামো। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—যে দুঃখ কপালে লেখা ছিল, তা যাবে কোথায় ? সে ছাইভস্ম ভেবে আর কি হবে বলো।

দুজনে স্তব্ধ হইয়া রহিল। ঘুমন্ত মেয়ের দিকে তাকাইয়া আবার কিরণের মুখে হাসি ফুটিল।

—ওগো, তুমি খুকিকে দেখলে না ? এমন দুষ্ট হয়েছে—ঐটুকু মেয়ে, হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি।

সুধীর কহিল—দেখব না কেন ? দেখছি তো।

কিরণ যেন কত বড় গিন্নি, তেমনি সুরে কহিল—ও আমার কপাল, ঐ রকম দেখলে হয় নাকি ? মেয়ে আমার সঙ্গে কত দুঃখ করছিল—বাবা আমায় কোলে নিল না, আদর করল না···তুমি খুকিকে একটা সরু হার গড়িয়ে দিও —নির্মলা দিদির মেয়েকে দিয়েছে, খাসা দেখায়।

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল—মেয়ে কথা বলতে শিখেছে নাকি ?

—বলে না ? সব কথা বলে, সে কি আর তোমরা বুঝতে পার ? বলিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর আবার শুরু করিল—সেদিন বলছিল, বাবাকে একখানা ঠেলা-গাড়ি কিনে দিতে বোলো—তাই চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খাব।

সুধীর হাসিল, বলিল—বটে, আবার গড়ের মাঠের শখ হয়েছে ?

—কেন অন্যায়টা কিসের ? খালি খালি চুপটি করে বাসায় বসে থাকবে বুঝি ! তুমি ভাব, আমরা কিছু জানি নে। আমাকে না লিখলে কি হয়, শ্বশুরঠাকুর সব রাষ্ট্র করে দিয়েছেন।

—কি শুনেছ বলো তো ?

—মস্তবড় বাড়ি ভাড়া করেছ, আমাদের সবাইকে নিয়ে যাচ্ছ—কোনটা শুনি নি ? তাই তাড়াতাড়ি বাবাকে আসবার জন্য চিঠি দিলাম, যাবার আগে একটিবার দেখা করে যাই—কতদিন দেখা হবে না।

সুধীরের মুখ অত্যন্ত বিবর্ণ হইয়া গেল। বলিল—এ সব মিছে কথা কিরণ।

—কি মিছে কথা ?

—এই বাসা করার কথা-টতা। মতলব করেছিলাম বটে, কিন্তু সে সব আর হবে না।

কিরণ বলিল—কেন হবে না—আলবত হবে। মাইনে-খাওয়া লোকে কখনও যত্ন করে ? তোমার শরীরের দশা দেখে যে কান্না পায় ! আমি তোমাকে কখনো একলা ছেড়ে দেব না।

—কিন্তু খরচ চালাব কোত্থেকে ?

—ও ! বলিয়া কিরণ গম্ভীর হইল।

—কথা বলো না যে !

কিরণ কহিল—আমার খরচ বড্ড বেশি, আমায় নিয়ে কাজ নেই। বেশ তো, মাকে নিয়ে যাও। আমি যাব না, কক্ষনো তোমার বাসায় যাব না এই বলে দিলাম।

বলিয়া জানলা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইল।

সুধীর বলিল—রাগ হল ? কতদিন বাদে এসেছি, আর এই রকম কষ্ট দিচ্ছ ?

—আমি কষ্ট দিই, আর তো কেউ কাউকে কষ্ট দেয় না, সেই ভালো। বলিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিল—দু-বছরের মধ্যে ক-খানা চিঠি দিয়েছ ? দশখানা কি এগারোখানা। সব বেঁধে ঐ বাক্সর মধ্যে রেখে দিইছি। বিকেল-বেলা এসেছ, তখন থেকেই ভাব দেখছি। বুঝি—বুঝি—সব বুঝি !

কিরণ চোখ মুছিল।

সুধীর বলিল—বললে তো বিশ্বেস করবে না, আমি কি করব ?

—কি আর করবে—তিনমহল বাড়ির ভাড়া জোটে, চাকর-বাকরের মাইনে জোটে, কেবল···থাকগে।

বলিতে বলিতে কিরণ চুপ করিল।

—তিনমহল বাড়ি ভাড়া করেছি আমি?

কিরণ বলিল—হ্যাঁগো, আমি সব জানি। তিনমহল বাড়ি ভাড়া করেছ, দেড়শ টাকা মাইনে পাচ্ছ—লুকচ্ছ কেন?

সুধীর বলিল—না, লুকব না—আর কি জান বলো তো?

—মাইনে ছাড়া উপরি পাও, রোজ টাকায় আর নোটে পকেট ভর্তি হয়ে যায়। বলো ঠিক কি-না?

সুধীর বলিল—ঠিক।

—ঢাকছিলে যে বড়!

সুধীর হাসিল।

বলিল—দেখছিলাম, তোমরা কে কি রকম দরদি—অভাবের কথা শুনে কে কি বল। বাসা ভাড়া হয়ে গেছে কিরণ, নিয়ে যাব না তো কি! তোমাদের সব্বাইকে নিয়ে যাব।

কিরণ রুখিয়া বলিল—আমি যাব না, কক্ষনো যাব না—বলেছি তো। খুকিকে কোলে নিলে না, বিকেল থেকে একটিবার হাসছ না, দুঃখটা কিসের শুনি? টাকাকড়ি হয়েছে—ছাই টাকা, আমরা তোমার টাকা চাই নে।

তখনও ম্লান হাসি ঠোঁটের উপর ছিল। সুধীর বলিল—এই যে কত হাসছি, দেখছ না? এত ঝগড়াও করতে পার তুমি, তোমার ও-স্বভাবটা আর বদলাল না!

—তোমার স্বভাব বদলেছে, সেই ভালো।

বধূর হাত ধরিয়া টানিয়া সুধীর বলিল—সত্যি, আর রাগারাগি নয়। আজকে সারাদিন বড় কষ্ট গিয়েছে।

কিরণ বলিল—তবু তো এক দণ্ড জিরোন নেই এতখানি রাত অবধি।

—কি করব বলো? গাঙ্গুলিমশায় নাছোড়বান্দা—ছেলের চাকরি করে দিতে হবে। বলে এলাম, হেমন্তকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় যাব। কেশব ঘোষ, রাম মিত্তির, তারক চক্কোত্তি, সকলের চার সনের খাজনা বাকি—তার কড়াক্রান্তি হিসেব হয়ে গেল—কাল সকালে সব আসবেন—মিটিয়ে দিতে হবে।

শ্রীদাম মল্লিক মশাই আপ্যায়ন করে বসিয়ে ঠিকানা টুকে নিলেন, গঙ্গাস্নানের যোগে সপরিবারে আমার বাসায় পায়ের ধুলো দেবেন। ক্লাবের ছেলেরা কাল মিটিং করবে, তাদের সিন-ড্রেসের এষ্টিমেট হবে। বড়লোকের হাঙ্গামা কত! সবারই গরজ বেশি, কেউ ছাড়েন না, অব্যাহতি কোথায়?

এই সব বাজে কথা শুনিতে কিরণের মন চাহিতেছিল না।

—বেশ করেছ—বড় কাজ করেছ। বলিয়া হঠাৎ ঘুমন্ত মেয়েকে বিছানা হইতে টানিয়া তুলিয়া হাসিতে হাসিতে হুকুমের সুরে বলিল—মেয়ে কোলে নাও—তোমার মতো মোটেই নয়, দেখো তো কেমন। নাও।

সুধীর কিন্তু উৎসাহ প্রকাশ করিল না। বলিল—আবার জেগে উঠে এক্ষুনি কান্নাকাটি শুরু করবে। এ-সব কাল হবে। ভারি ঘুম পাচ্ছে, আমি এখন শুই।

ঠিক তাহার ঘণ্টা দুই পরে সুধীর খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। হেরিকেনের জোর কমানো ছিল, উস্কাইয়া দিয়া দেখিল—মেয়ের পাশে কিরণ বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে। একখানা চিঠি লিখিল :

> কিরণ, আমার সম্বন্ধে কিছু ভুল শুনিয়াছিলে। চাকরি পাইয়াছিলাম, তবে মাহিনা দেড়শ নয়—চল্লিশ টাকা। বাসা ভাড়া করিয়াছিলাম—উহা তিনতলা নয়, পাকা মেঝে, চাচের বেড়া, টিনের ঘর। কিন্তু বাজার মন্দা বলিয়া আজ সাত দিন চাকরির জবাব হইয়াছে। তোমাদিগকে লইয়া একসঙ্গে থাকিব এই আশায় বাসা ভাড়া করিয়াছিলাম, কিন্তু যে অর্ধেক ভাড়া অগ্রিম দিতে হইয়াছিল সেইটাই লোকসান। দু-বছর যে কষ্টে গিয়াছে তাহা ভগবান জানেন। শহরে বসিয়া আর উঞ্ছবৃত্তি করিতে পারি না, তাই দু-দিন জিরাইতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা এবং গ্রামসুদ্ধ সকল ইতর-ভদ্রে চক্রান্ত করিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিলে। আজ দিনরাত্রির মধ্যে আমার অবস্থা মুখ ফুটিয়া কাহারও কাছে বলিতে পারিলাম না, তাই চিঠি রাখিয়া পলাইলাম।
>
> এই মাসের মাহিনার মধ্যে হোটেল-খরচ, বাসা-ভাড়া, আপিস-দারোয়ানের দেনা এবং বাড়ি আসিবার ট্রেন-ভাড়া বাদে সম্প্রতি হাতে এগার টাকা বার আনা আছে। চিঠির সঙ্গে একখানা দশ টাকার নোট গাঁথিয়া রাখিয়া যাইতেছি। উহা হইতে খুকির জন্য গিনি সোনার হার, কেশব প্রভৃতির খাজনা-শোধ, ড্রামাটিক ক্লাবের সিন-ড্রেস, গাঙ্গুলি-পুত্রের কলিকাতার যাহা খরচ এবং বাবা ও তোমার যদি অপর কোনো সাধ-বাসনা থাকে, সমাধা করিও। আমার জন্য চিন্তা নাই—নগদ সাত সিকা লইয়া রওনা হইলাম।

পরদিন নিবারণ বলিতে লাগিলেন—আপিসের কাজে ঐ তো মুশকিল! দুপুর রাত্রে টেলিগ্রাম এসে হাজির, ভোর বেলা ইষ্টিশানে পৌঁছে দিয়ে এলাম। ওকে ছাড়া আর কাউকে দিয়ে সাহেবের বিশ্বাস নেই—আফিসের হেড কিনা—

বাঘ

বনকাপাসি গ্রামে এ রকম অত্যাশ্চর্য ব্যাপার কোনো দিন ঘটে নাই।

সকালবেলা তিনকড়ি বাঁড়ুজ্জে মহাশয় গাড়ু হাতে বাঁশবাগানের মধ্যে যাইতেছিলেন, এমন সময় যেন কেঁদো-বাঘ ডাকিয়া উঠিল। বাঁড়ুজ্জে গাড়ু ফেলিয়া তিন লাফে বাগান পার হইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। ডাকটা কোন দিক হইতে আসিল তাহা সঠিক সাব্যস্ত করিতে পারিলেন না। কোন দিকে যে চূড়ান্ত নিরাপদ জায়গা তাহা নিরূপণ করিবার জন্য এদিক-ওদিক তাকাইতেছেন, এমন সময় দেখা গেল জাল কাঁধে ছিদাম মালো উত্তর-মুখো বিলের দিকে চলিয়াছে।

—শুনিস নি ছিদাম?

ছিদাম কিছু শুনিতে পায় নাই।

—শেষকালে দিনমানেও কেঁদো ডাকতে আরম্ভ করল! বিলকোলাচে পাতিবনের দিকটায়—

কথার মাঝখানেই পুনরায় বাঘের ডাক এবং যেন আরও একটু নিকটে।

ছিদামের মাছ ধরা হইল না, ফিরিল—পাগুলি একটু ঘন ঘন ফেলিয়াই। বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের বয়স হইয়াছে এবং বাতের দোষ আছে, তিনি তো দৌড়াইতে পারেন না—

কোনো গতিকে মিত্তিরদের চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে উঠিয়া দেখিলেন, এক পাশে পাইক নিমাই হুঁকা শোলক করিতেছে এবং ভিতরে মিত্তিরের সেজ ছেলে বুধো তারক চক্কোত্তির সঙ্গে দাবা খেলিতেছে। বাঁড়ুজ্জে বাঘের বিবরণ আদ্যোপান্ত বলিলেন। তিন জনেই জোয়ান। বুধো এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর হইতে সড়কি বাহির করিয়া আনিল, নিমাই পাইক লইল

তাহার পাঁচহাতি লাঠি, এবং হাতের কাছে জুতসই আর কোনো অস্ত্র না দেখিয়া তারক চক্কোত্তি একটানে একটা জিওলের বড় ডাল ভাঙিয়া কাঁধে করিল।

তিন বীরপুরুষ বাহির হইয়া পড়িল—আগে তারক, মাঝে বুধো, শেষে নিমাই।

ঐ—ঐ—আবার বাঘ ডাকে।

একেবারে পাড়ার মধ্যে! দীঘির পাড়ে কিংবা হলুদভুঁইয়ের মধ্যে। সর্বনাশ—দিন দুপুরে হইল কি! তারক পিছাইয়া পড়িল। মাত্র জিওলের ডাল সম্বল করিয়া গোঁয়াতুর্মিটা কিছু নয়। নিমাই কহিল—ফেরা যাক সেজ কর্তা, পাড়ার সবাইকে ডেকে আনি।

বুধো তাড়া দিয়া উঠিল। কিন্তু আর আগাইল না, সড়কিটা শক্ত করিয়া ধরিয়া সন্তর্পণে সেখানে দাঁড়াইল।

ঐ—ফের।

একেবারে আসিয়া পড়িয়াছে। আমবাগানের আড়ালে—দশ হাতও হইবে না। বাবা রে! তারক ও নিমাই দৌড় দিল। বুধো একা একা কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না, এমন সময়ে মোড় ঘুরিয়া সামনে আসিয়া পড়িল—

বাঘ নয়, দুজন মানুষ!

একজনের মাথার উপরে চৌকা লালচে রঙের কাঠের ছোট বাক্স, বাক্সর উপর গামছায় বাঁধা পুঁটুলি। অপরের বাঁ হাতে হুঁকা, ডান হাতে অবিকল ধুতুরাফুলের মতো গড়নের বৃহদাকার একটি চোঙা। সেই চোঙা এক-একবার মুখে লাগাইয়া শব্দ করিতেছে, আর যেন সত্যকার বাঘের আওয়াজ হইতেছে।

বুধো লোক দুইটিকে সঙ্গে লইয়া বাহিরের উঠানে দাঁড়াইল।

বাঁড়ুজ্জে তখনও সেখানে ছিলেন। ইতিমধ্যে গ্রামের আরও দু-চারজন জুটিয়াছে। বাঘের গল্প হইতেছে—পাঠশালায় পড়িবার সময় একবার বাঁশের বাড়ি দিয়া ঘনশ্যাম মিস্তির একটা গোবাঘার সামনের দাঁত ভাঙিয়া দিয়াছিলেন—সেই সব অনেককালের কথা। গল্প ভালো জমিয়াছে, এমন সময় উহারা আসিল।

—কি আছে তোমার ওতে?

—গ্রামোফোন—গান আছে, একটো আছে, সাহেব-মেমের হাসি—একেবারে যেন ঠিক সত্যি, ছাদ ফেটে যাবে মশাই।

বাঁড়ুজ্জে বলিলেন—তুমি আর নতুন কি শোনাবে বাপু! আমাদের এই গাঁয়ে যাত্রা বল, আর ঢপ-কবি-বৈঠকি বল, কোনো কিছু বাকি নেই। গেল-বারেও ঠাকুরবাড়ি যাত্রা হয়ে গেল—নীলকণ্ঠ দাসের দল। নীলকণ্ঠ দাসের নাম শোন নি—হাকোবার নীলকণ্ঠ?

রাম মিত্তির বলিলেন—সাহেব-মেম তো ইংরাজিতে হাসে। ও ইংরাজি-মিংরাজি আমরা কেউ বুঝতে পারব না। তবে গান-একটো—তা তুমি কি একলাই সব কর? কিসের দল বললে তোমার?

চোঙা হাতে লোকটি বলিল—গ্রামোফোন—কলের গান। আমি কিছু করব না মশাই, সব এই কল দিয়ে করাব। বলিয়া সে সঙ্গীর মাথার বাক্সটি দেখাইল।

প্রিয়নাথ থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া তামাক খাইতেছিল। গ্রাম সুবাদে রাম মিত্তিরের ভাইপো বলিয়া তাহার সামনে তামাক খায় না। একটা শেষ টান মারিয়া একটু আগাইয়া হুঁকাটা অশ্বিনী শীলের হাতে দিয়া সে বলিল—তোমার ঐ বাক্স একটো করবে? কাঠে কখনো কথা কয়? মন্তোর-তন্তোর জান নাকি?

বামুনপাড়ার নিত্যঠাকরুন দীঘির ঘাটে স্নান করিয়া ঘড়া কাঁখে ঘটি হাতে সবেগে মন্ত্র পড়িতে পড়িতে পথের সকল অশুচিতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। কথাটা তাঁহার কানে গেল। মন্ত্র থামাইলেন না, কিন্তু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বৃত্তান্তটা শুনিলেন।

এ-পাড়া ও-পাড়ায় অবিলম্বে রাষ্ট্র হইয়া গেল—মিত্তিরবাড়ি এক আশ্চর্য কল আসিয়াছে, তাহা মানুষের মতো গান গায় ও একটো করে। খুকিরা এবং যেসব ছেলে পাঠশালায় যায় না, সকলেই ছুটিল। যাহাদের বয়স হইয়াছে তাহারা অবশ্য এমন গাঁজাখুরি গল্প বিশ্বাস করিল না—তবু দেখিতে গেল।

চোঙাওয়ালা লোকটার নাম হরসিত—জাতে পরামানিক। উঠানে বেশ ভিড় জমিয়া গিয়াছে। সে কিন্তু নিতান্তই নিস্পৃহভাবে তামাক খাইতেছে: এত যে লোক জমিয়াছে তাহার যেন নজরেই আসিতেছে না। চক্কোত্তিদের বুঁচি খানিক আগে আসিয়াছে। আঙুল দিয়া টেঁপিকে দেখাইয়া দিল, ঐ সে

কল। কিন্তু টেঁপিকে বোকা বুঝাইলেই হইল! ছোট চৌকা কাঠের বাক্স—উহাই নাকি আবার গান গায়, যাঃ!

হরসিত চোখ বুজিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে তামাকের ধোঁয়ায় পৌষ মাসের সকালবেলার মতো চারিদিকে নিবিড় কুয়াশা জমাইয়া তুলিল। এ যেন আরব্য উপন্যাসের সেই কলসির ভিতর হইতে দৈত্য বাহির হওয়া—কেবলই ধোঁয়া, ধোঁয়া—তার মধ্যে হরসিতের আবছা মূর্তি! এইবার বুঝি প্রচণ্ড লাফ দিয়া একটা অত্যদ্ভুত কিছু করিয়া বসিবে। কিন্তু সে তাহা কিছু না করিয়া সহসা হুঁকার ভুড়ভুড়ি থামাইল এবং চোখ খুলিয়া বলিল—তামাক যে ফ্যাকসা মশাই, গলায় সেঁকও লাগে না।

অমনি জন দুই ছুটিল কামারপাড়ায় যাদবের বাড়ি। সে গাঁজা খায়, তাহার কাছে গলা সেঁকিবার উপযুক্ত একছিলিম তামাক মিলিতে পারে।

সকলে রাম মিত্তিরকে ধরিয়া বসিল—তুমি কায়েতদের সমাজপতি, এ গান তোমাকে দিতে হবে। রাম মিত্তিরের হইয়া সকলে দর কষাকষি আরম্ভ করিল। টাকায় আটখানি করিয়া গান, দু টাকায় সতেরো খানা অবধি হইতে পারে—তার বেশি নয়। একটোর দর অন্যত্র হইলে বেশি হইত, কিন্তু এতগুলি ভদ্রলোক যখন বলিতেছেন তখন তা আর কাজ নাই। মোটের উপর হরসিতের বিবেচনা আছে। এক টাকায় নয়খানি রফা হইল।

তখন পকেট হইতে একটা চকচকে গোলাকার বস্তু, হাতল, কাঁটার কৌটা প্রভৃতি বাহির করিয়া ধাঁ-ধাঁ করিয়া চৌকা বাক্সে হরসিত সেগুলি পরাইয়া ফেলিল, চোঙাটিও বাক্সের গায়ে বসাইল। তারপর গামছার পুঁটুলি খুলিয়া হাত-আয়না, চিরুনি ও কাপড় সরাইয়া বাহির করিল কালো কালো পাতলা পাথর—

কাহারও আর নিশ্বাস পড়ে না।

হাতল ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল—বায়নার টাকা দিন। অগ্রিম দেবেন না, বলেন কি মশাই? আমার সাহেববাড়ির কল—

থালায় করিয়া টাকাটি আসরের ঠিক মধ্যস্থলেই রাখা হইল, যে-যে পেলা দিতে চাহিবে, তাহাদের কাহারও যাহাতে কোনো অসুবিধা না হয়। তারপর হরসিত কলের উপর একখানা পাথর বসাইয়া টিপিয়া দিল, আর পাথর চরকির মতো ঘুরিতে লাগিল। তারপর সেই ঘুরন্ত পাথরে যেই আর-একটা মাথা বসাইয়া দেওয়া, অমনি একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল তবলা, বেহালা, ইংরাজি-

বাজনা, ঢোল, করতাল—বোধকরি পৃথিবীতে স্বর-যন্ত্র যা কিছু আছে সবগুলিই।

ইতিমধ্যে হৈ হৈ করিয়া একপাল ছেলে আসিয়া পড়িল, এই উপলক্ষে পাঠশালার ছুটি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ছেলেরা আর কতটুকু গণ্ডগোল করিতে পারে? কলের মধ্যে যেন এককুড়ি পাঠশালায় একত্রে সমস্বরে নামতা পাঠ হইতেছে। হাঁ—কল যে সাহেববাড়ির, তাহাতে সন্দেহ নাই। হরসিত বলিয়াছিল—ছাদ ফেটে যাবে, সেইটাই বুঝি সত্য-সত্য ঘটিয়া বসে!

কিন্তু এত যে গোলযোগ, পাথরখানা বদলাইয়া দিতেই চুপচাপ। ক্রমশ শোনা গেল, চোঙের ভিতর হইতে একলা গলায় গীত হইতেছে—ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা। একবারে স্পষ্ট আর অবিকল মানুষের গলা! মানুষ দেখা যায় না, অথচ মানুষই গাহিতেছে।

মণ্টুর অনেকক্ষণ হইতে মনে হইতেছিল, ঐ চোঙের ভিতর কাহারা বসিয়া বাজাইতেছে—ঠিক তাহার বুড়োদাদা যেমন দুলিয়া দুলিয়া তেহাই দিয়া থাকেন, তেমনি আবার তেহাই দেয়। এবারে গান শুনিয়া তাহার আর এক ফোঁটা সন্দেহ রহিল না।

চোঙের অধিবাসী সেই গায়ক ও বাদক-সম্প্রদায়কে দেখিতে ছেলেদের দল ঝুঁকিয়া পড়িল। কিন্তু কলের ভিতর হরসিত এমনি করিয়া দলসুদ্ধ পুরিয়া ফেলিয়াছে যে কাহাকেও দেখিবার জো নাই।

বুঁচি খুব কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সরিয়া দূরে দাঁড়াইল। শঙ্কা হইল—ঐ কলওয়ালা কতলোককে তো পুরিয়াছে, যদি কাছে পাইয়া তাহাকেও পুরিয়া ফেলে—তখন? কিন্তু টেপি বুঁচির চেয়ে দু-বছরের বড়, বুদ্ধিও বেশি। সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিল—বাক্স তো ঐটুকুন মোটে, বড় বড় মানুষ কি করে থাকে?

বাক্সর ও মানুষের আয়তনের তারতম্য হিসাব করিলে মনে ঐ প্রকার সন্দেহের উদয় হইতে পারে বটে, কিন্তু যখন স্পষ্ট মানুষের গলা শোনা যাইতেছে তখন যেমন করিয়া এবং যত ঠাসাঠাসি করিয়াই হউক তাহারা তো আছে নিশ্চয়ই!

বাঁড়ুজ্জে ঠিক সামনে বসিয়াছেন। গান-বাজনার আসরে এই স্থানটি তাঁহার নিত্যকালের। বনকাপাসিতে কত মজলিস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এমন

ওস্তাদ তো একজন আসিল না যে তিনকড়ি বাঁড়ুজ্জের পায়ের ধূলা না লইয়া চলিয়া যাইতে পারিল।

আগাগোড়া সভাসুদ্ধ লোক বিমুগ্ধ হইয়া শুনিতেছে, কেবল রাম মিত্তির বলিলেন—গলায় মোটে দানা নেই, দেখছ বাঁড়ুজ্জে? যতই হোক, টিনের চোঙ আর কাঠের বাক্স তো!

কে-একজন নেপথ্যে মন্তব্য করিল—সকাল বেলা এই খরচান্ত, মিত্তির-মশায়ের গায়ের জ্বালা কিছুতে মরছে না।

রাম মিত্তিরের সঙ্গে বাঁড়ুজ্জের মিতালি সেই নকুল গুরুর কাছে পড়িবার সময় হইতে। কলের গানের জন্য সকলে ধরিয়া পড়িয়া রাম মিত্তিরের একটা টাকা খরচ করাইয়া দিল, সেজন্য মন খারাপ আছে নিশ্চয়। কিন্তু বাঁড়ুজ্জের কেমন মনে হইল, রাম তাঁহাকে খোশামোদ করিয়াই গানের নিন্দা করিতেছে—টাকার শোকে নহে।

প্রিয়নাথ বলিল—ও বাঁড়ুজ্জে মশায়, গান-বাজনায় চুল তো পাকালেন, কত গানই গেয়ে থাকেন, এমন সুর-লয় শুনেছেন কখন? নাপতের পো ডাকিনী-সিদ্ধ, অপ্সরী-কিন্নরী ধরে এনে গান গাওয়াচ্ছে যেন।

গানের পর গান চলিল। একটা গানের এক জায়গায় ভারি তানের প্যাঁচ মারিতেছিল। অশ্বিনী শীল অকস্মাৎ উচ্ছ্বাস ভরে বলিয়া উঠিল—কি কল বানায়েছে সাহেব কোম্পানি! দেবতা—দেবতা—বেহ্মা-বিষ্টুর চেয়ে ওরা কম কিসে? বাঁড়ুজ্জে মশায়, আপনার সেতারের টুং-টাং আর রামপ্রসাদী-গুলো এবার ছাড়ুন।

কলের বলবান রাগিণীর তলায় অশ্বিনীর গলা চাপা পড়িল, বাঁড়ুজ্জে তাহার সদুপদেশ শুনিতে পাইলেন না।

কিন্তু বাঁড়ুজ্জের আর কি আছে ঐ সেতারের টুং-টাং ছাড়া? চকমিলানো পৈতৃক প্রকাণ্ড বাড়িটা খা-খা করে—চামচিকার বসতি। সেখানে থাকিবার লোক তিনটি—মণ্টু, তার দিদিমা এবং তিনকড়ি বাঁড়ুজ্জে স্বয়ং। নারানীও ছিল—সেই সকলের শেষ। সাত বছর আগে মণ্টুকে ছ মাসের এতটুকু রাখিয়া সেও ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। ছয় ছেলের মা বাঁড়ুজ্জে-গিন্নি একে একে সব কটিকে বিসর্জন দিয়া এই শেষের ধন মরা-মেয়ের বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িলেন। পাড়ার সকলে আসিয়া আর সান্ত্বনা দিবার কথা খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু বাঁড়ুজ্জের চোখে জল নাই। রাম মিত্তির কাঁদ-কাঁদ

গলায় কহিলেন—বুক বাঁধো বাঁড়ুজ্জে, ভগবানের লীলা। তখন বাঁড়ুজ্জে স্ত্রীকে দেখাইয়া বলিলেন—ঐ যে অবুঝ মেয়েমানুষ উঠোনের ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে, ওকে গিয়ে তোমরা প্রবোধ দাও—আমার কাছে আসতে হবে না, ভাই। শুধু তিনি তাকের উপর হইতে সেতারটি নামাইয়া দিতে বলিলেন।…

এতকাল বাদে কি-না অশ্বিনী শীল তাঁহাকে সেতার-বাজনা ছাড়িয়া দিতে বলিল!

এক-একটা গান হইয়া গেলে হরসিত কাঁটা বদলাইয়া আগের কাঁটা ফেলিয়া দিতেছিল। তাই কুড়াইতে ছেলেমহলে কাড়াকাড়ি! একবার আর একটু হইলে মণ্টু কলের উপর গিয়া পড়িত। হরসিত তাড়া দিয়া উঠিল। বাঁড়ুজ্জে মণ্টুকে ডাক দিলেন—তুই দাদু, আমার কাছে আয়—এসে ঠাণ্ডা হয়ে বোস তো। নারানীর সেই ছ-মাসের মণ্টু এখন কত বড় হইয়াছে!

কিন্তু মণ্টু আসিল না, উহার অনেক কাজ। কাঁটা কুড়ানো তো আছেই, গানও লাগিতেছে বড় ভালো। তা ছাড়া চোঙের ভিতর বসিয়া যে গায়ক গাহিতেছে, তাহার মূর্তিদর্শন সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হইবার কারণ এখনও ঘটে নাই।

যখন ভালো করিয়া বুলি ফুটে নাই, বাঁড়ুজ্জে তখন হইতেই মণ্টুকে তবলার বোল শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রোজ সন্ধ্যায় রাম মিত্তির প্রভৃতি দু-চারজন বাঁড়ুজ্জে-বাড়ি গিয়া বসেন। শ্রাবণ মাসে বৃষ্টিবাদলা এক একদিন এমন চাপিয়া পড়ে যে কেহ বাড়ির বাহির হইতে পারে না। না পারুক, তাহাতে এমন কিছু অসুবিধা ঘটে না। সেদিন মণ্টুর সেতার-শিক্ষা আরও বিপুল উদ্যমে চলে। ভারি তাল কাটে, লজ্জা পাইয়া মণ্টু বলে—বুড়োদাদা, আজ আর হবে না, ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু ঘুম পাইলেই হইল! লাউয়ের খোলের ভিতর হইতে সুর আদায় করা সোজা কর্ম নয়।…

অশ্বিনী শীল বনকাপাসির সুবিখ্যাত সংকীর্তনের দলে খোল বাজাইয়া থাকে। উল্লসিত হইয়া পুনশ্চ সে বলিয়া উঠিল—আজই বাড়ি গিয়ে খোলের দল ছিঁড়ে খড়মে লাগাব। মরি, মরি—কি কীর্তনটাই গাইল রে! আমাদের গানের পরে আজ ঘেন্না হয়ে গেল।

রাম মিত্তির ক্ষীণ আপত্তি তুলিয়া বলিলেন—মন দিয়ে শুনেছ বাঁড়ুজ্জে? অন্তরার দিকটায় তালে গোলমাল করে গেল না?

বলিয়াছিল বটে আমির খাঁ ওস্তাদ—বাঁড়ুজ্জিবাবুর কান ডালকুত্তার মাফিক।

খাঁ সাহেব অনেক কায়দা করিয়াও বাঁড়ুজ্জের কানকে ফাঁকি দিতে পারে নাই; কারচুপিটুকু ঠিক ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। দিল্লিওয়ালা আমির খাঁ অবধি ভুল করিতে পারে, কিন্তু এই অত্যাশ্চর্য কাঠের বাক্সর গানে একবিন্দু খুঁত ধরিবার জো নাই। রাম মিস্তির তালের কিছু বোঝেন না, তিনি ভুলের কথা বলিলেন। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া বাঁড়ুজ্জে কি ভুল ধরিবেন?

বিকালেও আর এক বাড়ি বায়না—কামারপাড়ায়। মণ্টু শুনিতে গিয়াছে, বাঁড়ুজ্জের মাথাটা কেমন টিপ-টিপ করিতেছিল বলিয়া যাইতে পারেন নাই।··· আধঘুমের মধ্যে বাঁড়ুজ্জের মনে হইল, কে যেন আসিয়া কপাল টিপিয়া দিতেছে আর ডাকিতেছে—বাবা! মেজ ছেলে মানিকের গলা না? দশ বছরেরটি হইয়াছিল। গোলাঘাটার বড় ইস্কুলে পড়িতে যাইত। কিন্তু মানিক নয়, মানিক গিয়াছে ঘুড়ি উড়াইতে—নারানী—নারানী। নারানী ডাকিতেছে—বাবা, বাঘ এয়েছে—খোকাকে ধরল যে! নারানী মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে।··· ঘরের মধ্যে বাঘ? সেতারের তাল কাটিয়া গেল। মারো সেতারের বাড়ি বাঘের মাথায়—মারো—মারো। মণ্টুকে ছাড়িয়া বাঘ সেতার কামড়াইয়া ধরিল, তার ছিঁড়িল, চিবাইয়া চিবাইয়া আগাগোড়া একেবারে তছনছ। তা যাক, মণ্টু কই?—মণ্টু, মণ্টু! বাঁড়ুজ্জে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন—মণ্টু!

মণ্টু গান শুনিয়া ফিরিয়াছে। তাহার আনন্দ ধরিতেছিল না। বলিল—বুড়োদাদা, তুমি গান শুনলে না—আমরা শুনে এলাম, দুই টাকার গান। এবেলা আরও খাসা খাসা। তুমি অমনি ভালো করে গাও না কেন দাদা?

বাঁড়ুজ্জে কহিলেন—ভালো গাই নে?

মণ্টু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না। তুমি গাও ছাই—বুধোকাকারা বলেছে।

বাঁড়ুজ্জে একটুখানি চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর যেন কত বড় রসিকতার কথা—প্রবলবেগে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—জানিস নে ও মণ্টু, জানিস নে—ও যে কোম্পানি বাহাদুরের কল, ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি পারি? গোটা জেলাটা জুড়ে ওদের রাজ্যি, আর আমি ব্রহ্মোত্তরের খাজনা পাই মোটে একান্ন টাকা সাত আনা—

বলিতে বলিতে সেতারটা পাড়িয়া লইলেন।

মণ্টু বলিল—সেতারে কত ঝঞ্ঝাট, কলের গান আপনাআপনি বাজে। আমাকে একটা কলের গান এনে দিতে হবে।

বাঁড়ুজ্জে বলিলেন—দেব, বুঝলি দাদু, কলের গান দেব আর সেই সঙ্গে কলের হাত-পা-নাক-চোখওয়ালা একটা নাতবউ—কি বলিস ?

বলিতে বলিতে গলাটা যেন বুজিয়া আসিল, তবু বলিতে লাগিলেন—ওস্তাদের কত গালাগালি খেয়েছি, সরস্বতী ঠাকরুনকে কত চিনির নৈবিদ্যি খাইয়েছি। এখন আর কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। তোরা যখন বড় হবি মণ্টু, ততদিনে সরস্বতী দুর্গা কালী শালগ্রামটা পর্যন্ত কলের হয়ে যাবে। খুব কলের পুজো করিস।

সন্ধ্যা গড়াইয়া যায়। আজ বাঁড়ুজ্জে-বাড়ি কেহ আসে নাই। মণ্টুও নাই। কেবল রাম মিত্তিরের খড়মের ঠকঠকি সিঁড়িতে শোনা গেল।

—কি বাঁড়ুজ্জে, একা একা খুব লাগিয়েছ যে! সুরটা পূরবী বুঝি ?

বাঁড়ুজ্জে তদ্গত হইয়া সেতার বাজাইতেছিলেন। বলিলেন—দোসর কোথায় পাই ভাই ? চাঁদা তুলে ঠাকুরবাড়িতে আবার কলের গান দিচ্ছে—মণ্টু গেছে সেখানে। একা-একাই বাজাচ্ছি—কেমন লাগছে বল তো ?

রাম মিত্তির বলিলেন—এখন রেখে দাও, এ-সব তো রোজ শুনব। চল ঠাকুরবাড়ি যাওয়া যাক।

বাঁড়ুজ্জেকে লইয়া রাম মিত্তির ঠাকুরবাড়ির আসরে বসিলেন। হরসিতের কলে ইতিমধ্যে দু-খানি গান সারা হইয়া একটা শুরু হইয়াছে :

কি করিলি অবোধ বালিকা ?
সুধা ভ্রমে হলাহল করিলি যে পান—

চেহারা তো দেখা যায় না, তবে হাঁ—গলা শুনিয়া একথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে বক্তা ভীম, রাবণ বা অন্ততপক্ষে তস্য পুত্র মেঘনাদ না হইয়া যায় না।

বাঁড়ুজ্জে বলিলেন—তুমি বাপু, একখানা পূরবী বাজাও তো।

হরসিত ঘোরপ্যাচের মানুষ নয়, জবাব সোজা করিয়াই দিল—হুকুম-টুকুম চলবে না মশাই, যা বাজাই শুনে যান—আমার সাহেব-বাড়ির কল—

অতএব সাহেববাড়ির কলের যেরূপ অভিপ্রায় হইল, বনকাপাসির সমুদয় শ্রোতা তটস্থ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল। ইহা আমির খাঁ ওস্তাদের মজলিস নয় যে ফরমায়েশ খাটিবে।

অকস্মাৎ—ঘটর্-ঘটর্-ঘ্যাস্—

করিতে হইল। না করিয়া উপায় নাই। এই কয়দিনের মধ্যে পার্ট মুখস্থ করিয়া একরকম চালাইয়া দিতে পারে, এ অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র ঐ সৃষ্টিধর।

গীতাভিনয় শুরু হইয়া গিয়াছে।

দ্রোণাচার্যের প্রায় আজানুলম্বিত দাড়ি—রাজবাড়িতে মাস্টারি করিবার মানানসই দাড়ি হইয়াছে বটে। আসরের দক্ষিণ কোণে অশ্বত্থামা চিঁ-চিঁ করিয়া বলিতেছে—দুধ, দুধ খাব বাবা—আর দ্রোণাচার্য দুই হাতে সেই দাড়ি-সমুদ্র অনবরত আলোড়িত করিয়া একবার ঝাড়-লণ্ঠনের মধ্যে, একবার বেহালাদারদের পশ্চাদ্দেশে, একবার বা ছেঁড়া সামিয়ানার ফাঁকে আকাশমুখো তাকাইয়া দুধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু এত সব অত্যুৎকৃষ্ট স্থান হইতেও দুধ মিলিল না। শেষে একজন ছোকরা হারমোনিয়ামের বাক্সের এক কোণ হইতে একটা ছোট অ্যালুমিনিয়মের তেলের বাটি বাহির করিয়া আগাইয়া দিল। দ্রোণাচার্য কোন প্রকার উপকরণ ব্যতীত বোধ করি কেবলমাত্র তপঃপ্রভাবেই সেই বাটিতে পিটালি গুলিয়া দুধ বলিয়া ফাঁকি দিয়া অশ্বত্থামাকে খাওয়াইয়া দিলেন। আর সেই নিরাকার পিটালিগোলার শক্তিই বা কি অসামান্য! মুহূর্তমধ্যে অশ্বত্থামার মিহি গলা দস্তুরমত সবল হইয়া উঠিল এবং আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সহিত বিশ হাত আসরের আগাগোড়া প্রদক্ষিণ করিয়া দুধ খাওয়ার আনন্দে একটো করিয়া সে লাফাইতে লাগিল।

চারিদিকে বাহবা বাহবা পড়িয়া গেল।

চিকের আড়ালে একটি বধূ কেবলি চোখ মুছিতেছিল—মজুমদার-স্টেটের রকম সাত আনা শরিক স্বর্গীয় যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ উমাশশী। তার যেন কেমন মনে হইল, ঐ অশ্বত্থামা তাহার ভাই, সে তাহার দিদি।

উমার কাঁচা বয়স, তবু এটুকু বুঝিবার বুদ্ধি আছে যে ইহার কিছু সত্য নহে, অভিনয় মাত্র। কিন্তু সত্য হউক, মিথ্যা হউক, অমন সুন্দর ছেলেটি আসরের পাশে পড়িয়া একটুখানি দুধ খাইবার জন্য অত করিয়া কাঁদিতে লাগিল তো! আর যখন দুধ বলিয়া খানিক পিটালির গোলা খাওয়াইয়া দিল, অশ্বত্থামা রাগ করিয়া ঐ বাটিসুদ্ধ আসর ডিঙাইয়া কলাবনের মধ্যে ফেলিয়া দিল না কেন? তাহা না করিয়া অবোধ বালক আনন্দে নাচিতে লাগিল!...

যাত্রা দেখিতেছে আর কত কি ভাবিতেছে এমনি সময়ে উমার মনে পড়িয়া

গেল, তাহার খোকামণি এতক্ষণ হয়তো জাগিয়াছে। সন্ধ্যার সময় তাহাকে খাটের উপর ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া মোক্ষদাকে সেখানে বসাইয়া তবে গান শুনিতে আসিয়া বসিয়াছে। যে আতুরে ঝি মোক্ষদা—এতক্ষণ কি করিতেছে তার ঠিক কি! হয় ঘুম মারিতেছে, নয় তো এই ভিড়ের মধ্যে কোনোখানে চুরি করিয়া বসিয়া সে-ও গান শুনিতেছে। মোটে এক বছরের একরত্তি ছেলে, দুধ খাইবার সময় হইয়াছে, বাড়িতে কেহ নাই, জাগিয়া থাকে তো কাঁদিয়া কাঁদিয়া খুন হইতেছে। ব্যস্ত হইয়া উমাশশী উঠিয়া পড়িল।

ছয় শরিকের এজমালি কালীপূজা। সম্পত্তির অংশক্রমে যাত্রাদলের লোক-জন খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যদুনাথের তরফে খাইবে বারোজন।

অনেক রাত্রে গান ভাঙিয়া গেলে পুরুষমানুষদের খাওয়া শেষ হইয়া গেল। তারপর উমা খাইতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—যাত্রার লোকেরা খেয়ে গেছে?

বামুন-ঠাকরুন উত্তর করিলেন—না বৌমা, এমন কি নবাবপুত্তুররা এয়েছেন যে সন্ধ্যা না লাগতে বাবুদের আগে-ভাগে খাইয়ে দেব। আমার সব হয়ে গেছে, আর দেরি নেই। মোক্ষদা এবার ডাকতে যাক। মোক্ষদা—ও মোক্ষদা—

উমার খাওয়া শেষ হইয়া আসিয়াছিল। অবশিষ্ট ভাতগুলির কতক খাইয়া তাড়াতাড়ি আঁচাইতে গেল।

মোক্ষদা তখন উপর হইতে নিচে নামিতেছে।

উমা কহিল—কেমন গান শুনলি মোক্ষদা?

মোক্ষদা বিস্ময়ে খানিকক্ষণ কথাই বলিতে পারিল না। শেষে কহিল—অ পোড়াকপাল, আমি গেনু কখন? আমি বলে মাজার ব্যথায় ছটফটিয়ে মরি।

উমা হাসিয়া ফেলিল।

—তুই যে আঁধারে আঁধারে কচুবনের পাশ দিয়ে···আমি নিজের চোখে দেখলাম। তা বেশ তো, কি হয়েছে তাতে, তুই খোকাকে একলা ফেলে চলে গেছিস, আমি কি তা কাউকে বলতে যাচ্ছি?

অতঃপর মোক্ষদার আর মনে না পড়িবার কথা নয়—এখনও স্মরণ না হইলে আরও যে কি বাহির হইয়া পড়িবে তার ঠিক কি?

বলিল—আস্তে কথা কও বউদি, শুনতে পেলে গিন্নিমা আস্ত রাখবে না।

বামন-ঠাকরুনকে বলে দিইছিনু—যখন যুদ্ধ হবে আমায় ডেকো। তিনি এসে বললেন, মোক্ষদা, দেখসে এসে ভীম সাঁই-সাঁই করে কী গদাই ঘুরুচ্ছে! গিইছি আর এয়েছি—দাঁড়াই নি মোটে।

উমা বলিল—আর অশ্বত্থামা কেমন একটো করলে বল দিকিন। দেখতেও যেন রাজপুত্তুর, না?

মোক্ষদা ঘাড় নাড়িয়া সংক্ষেপে বলিল—হুঁ। তাহার মাথার মধ্যে তখনও সাঁই-সাঁই করিয়া ভীমের গদা ঘুরিতেছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিল—কিন্তু দুর্যোধন কি পালোয়ান রে বাপু! আমি গুনে দেখনু, একটা নয়, দুটো নয়—ভীম ছয় ছয়টা গদার বাড়ি মারল, তবু লাফাতে লাফাতে চলে গেল। সোজা কথা? ভীমের ঐ গদা বিশ-পঁচিশ মন হবে, না বউদি?

কিন্তু গদাতত্ত্বের আলোচনা আর অধিক চলিল না, বামুন-ঠাকরুন ডাকিতেছিলেন—ও মোক্ষদা, ডাকতে গেলি নে? যা দিদি, আমি আর কত রাত অবধি ভাত চৌকি দেব?

উমাও বলিল—যাচ্ছিস ডাকতে? যা—কেন মিছিমিছি রাত করিস? আর ঐ যে অশ্বত্থামা—চিনতে পারবি নে?—যে দুধ দুধ করে কাঁদছিল গো, তাকেও ডেকে আনবি। বারোজন খাবে আমাদের বাড়িতে—ঐ ছেলেটাও খাবে। যদি না আসতে চায়, ছাড়বি নে, বুঝলি?

মোক্ষদা ডাকিতে চলিয়া গেল।

এবারে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া উমা দেখিল আয়োজন প্রচুর। ভীমরুলের ডিমের মতো মোটা মোটা আউশচালের ভাত, পুঁইডাঁটার চচ্চড়ি এবং খেসারির ডাল রান্না হইয়া গিয়াছে, এখন নিবন্ত উনানে পাঁচ-সাতটি বেগুন পোড়াইয়া দিলেই হইয়া যায়। কহিল, ও বামুন-মা, করেছ কি? এই দিয়ে লোকগুলো কি করে খাবে?

বামুন-ঠাকরুন আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—বল কি বউমা, বেগুন-পোড়া দিয়ে তিন-তিনটে তরকারি হল—আরো খাবে কি দিয়ে? বাড়িতে ওরা কি সোনা-স্বর্ণ খেয়ে থাকে? তুমি ছেলেমানুষ, জানো না তো!

কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও উমা জানে। এই সব লোক—যাহারা যাত্রার দলে রাজা সাজিয়া বেড়ায়, আবার বাড়িতেও ভাঙামণ্ডপে সাবেকি চালে একরকম নিশ্চিন্তভাবে হুঁকা টানিয়া থাকে এবং ধান-ভরা সবুজ বিলের

মাঝখানে দাঁড়াইয়া আগামী পৌষে নূতন গোলা বাঁধিবার স্বপ্ন দেখে, তাহারা সদাসর্বদা যে-অপরূপ সোনা-সুবর্ণ খাইয়া থাকে তাহা উমা ভালো করিয়াই জানে···সেই যে রূপকথার কোন কাঠকুড়ানি ছেলে-মেয়ে বনের মধ্যে দিয়া যাইতেছিল, রাজবাড়ির শ্বেতহস্তী শুঁড়ে করিয়া আনিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিল—উমারও হইল তাই।

উমার বাপের বাড়ি উজ্জ্বলপুরে, এখান হইতে পুরা তিনটি ভাঁটির পথ, একেবারে মধুমতীর উপর। পাঁচ বৎসর আগে সেখানে প্রতি রাত্রে দিদি ও ভাইটি মায়ের কোলে জড়াজড়ি করিয়া শুইয়া থাকিত। বোকা ভাইটি—তার নাম হারান। এমনি অবোধ যে আর সকলের মতো তাহাদেরও বাবা বাঁচিয়া ছিল—এ রকম অসম্ভব কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিত না, ইহা লইয়া উমার সঙ্গে ঘোরতর তর্ক করিত।

একবার হইয়াছে কি, চৌধুরিবাড়ি অমিয়ার বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতা হইতে নানান রকম জিনিস আসিয়াছে। সেদিন হারানের আর টিকি দেখিবার জো নাই, বেলা দুপুর অবধি আগামী উৎসবের আয়োজন দেখিতেছে। অমিয়ার কাকা ট্রাঙ্ক খুলিয়া জিনিসপত্র বাহির করিয়া অমিয়ার মাকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন, উবু হইয়া বসিয়া হারান একমনে তাহা দেখিতেছিল।

, বাড়ি ফিরিয়া হারান উমাকে চুপি চুপি কহিল—আজ এক তা পেয়েছি, কাউকে বলিস নে দিদি। ভুলে ওরা রোয়াকের পরে ফেলে চলে গেল, কেউ নেই দেখে তুলে নিলাম। কি বল্ দিকি? কলকাতার মেঠাই—না? বলিয়া চারিদিক তাকাইয়া কোঁচার খুঁট হইতে অতি সন্তর্পণে সেই দুষ্প্রাপ্য কলি-কাতার মিঠাই বাহির করিল।

দেখিয়া খানিকক্ষণ তো হাসির চোটে উমা কথাই কহিতে পারিল না—একটা টকটকে রাঙা মোমবাতি। বলিল—ও হারান, ওরে বোকা, তুই যেন কি—বাতি চিনিস নে? বাতি—বাতি···জ্বেলে দিলে ঠিক পিদ্দিমের মতো আলো হয়।

দিদির অত হাসি দেখিয়া হারান অপ্রস্তুত হইয়া প্রথমটা কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু একটু সামলাইয়া লইয়া শেষে পুরাদস্তুর তর্ক করিতে লাগিল, উহা কক্ষনো বাতি নয়—সে বুঝি বাতি চেনে না? চৌধুরিদের মানিক নন্দ প্রভৃতিকে স্বচক্ষে ঐ বস্তু খাইতে দেখিয়াছে যে!···

উজ্জ্বলপুর গ্রামখানি পরগণে সৈদাবাদের মধ্যে, অতএব তিলসোনার মজুমদার-এস্টেটের অন্তর্গত।

তখনও বামুন-ঠাকরুন একলা ভাত লইয়া বসিয়া আছেন। বলিলেন—দেখ তো মা মোক্ষদার কাণ্ড! এখনও এল না। হতভাগী কোথায় গল্প গিলতে বসেছে।

উমা বলিল—ওর ঐ রকম, কিছু বোঝে না। আচ্ছা—তুমিও তো যাত্রা শুনেছ বামুন-মা, সব চাইতে ভালো একটো করলে কে? অশ্বত্থামা, না?

বামুন-ঠাকরুন ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—ছাই! একটোর কথা যদি বল ভীমের উপরে কেউ নেই। প্রথমে মোহড়ায় গোটা দুই লাফ দিয়েছে কি, সামনে যে ছেলেগুলো বসেছিল তারা ছুটে একেবারে নাটমণ্ডপের নিচে। হবে না, কত বড় বীর! মহাভারত পড় নি বৌমা?

উমা কহিল—তা ঠিক। কিন্তু অশ্বত্থামাকে দেখে আমার বড্ড কষ্ট হয়। গরিব বামুনের অবোধ ছেলে, একটুখানি দুধের জন্য কি কান্নাটাই কাঁদলে! তারপর দুধের বাটিটা আগাইয়া দিয়া বলিল—ঐ অশ্বত্থামা ছোকরা এখানেই খেতে আসবে, তুমি তাকে এই দুধটুকু দিও বামুন-মা।

বিড়ালের বড় উপদ্রব। বামুন-ঠাকরুন দুধের বাটি তাকের উপর তুলিয়া ঢাকা দিয়া রাখিলেন। উমা চুপ করিয়া রহিল, তারপর উনানের কাছে সরিয়া গিয়া বসিয়া বলিল—এবারে শীত যা পড়বে—এরি মধ্যে কেমন শীত-শীত লাগছে, দেখ না। আর আমার বাপের বাড়ি এদ্দিন ঠিক লেপ গায়ে দিতে হচ্ছে—একেবারে মধুমতীর উপর কি না! হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল—মজার কথা শোনো বামুন-মা, আজকে প্রথমে যখন অশ্বত্থামা আসরে এল, আমি ভাবলাম আমার ভাই হারান এল বুঝি। অমন পেটুক তুমি ভূ-ভারতে দেখ নি কখনো। অশ্বত্থামা যখন দুধ দুধ করে কাঁদছিল, আমার মনে হল হারান কাঁদছে।

বামুন-ঠাকরুন কহিলেন—তোমার ভাই বুঝি ঐ রকম দেখতে—

উমা কহিল—দূর! ওর চেয়ে ঢের ছোট আর ধবধবে ফরশা—যেন কড়ির পুতুল। সেবারে যখন এখানে আসি খুব ভোরবেলা—পানসিতে উঠে দেখলাম, হারান কখন এসে ঘাটকিনারে বাবলাতলায় দাঁড়িয়ে আছে। পানসিতে ডেকে তার কড়ে আঙুলে একটু কামড় দিয়ে এলাম। আঙুল কামড়ালে নাকি মায়া-মমতা ছেড়ে যায়—ও সব ছাই কথা!

বামুন-ঠাকরুন উমার দিকে চাহিয়া শুনিতেছিলেন···সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি অনেক দিন বাপের বাড়ি যাও নি, না বউমা?

উমা মুখখানা ম্লান করিয়া কহিল—হ্যাঁ—আজ তিন বছর। শ্বশুরঠাকুর মারা যাবার পরে আর যেতে পারি নি। হারান বলেছিল—দিদি, তোমার বাড়ি গিয়ে কলকাতার মেঠাই খেয়ে আসব—সে-ও এল না।

বামুন-ঠাকরুন সমবেদনা প্রকাশ করিয়া কহিলেন—আহা! আসে না কেন?

উমা বলিল—আসে কার সঙ্গে? মোটে এগারো বছর বয়স। আর ক-টা বছর বাদে বড় হয়ে আসবে ঠিক। এসে সে আমাকে ফি বছর উজ্জলপুরে নিয়ে যাবে। তখন বছর বছর যাব, কাউকে খোশামোদ করছি নে, আর ক-টা বছর যাক না।

এমন সময় ছেলে কাঁদিয়া উঠিল, কান্না তো নয় যেন উপরে ডাকাত পড়িয়াছে। উমার বড় ইচ্ছা করিতেছিল, যাত্রার লোকদের খাওয়া হইয়া গেলে তবে যাইবে, কিন্তু আর দাঁড়ানো চলে না। যাইবার সময় বলিয়া গেল—বামুন-মা, ঐ ছোকরাকে মনে করে দুধটুকু দিও—ভুলো না যেন। তোমার যে ভোলা মন!

এমনি বেশ শান্ত—কিন্তু উমার খোকা একবার কান্না যদি আরম্ভ করিয়াছে, অবাক হইয়া যাইতে হয় অতটুকু গলায় ঐ প্রকার আওয়াজ উঠে কি করিয়া?

ইতিমধ্যে রমানাথেরও ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, উমাকে দেখিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল—কোথায় ছিলে এতক্ষণ? জ্বালাতন করলে! যাও, তোমার ছেলে নিয়ে যাও।

উমা ছেলে কোলে করিয়া বাহিরে ছাদের উপরে আসিল।

অন্ধকার রাত্রির মাথার উপর লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র জ্বলিতেছে। উমা ছাদের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছেলে শান্ত করিতে লাগিল। ছেলেকে বুকের উপর চাপিয়া বারংবার বলিতেছিল—কাঁদিস নি মানিক আমার, ধন আমার, আর কাঁদে না। আজকে আর দুধ পাবি নে—তোর সে দুধ দিয়ে দিইছি—একদিন দুধ না খেলে কি হয়? ওরে হিংসুটে, তবু কাঁদিস? তুই রোজ খাস, ওরা যে জন্মে কোনো দিন দুধ খেতে পায় না—। চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া আবার বলিতে লাগিল—আ-মরে যাই, মরে যাই, খোকনমণির কি হয়েছে? ও খোকা, মামার বাড়ি যাবি? মামা দেখবি?

তুই ঘুমিয়েছিস, দেখলি নে খোকা, তোর মামা এসেছিল। কেমন সুন্দর টুকটুকে মামা। দুধ-টুধ যা ছিল সব সে খেয়ে গেছে, এক ফোঁটাও নেই। কান্না কেন ও আমার গোপাল, তুমি এখন ঘুমোও। আয় চাঁদ আয়-আয়—খোকার কপালে চিক দিয়ে যা।

উমা আবার যখন ঘরে ফিরিয়া আসিল, রমানাথ বিছানায় উঠিয়া বসিয়া আলো ধরিয়া ছারপোকা মারিতেছে। কহিল—নতুন হিম পড়ছে, অমনি করে এখন বাইরে বাইরে ঘোরে?

যেন কে কাহাকে কহিতেছে, উমা যেন ঘরে নাই। ঘুমন্ত ছেলে কোল হইতে নামাইয়া সে আস্তে আস্তে শোয়াইয়া দিল।

রমানাথ কাছে আসিয়া উমার একখানি হাত ধরিয়া বলিল—রাগ করেছ উমা? ঘুমের ঘোরে আমি কি বকেছি, আমার কিছু মনে নেই।

আর উমা চোখের জল ঠেকাইতে পারিল না, বর্ষার মধুমতী উমার চোখের কূলে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল। রমানাথের কোলের উপর মাথা রাখিয়া উমা কাঁদিতে লাগিল, আর রমানাথ বিব্রত হইয়া তাহার চোখ মুছাইতে মুছাইতে বলিতে লাগিল—আমায় মাপ করো, মাপ করো উমা। অত কাঁদছ কেন? না, একেবারে পাগল তুমি!

কতক্ষণ পরে কাঁদিতে কাঁদিতে উমা বলিল—আমি উজ্জ্বলপুরে যাব, কতদিন যাই নি বলো তো। আমার বুঝি হারানকে মাকে দেখতে ইচ্ছা করে না!

রমানাথ বলিল—এই কথা? দাঁড়াও, কিস্তির মুখটা কেটে যাক, তারপর ছয় দাঁড়ের পানসি নিয়ে যাব। তুমি যাবে, আমি যাব, খোকা যাবে, আর মোক্ষদাও যাবে, আর কেঁদো না লক্ষ্মীটি।

যাত্রাওয়ালাদের ডাকিয়া আনিতে সত্যসত্যই অনেক রাত্রি হইয়া গেল, কিন্তু তাহাতে মোক্ষদার অপরাধ নাই। মোক্ষদা গিয়া দেখিল, অশ্বত্থামা ইতিমধ্যে পোশাক ছাড়িয়া ফেলিয়া বেঞ্চে বসিয়া বিড়ি টানিতেছে, কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি রথিবৃন্দ দাড়ি-গোঁফ-সমন্বিত অবস্থাতেই বায়নার টাকার বখরা করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। অবশেষে অনেক কষ্টে হিসাব মিটিয়া প্রতিজনের ভাগে সাড়ে দশ আনা করিয়া পড়িল। দ্রোণাচার্য পয়সা গণিয়া ট্যাঁকে বাঁধিলেন, তারপর ছোঁ মারিয়া অশ্বত্থামার মুখ হইতে বিড়িটি কাড়িয়া লইয়া টানিতে লাগিলেন। অধিকারী অমনি হাঁ-হাঁ করিয়া আসিল, অমন দাড়ি-পরা

অবস্থায় বিড়ি খায় কখনো? পাঁচসিকা দামের দাড়িটায় আগুন লাগিলে একেবারে সর্বনাশ হইয়া যাইবে যে!

বারোজনকে একত্র করিয়া গোছাইয়া বাড়ির ভিতর লইয়া যাইতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল।

আর সকলের খেসারি-ডাল অবধি পৌছিয়া ইতি, কেবলমাত্র সৃষ্টিধরের পাতের কোলে দুধের বাটি আসিল। সে যে আজিকার আসরে অত্যুৎকৃষ্ট একটো করিয়া সকলকে বিমোহিত করিয়াছে এবং তজ্জন্য অন্তঃপুরে আহারের এই বিশেষ ব্যবস্থা, তাহাতে সৃষ্টিধরের সন্দেহমাত্র রহিল না।

ফার্স্ট বুক ও চিত্রাঙ্গদা

রামোত্তর রায় মহাশয়ের সেজ ছেলে ননী তিন বছরে তেরোখানা ফার্স্ট বুক ছিঁড়িল, কিন্তু ঘোড়ার গল্প ছাড়াইতে পারিল না।

ব্যাপারটা আর কোনোক্রমে অবহেলা করা চলে না। অতএব পশু মাস্টারের ডাক পড়িল।

পশুপতির নামডাক যেমন বেশি, দরও তেমনি কিছু বেশি। তা হউক। ছেলে আকাটমূর্খ হইয়া থাকে, সে জায়গায় দু-একটা টাকার কম-বেশি এমন কিছু বড় কথা নয়।

সাব্যস্ত হইল, আট টাকা মাহিনা, তা ছাড়া রায় মশায়ের বাড়িতেই পশুপতি খাইবে, থাকিবে। পড়াইতে হইবে ফার্স্ট বুক, শিশুশিক্ষা, সরল পাটি-গণিত—সকালে একঘণ্টা, সন্ধ্যার পর দু-ঘণ্টা মাত্র।

বাহিরবাড়ির কাছারিঘরের পাশে ছোট্ট সঙ্কীর্ণ ঘরখানিতে চুন ও সুরকি বোঝাই থাকিত, উহা পরিষ্কৃত হইয়া একপাশে পড়িল তক্তাপোশ আর এক-পাশে একটি টেবিল ও ছোট বেঞ্চি একখানি।

পড়াশুনা বিপুল বেগে আরম্ভ হইল।

লোকে যে বলে, পশু-মাস্টার গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করিতে পারে—তাহা মোটেই মিথ্যা নয়। ছয় মাস না যাইতেই ননী শিশুশিক্ষা ছাড়াইয়া বোধোদয়

ধরিল, পাটিগণিতের ত্রৈরাশিক শুরু হইয়া গিয়াছে, ফার্স্টবুকও শেষ হইবার বড় বেশি দেরি নাই।

আশ্বিন মাস। দেবীপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি।

অন্যান্য বার মহালয়ার সঙ্গেই ইস্কুল বন্ধ হইয়া যায়। এবার বছর বড় খারাপ, ছেলেরা মাহিনাপত্র মোটে দিতেছে না, তাই দেরি পড়িয়া যাইতেছে।

সকাল হইতে আকাশ মেঘলা। স্নান সম্বন্ধে বারোমাসই পশুপতি একটু বেশি সাবধান হইয়া চলে; এমন বাদলার দিনে তো আরোই। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া ইস্কুলের পথে পা বাড়াইয়াছে, এমন সময়ে পিওন একখানা চিঠি দিয়া গেল।

খামের চিঠি হইলে কি হয়, ইস্কুলমাস্টারের নামে আসিয়াছে—অতএব ভিতরে এমন কিছু থাকিতে পারে না, যাহা না পড়া পর্যন্ত প্রাণ আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতে থাকে। এমনই আঁকাবাঁকা অক্ষরে ঠিকানা-লেখা খাম পশুপতির নামে বহুকাল ধরিয়া আসিতেছে। বিবাহের পর প্রথম বছর তিন-চারের কথা ছাড়িয়া দিলে পরবর্তী সকল চিঠির সুর একটিমাত্র। খাম না ছিঁড়িয়া পত্রের মর্ম স্বচ্ছন্দে আগে হইতে বলিয়া দেওয়া যায়, প্রভাসিনী সংসার-খরচের টাকা চাহিয়াছে।

ইস্কুলে গিয়া স্থির হইয়া বসিতে না বসিতে ঘণ্টা বাজিল।

প্রথমে অঙ্কের ক্লাস। ক্লাসে ঢুকিয়াই প্রকাণ্ড একটা জটিল ভগ্নাংশ বোর্ডে লিখিয়া পশুপতি হুঙ্কার দিল—খাতা বের কর—টুকে নে। বলাটা অধিকন্তু, সকল ছেলে ইহা জানে এবং প্রস্তুত হইয়াই ছিল। তারপর বোর্ডের উপর নক্ষত্রগতিতে অঙ্কের ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইল। পশুপতি কষিয়া যাইতেছে, মুছিতেছে, আবার কষিতেছে। জোর-কদমে-চলা ঘোড়ার খুরের মতো খটাখট ক্রমাগত খড়ির আওয়াজ, তা ছাড়া সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ। ক্লাসের মধ্যে যেন কোনো ছেলে নাই, কিংবা থাকিলেও হয়তো একেবারে মরিয়া আছে। প্রকাণ্ড খড়ির তাল দেখিতে দেখিতে জ্যামিতিক বিন্দুতে পরিণত হইয়া গেল। ছেলেরা একটা অঙ্কের মাঝামাঝি লিখিতে লিখিতে তাকাইয়া দেখে কোন্ ফাঁকে সেটা শেষ হইয়া আর-একটি শুরু হইয়াছে; দ্বিতীয়টি না লিখিতে সেটা মুছিয়া তৃতীয় একটা আরম্ভ হয় এবং সেটা ধরিবার উপক্রম করিতে করিতে পরেরটি শেষ হইয়া যায়। গায়ে তাহার নীল খদ্দরের জামা।

ইহারই মধ্যে যখন একটু ফাঁক পায়, পকেট হইতে নস্যের শামুক বাহির করিয়া এক টিপ নাকে গুঁজিয়া দেয়, তারপর নাকের বাহিরের নস্য ঝাড়িয়া হাতখানা জামার উপর ঘসিয়া সাফ করিয়া আরম্ভ করে—শেষ হল? ক্লেম দিচ্ছি আর গোটা আষ্টেক।

এমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। লোকের মুখে পশু-মাস্টারের এত নামডাক শুধু শুধু হয় নাই, সে তিলার্ধ ফাঁকি দেয় না।

চারিটা ক্লাস পড়াইবার পর টিফিনের ঘণ্টা বাজিলে পশুপতি বাহির হইয়া আসিল। তখন নস্য ও খড়ির গুঁড়ায় জামার নীল রঙ ধূসর হইয়া গিয়াছে।

সিঁড়ির নিচে জানলাবিহীন ঘরখানিতে ক্লাস বসানো যায় না। ইনস্পেক্টর মানা করিয়া গিয়াছে, সেখানে বসিলে ছেলেদের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যাইবে। সেইটি মাস্টারদের বসিবার ঘর। ইতিমধ্যেই সকলে আসিয়া জুটিয়াছেন। হুঁকা গোটা পাঁচ-সাত—কোনোটার গলায় কড়ি-বাঁধা, কোনোটায় কেবলমাত্র রাঙা সুতা, একটির নলচের উপর আবার ছুরি দিয়া গর্ত করিয়া লেখা হইয়াছে 'মা' অর্থাৎ মাহিষ্যের হুঁকা। নিজ নিজ জাতি বিবেচনা করিয়া মাস্টাররা উহার এক-একটি তুলিয়া লইলেন। যাঁহাদের ভাগ্যে হুঁকা জোটে নাই, তাঁহারা অনুকল্পে বিড়ি ধরাইলেন। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ছোট ঘরখানি অন্ধকার। রসালাপ ও প্রচণ্ড হাসি ক্রমশ জমিয়া আসিল। ক্ষণে ক্ষণে আশঙ্কা হয়, বুঝি-বা অত আনন্দের ধাক্কা সহিতে না পারিয়া বহুকালের পুরানো ছাদ ভাঙিয়া-চুরিয়া সকলের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে।

কিন্তু ইস্কুলের জন্মকাল হইতে এমনি আটত্রিশ বছর চলিয়া আসিতেছে, ছাদ ভাঙিয়া পড়ে নাই।

উহারই মধ্যে একটা কোণে বসিয়া পশুপতি খামখানা খুলিল। খুলিতেই আসল চিঠিখানা ছাড়া আর-এক টুকরা কাগজ উড়িয়া মেজেয় গিয়া পড়িল। তুলিয়া দেখে—অবাক কাণ্ড! ইহা হইল কি করিয়া?

এই সেদিন মাত্র সে খোকাকে ধরিয়া ধরিয়া অ-আ লিখাইয়া বাড়ি হইতে আসিয়াছে, এরই মধ্যে ছেলে নিজের হাতে পত্র লিখিয়াছে। কাহাকে দিয়া কাগজের উপর পেন্সিলের দাগ কাটিয়া লইয়াছে, সেই ফাঁকের মধ্যে বড় বড় করিয়া লিখিয়াছে—

বাবা, আমি পড়িতে ও লিখিতে শিখিয়াছি। ছবির বই আনিবে। ইতি।—কমল।

একবার, দুইবার, তিনবার সে পড়িল। লেখা যেমনই হউক, অক্ষরের ছাঁদ কিন্তু বেশ। বড় হইলে খোকার হাতের লেখা ভারি সুন্দর হইবে। পশুপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। এই ছেলে আবার বড় হইবে, তাহার দুঃখ ঘুচাইবে, বিশ্বাস তো হয় না! পর পর আরও তিনটি এমনি বয়সে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে।···ভাবিতে ভাবিতে সে কেমন একটু উন্মনা হইয়া পড়িল।

পরক্ষণে খোকার চিঠি খামে পুরিয়া বাহির করিল প্রভাসিনী যেখানা লিখিয়াছে।

ছোট ছোট অক্ষরের সারি চলিয়াছে যেন সারবন্দী পিপীলিকা। বিস্তর দরকারি কথা—সাংসারিক অনটন, ধানচালের বাজার-দর, গোয়ালের ফুটা চাল দিয়া জল পড়িতেছে, তারিণী মুখুজ্জে বাস্তুভিটার খাজনার জন্য রোজ একবার তাগাদা করিয়া যায়—ইত্যাদি সমাপ্ত করিয়া শেষকালে আসিয়া ঠেকিয়াছে কয়েকটি অত্যাবশ্যক জিনিসের ফর্দ—ছুটিতে বাড়ি যাইবার মুখে খুলনা হইতে অতি অবশ্য অবশ্য সেগুলি কিনিয়া লইয়া যাইতে হইবে, ভুল না হয়।

পশুপতি ফর্দখানির উপর আর-একবার চোখ বুলাইল, তারপর পকেট হইতে পেন্সিল লইয়া পাশে পাশে দাম ধরিতে লাগিল।

কি ভাগ্য যে এতক্ষণ এদিকে কাহারও নজর পড়ে নাই। এইবার রসিক পণ্ডিত দেখিতে পাইল এবং ইশারা করিয়া সকলকে কাণ্ডটা দেখাইল। তারপর হঠাৎ ভারি ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিল—পশুভায়া, করেছ কি? হাটের মধ্যে প্রেমপত্তোর বের করতে হয়? ঢাকো—শিগগির ঢাকো, সব দেখে নিল।

পশুপতি আপনার মনে ছিল, তাড়াতাড়ি চিঠি চাপা দিয়া মুখ তুলিল।

হাসি চাপিয়া অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো রসিক কহিল—ঐ নকুড়চন্দোর বাবুর কাণ্ড, আড়চোখে দেখেছিলেন।

নকুড়চন্দ্র বসিয়াছিলেন ঘরের বিপরীত কোণে। বুড়ামানুষ, কাহারও স্ত্রীর চিঠি চুরি করিয়া দেখিবার বয়স তাঁহার নাই। পশুপতি বুঝিল, ইহাদের সুদৃষ্টি যখন পড়িয়াছে এখানে বসিয়া আর কিছু হইবে না। উঠিয়া পড়িল।

মন্মথ গরাই অত্যন্ত সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল—মিছে কথা পশুপতিবাবু, কেউ দেখছে না। আপনি বসুন, বসুন। পণ্ডিত মশায়ের অন্যায়, ভদ্রলোকের পাঠে বাধা দিলেন। আপনি এই আমার পাশে এসে বসুন।···গিন্নি কি পাঠ দিয়েছেন সেইটে একবার পড়ে শোনাতে হবে কিন্তু—

পশুপতি কোনোদিন এইসব রসিকতায় যোগ দেয় না। আজ তাহার কি হইয়াছে, বলিল—এই কথা? তা শুনুন না—বলিয়া চিঠির উপর দৃষ্টি দিয়া মিছামিছি বলিতে লাগিল—প্রাণবল্লভ, প্রাণেশ্বর, হৃদয়রঞ্জন, আর সব ও-পাতায় আছে। হল তো? পথ ছাড়ুন মন্মথবাবু। বলিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

রসিক কহিতে লাগিল—দেখলে? তোমরা তর্ক করতে, পশুপতি হাসতে জানে না—দেখলে তো? অন্য দিন বাড়ির চিঠি পেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে, আজ যেন নবযৌবন পেয়েছে। ওহে মন্মথ, আজকের চিঠিতে কি আছে একবার দেখতে পার চুরি-চামারি করে?

ঘরের বাহির হইয়াই কিন্তু পশুপতির হাসি নিবিয়া গিয়া ভাবনা ধরিল—পাঁচ টাকা দু আনার মধ্যে প্রভাসিনীর শাড়ি, খোকার জামা, জিরামরিচ, পানে খাইবার চুন দু-সের, এক কৌটা বার্লি, বালতি এবং ছবির বই—এতগুলি কি করিয়া কুলাইয়া উঠে?

তখন ছেলের দল হাসিয়া খেলিয়া চেঁচাইয়া লাফাইয়া ইস্কুলের উঠানটি মাত করিয়া ফেলিয়াছে। পশু-মাস্টারকে দেখিয়া সকলে সন্ত্রস্তভাবে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল।

কিন্তু পশুপতির কোনো দিকে নজর নাই, সে ভাবিতেছে—

ইস্কুলে পঁচিশ টাকা বলিয়া তাহাকে সহি করিতে হয়, কিন্তু আসল মাহিনা পনরো টাকা। চিঠিতে ঐ যে তারিণী মুখুজ্জের তাগাদার কথা লিখিয়াছে, এবার বাড়ি গেলে মুখুজ্জের খাজনা অন্তত টাকা তিন-চার না দিলে রক্ষা নাই। আবার অগ্রহায়ণে নূতন ধান-চাল উঠিবে, চাষীদের সহিত ঠিকঠাক করিয়া এখনই অগ্রিম কিছু দিয়া আসিতে হইবে, না হইলে পরে দেখিয়া শুনিয়া কে কিনিয়া দিবে? অতএব ইস্কুলের মাহিনার এক পয়সা খরচ করিলে হইবে না। ভরসা কেবল রামোত্তমের বাড়ির আটটি টাকা। তাহা হইতে বাড়ি যাইবার রেল-স্টীমারের ভাড়া দুই টাকা চৌদ্দ আনা বাদ দিলে দাঁড়ায় পাঁচ টাকা দু আনা। সমস্ত পূজার বাজার ঐ পাঁচ টাকা দু আনার মধ্যে।

হেডমাস্টার কোনো দিক দিয়া হঠাৎ কাছে আসিয়া ফিশ-ফিশ করিয়া কহিলেন—সেক্রেটারির অর্ডার এসেছে, বন্ধ শনিবারে। ছেলেদের এখন কিছু বলবেন না, খালি ভয় দেখাবেন—কালকের মধ্যে যদি মাইনে সব শোধ না

করে তবে একদম ছুটি হবে না। মাইনেপত্তোর আদায় যদি না হয়, বুঝতে পারছেন তো?

ছুটির পর পশুপতি ও বুড়া নকুড়চন্দ্র পাকা-রাস্তার পথ ধরিল। নকুড় কহিলেন—বন্ধ তা হলে শনিবারে ঠিক? শনিবারেই রওনা হচ্ছ পশুবাবু?

সে কথার জবাব না দিয়া পশুপতি জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা নকুড়বাবু, ছবির বই একখানার দাম কত?

—কি বই তা বলো আগে। ছবির বই কি একরকম?—দু টাকার তিন টাকার আছে, আবার বিনি-পয়সাতেও হয়।

পশুপতি কাছে আসিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—বিনি-পয়সায় কি রকম? বিনি-পয়সায় ছবির বই দেয় নাকি? কি বই?

নকুড় কহিলেন—ক্যাটালগ। ছেলে-ভুলানো ব্যাপার তো! একখানা কবিরাজি ক্যাটালগ নিয়ে যেও। এই ধরো, হাঁপানি-সংহারক তৈল—পাশে দিব্যি ছবি, একটা লোক ধুঁকছে—কোলের উপর বালিশ—বউ তেল মালিশ করছে। ছেলেকে দেখিয়ে দিও।

যুক্তি পশুপতির পছন্দ হইল না, হাসি পাইল। কমলকে দেখেন নাই তো! সে যে বানান করিয়া করিয়া পড়িতে শিখিয়াছে, তাহার কাছে চালাকি চলিবে না।

কহিল—না, তাতে কাজ নেই—একখানা ছবির বই, সত্যি-সত্যি ছবির বইয়ের দাম কত পড়বে? দু টাকা তিন টাকা ও-সব বড়মানুষি কথা ছেড়ে দিন, খুব কমের মধ্যে—যার কমে আর হয় না, কত লাগবে?

নকুড় কহিলেন—বোধ হয় গণ্ডা চারেক পয়সা নেবে, কিনি নি কখনও। মাস্টারির পয়সা—মুখে-রক্ত-ওঠানো পয়সা—ও রকম বাজে খরচ করলে চলে?

পশুপতি তখন ফর্দ বাহির করিয়া আর একবার পড়িতে পড়িতে জিজ্ঞাসা করিল—আর, পাথুরে চুন দু সের?

নকুড় কহিলেন—তিন আনা।

এবারে নকুড়ের হাতে কমলের চিঠিটুকু দিল। কহিল—মজাটা দেখুন মশাই, ছেলে আবার চিঠি লিখেছে—ফরমায়েশটা দেখুন পড়ে একবার। বলিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর বড় ফর্দখানি দেখাইয়া

বলিল—বড় সমস্যায় পড়েছি, একটা সংযুক্তি দিন তো নকুড়বাবু। পুঁজি মোটে পাঁচ টাকা ছ আনা—ফর্দের কোন কোনটা বাদ দি ?

দেখি—বলিয়া নকুড় চশমা বাহির করিয়া নাকের উপর পরিলেন। তারপর বিশেষ প্রণিধান করিয়া বলিলেন—ছেলেপিলের ঘর, দুধ মেলে না বোধ হয়—তাই বার্লির কথা লিখেছে ; ওটা নিয়ে যেও। তা জিরেমরিচ চুন-টুন সব বাদ দাও। ছবির বই পয়সা দিয়ে কিনে কি হবে ? যা বললাম, পার তো একখানা ক্যাটালগ নিয়ে যেও। তোমরা বোঝ না—ছেলেপিলে যখন আবদার করে, মোটে আশকারা দিতে নেই। তাদের শিখিয়ে দিতে হয়, এক আধলাও যাতে বাজে খরচ না করে। গোড়া থেকে মিতব্যয়িতা শিখুক, তবে তো মানুষ হবে।

মনে কেমন কেমন লাগে বটে, কিন্তু মোটের উপর নকুড়ের কথাটা ঠিক। পশুপতির স্মরণ হইল, সে-ও ক্লাসের একখানি বাংলা বহিতে সেদিন পড়াইতেছিল—'অপব্যয় না করিলে অভাব হয় না। হে শিশুগণ, তোমরা মিতব্যয়ী হইতে অভ্যাস করিবে। তাহা হইলে জীবনে কদাপি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না…' এমনি অনেক ভালো ভালো কথা।

ছবির বই, জিরামরিচ ও চুন কিনিয়া কাজ নাই তবে, বালতি, বার্লি ও কাপড়-জামা কিনিয়া লইলেই চলিবে।

নকুড় কহিতে লাগিলেন—তিল কুড়িয়ে তাল। হিসেব করে দেখো তো ভায়া, ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমরা কত পয়সা অপব্যয় করেছি। সেইগুলি যদি জমানো থাকত তবে আজ দুঃখ কিসের ? বাঙালি জাত দুঃখ পায় কি সাধে ?

পশুপতি আর কথা না কহিয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিল।

গ্রামের মধ্যে কয়েক বাড়ি দেবীর ঘটস্থাপনা হইয়াছে। বড় মধুর সানাই বাজিতেছে। পশুপতির কানে নূতন লাগিল—এমন বাজনা সে অনেক দিন শোনে নাই।

হঠাৎ সে হাসিয়া উঠিল, বলিল—কথা যা বললেন নকুড়বাবু, ঠিক কথা ! আমরা কি হিসেব করে চলি ? আমাকে আজ দেখছেন এই রকম—শখ করে আমিই একবার একখানা বই কিনি—সে-ও একরকম ছবির বই, ইস্কুল কলেজে পড়ায় না। দাম পাঁচ টাকা পুরো।

নকুড় শিহরিয়া উঠিলেন—পাঁচ টাকার বাজে বই, বল কি ?

—হুঁ, পাঁচ টাকা। তখন কি আমার এই দশা? বাবা বেঁচে। পায় পাম্প-শু, মাথায় টেড়ি। কলকাতায় বোর্ডিংয়ে থেকে পড়তাম। মাসে মাসে টাকা আসে। ফুর্তি কত! বইখানার নাম চিত্রাঙ্গদা—সেই যে অর্জুন আর চিত্রাঙ্গদা—পড়েন নি?

নকুড় কহিলেন—পড়ি নি আবার, কতবার পড়েছি। বলো যে মহাভারত। আজকাল সেই মহাভারত বিকুচ্ছে এগারো সিকেয়।

পশুপতি কহিল—মহাভারত নয়, তাহলেও বুঝতাম বই পড়ে পরকালের কিছু কাজ হবে। এমনি একখানা পদ্যের বই, পাতায় পাতায় ছবি। রাত-দিন তাই পড়ে পড়ে মুখস্থ করতাম। এখন একটা লাইনও মনে নেই।

পশুপতির নির্বুদ্ধিতার গল্প শুনিয়া নকুড় আর কথা বলিতে পারিলেন না। মহাভারত রামায়ণ নয়, মহামান্য ডিরেক্টর বাহাদুরের অনুমোদিত ইস্কুল-পাঠ্য বা কলেজের বই নয়, এমন বই লোকে পাঁচ টাকা দিয়া কিনিয়া পড়ে!

সেই-সব দিনের অবিবেচনার কথা ভাবিয়া পশুপতিরও অনুতাপ হইতেছিল। বলিল—তা-ও কি বইটা আছে? জানা নেই, শোনা নেই—পরস্য পর একটা মেয়ে—নির্বিচারে দামি বইটা তার হাতে তুলে দিলাম। কি বোকাই যে ছিলাম তখন! ও—আপনি তো এসে পড়েছেন একেবারে—আচ্ছা—

নকুড় বামদিকের বাঁশতলার সুঁড়িপথে নামিয়া পড়িলেন। সামনেই তাঁহার বাড়ি। কহিলেন—কাল আবার দেখা হবে। শিগগির শিগগির চলে যাও পশুবাবু, চারিদিকে থমথমা ছেয়ে আছে, বিষ্টি নামবে এক্ষুনি।

তখন সত্যসত্যই চারিদিক নিষ্কম্প, বাতাস আদৌ নাই, গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। মাথার উপরে অতি-ব্যস্ত আকাশ মেঘের উপর মেঘ সাজাইয়া নিঃশব্দে আয়োজন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।

আজ পাঁচ টাকার মধ্যে সমস্ত পূজার বাজার সারিতে হইতেছে, আর বহু বৎসর পূর্বে একদিন ঐ দামের একখানি নূতন বই নিতান্ত শখ করিয়া বিসর্জন দিয়াছিল, একবিন্দু ক্ষোভ হয় নাই—চলিতে চলিতে কতকাল পরে পশুপতির সেই কথা মনে হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে সে বাড়ি ফিরিতেছিল, অন্তরভরা আশা ও উল্লাস, হাতে চিত্রাঙ্গদা।

বনগাঁর পর দু-তিনটা স্টেশন ছাড়াইয়া—সে স্টেশনে ট্রেন থামিবার কথা

নয়—তবু থামিল। ইঞ্জিনের কোথায় কি কল বিগড়াইয়া গিয়াছে। যাত্রীরা অনেকে নামিয়া পড়িল।

প্লাটফরমের উপর দক্ষিণ দিকটায় জোড়া পাকুড়গাছ ছায়া করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার গোড়ায় স্টেশনের মরিচা-ধরা ওজনের কলটি। পাকুড়গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়া পা ছড়াইয়া কলটির উপর বসিয়া পশুপতি চিত্রাঙ্গদা খুলিয়া পড়িতে বসিল। লাইনের উপরে অনেক দূরে সূর্য অস্ত যায়-যায়। কুয়ায় কলসি ভরিয়া আ'লপথে গ্রামে ফিরিতে ফিরিতে বউ-ঝিরা তাকাইয়া তাকাইয়া রেলগাড়ি দেখিতেছিল।

পশুপতি একমনে পড়িয়া চলিয়াছে। ঠিক মনে নাই, বোধ করি অর্জুনের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার প্রথম পরিচয়ের মুখটা—খাসা জমিয়া উঠিয়াছে। এমন সময়ে সে অনুভব করিল, জোড়াগাছের পিছনে কেহ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেখানে চিত্রাঙ্গদার আসিবার তো সম্ভাবনা নাই। পশুপতি ভাবিল, হয় পানিপাঁড়ে কি পয়েণ্টস্‌ম্যান, নয় তো ছাগলে গাছের পাতা খাইতে আসিয়াছে। অতএব না ফিরিয়া পাতা উলটাইতে যাইতেছে, এমন সময়ে কাচের চুড়ি বাজিয়া উঠিল।

তাকাইয়া দেখে, বছর আষ্টেকের একটি মেয়ে, মুখখানার চারিপাশে কালো কালো চুলগুলি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে।

পশুপতি স্পষ্ট দেখিতে পাইল, মেয়েটির বড় বড় চোখ দুটির উপর লেখা রহিয়াছে সে ঐ পাতার ছবিগুলি ভালো করিয়া দেখিবে। আপিস-ঘরে টেলি-গ্রাফের কল টক-টক করিয়া বাজিয়া যাইতেছিল এবং লাইনের উপরে ইঞ্জিন একটানা শব্দ করিতেছিল—ইস্-স্-স্। আজ পশুপতি ভাবিতেছে, সে-সব নিছক পাগলামি—সেদিন কিন্তু সত্যসত্যই তাহার মনের মধ্যে এরূপ একটা ভাবাবেশ জমিয়া আসিয়াছিল, যেন সুবিপুল ব্রহ্মাণ্ড তাহার গতিবেগ থামাইয়া ম্লান অপরাহ্ণ-আলোয় মেয়েটির লুব্ধ ভীরু চোখ দুটিকে সমীহ করিয়া প্লাট-ফরমের ধারে চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিল—খুকি, ছবি দেখবে? দেখো না কেমন খাসা খাসা সব ছবি।

অনুরোধের অপেক্ষামাত্র।

তৎক্ষণাৎ মেয়েটি সেই মরিচা-ধরা ওজন-যন্ত্রের উপর বিনাদ্বিধায় পশুপতির পাশে বসিয়া পড়িল।

পশুপতি ছবির মানে বলিয়া দিতেছিল, সে নিজেও পশুপতির পাণ্ডিত্যের

মর্যাদা না রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে বানান করিয়া পড়িতেছিল। এমন সময় ঘণ্টা দিল। ইঞ্জিন ঠিক হইয়াছে—এইবার ছাড়িবে। পশুপতির মনে হইল, অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি করিয়া ইঞ্জিন ঠিক হইয়া গেল। মেয়েটির মুখখানিও হঠাৎ কেমন হইয়া গেল—তাহার ছবি দেখা তখনও শেষ হয় নাই, সে কথা মোটে না ভাবিয়া রেলগাড়ি তার সুদীর্ঘ জঠরে ছবির বই সমেত মানুষটিকে লইয়া এখনি গুড়গুড় করিয়া বিলের মধ্য দিয়া দৌড়াইবে—বোধ করি এইরূপ ভাবনায়। বইখানি মুড়িয়া নিজেই সে পশুপতির হাতে দিল, কোনো কথা বলিল না।

পশুপতি সেই সময়ে করিয়া বসিল প্রকাণ্ড বে-হিসাবি কাজ। সেই চিত্রাঙ্গদা তাহার ডুরে শাড়ির উপর রাখিয়া বলিল—এ বই তুমি রেখে দাও—ছবি দেখো, আর বড় হলে পড়ে দেখো—। নূতন বই—প্রায় আনকোরা, পাঁচ-পাঁচটা টাকা দিয়া কিনিয়াছিল। কেবল নিজের নামটি ছাড়া কালির আঁচড় পড়ে নাই। কাহাকে দিল তাহার পরিচয়ও জানে না—হয়তো কোনো রেলবাবুর মেয়ে কিংবা যাত্রীদের কেহ, অথবা নিকটবর্তী গ্রামবাসিনীও হইতে পারে।

* * *

রামোত্তম রায়ের বাড়ি বড় রাস্তার ঠিক পাশেই। রোয়াকে উঠিয়া পশুপতি ডাকিল—ও ননী, এক গ্লাস জল দিয়ে যা তো বাবা।

ননী জল দিয়া গেল। তাকের উপরে কাগজের ঠোঙায় এক পয়সার করিয়া বাতাসা কেনা থাকে। তাহার দুইখানি গালের মধ্যে ফেলিয়া ঢক-ঢক করিয়া সমস্ত জল খাইয়া পরম পরিতৃপ্তিতে পশুপতি কহিল—আঃ!

ইহাই নিত্যকার বৈকালিক জলযোগ।

তারপর এক ছিলিম তামাক খাইয়া চোখ বুঁজিয়া সে অনেকক্ষণ বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যা হইতে-না-হইতে প্রবলবেগে বৃষ্টি আসিল; সঙ্গে সঙ্গে বাতাস। রোয়াকের গোড়া হইতে একেবারে বড়রাস্তা অবধি উঠানের উপর দুই সারি সুপারিগাছ। গাছগুলি যেন মাথা ভাঙাভাঙি করিয়া মরিতেছে। জল গড়াইয়া উঠান ভাসাইয়া কলকল শব্দে রাস্তার নর্দমায় গিয়া পড়িতে লাগিল। কি মনে করিয়া পশুপতি তাড়াতাড়ি উঠিয়া জামার পকেট হইতে কমলের পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল।

ক্রমে চারিদিক আরও আঁধার করিয়া আসিল, আর নজর চলে না।

রাস্তার ঠিক ওপার হইতে ধানভরা সবুজ সুবিস্তীর্ণ বিলের আরম্ভ হইয়াছে, তাহার পরপারে অতি অস্পষ্ট খেজুর- ও নারিকেল -বন। সেইদিকে চাহিয়া পশুপতির মনটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। ঐ নারিকেলগাছের ছায়ায় গ্রামের মধ্যে চাষীদের ঘরবাড়ি। বৃষ্টি ও অন্ধকারে বাড়ি দেখা যাইতেছে না, অতি ক্ষীণ এক-একটা আলো কেবল নজরে পড়ে। গ্রামটি ছাড়াইলে তারপর হয়তো আবার বিল। এমনি কত গ্রাম, কত খালবিল, কত বাঁরোবেঁকি, কচিপাতা ও নাম-না-জানা বড় বড় গাঙ পার হইয়া শেষকালে আসিবে তাহার গ্রামের পাশের পশর নদী। ভাঁটা সরিয়া গেলে আজকাল চরের উপর বাঁধের ধারে ধারে শরতের মেঘভাঙা রৌদ্রে সেখানে বড় বড় কুমির শুইয়া থাকে। বাবলাগাছে হলদে-পাখি ডাকে। কমল মিহি স্বরে অবিকল পাখির ডাকের নকল করিতে পারে—বউ সরষে কোট্‌, বউ—

এমন দুষ্ট হইয়াছে কমলটা!

তাহাদের গ্রামের ঘাটে স্টীমার আসিয়া লাগে সন্ধ্যার পর। ঘাটের কাছেই বাড়ি, অন্ধকার সাবেককালের আম-বাগান এবং নাটা ও বেতের ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়া সরু পথ। তাহারই ফাঁকে ফাঁকে জোনাকিপোকার মতো একটি অতিশয় ছোট্ট আলো দূরে—বহুদূরে—পশুপতির স্তিমিত দৃষ্টির অগ্রে ঐ যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—আলো ছোট হইলে কি হয়, পশুপতি স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। আচ্ছা, তাহাদের গ্রামেও কি এই রকম ঝড়-বৃষ্টি হইতেছে? এই রকম অন্ধকার আকাশ, মেঘের ডাক···? হয়তো এসব কিছুই নয়। হয়তো সেদেশে এখন আকাশভরা তারা এবং প্রভাসিনী এতক্ষণ রান্নার যোগাড় করিতে করিতে আলো লইয়া এঘর-ওঘর করিতেছে। আর চারদিন পরে পশুপতি সেই অপূর্ব শীতল ছায়াচ্ছন্ন উঠানে গিয়া দাঁড়াইবে। খোকা?—সোনামানিক খোকন তখন কি করিতেছে? পড়িতেছে বোধ হয়—

পশুপতি ভাবিতে লাগিল, সে যেন পশর নদীর পারে তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া উঠিয়াছে, কমল শোবার ঘরে প্রদীপের আলোয় পড়া মুখস্থ করিতেছিল, বাপের সাড়া পাইয়া উঠানের উপর দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিল। এমন ছুটিতেছে, বুঝি-বা পড়িয়া যায়। আস্তে আয়, ওরে পাগলা একটু দেখেশুনে—অন্ধকারে হোঁচট খাবি, অত দৌড়ুস নি···

ঘনান্ধকার দুর্যোগের মধ্যে বহুদূর হইতে কমল আসিয়া যেন দুই হাত উঁচু করিয়া সুসজ্জদেহ অকালবৃদ্ধ ইস্কুল-মাস্টারের কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।...

রামোত্তম এতক্ষণ কাছারি-ঘরে কি কাজকর্ম করিতেছিলেন। এইবার বাড়ির মধ্যে চলিলেন। পশুপতিকে বলিলেন—মাস্টার মশায়, আপনিও চলুন—বাদলা-রাত্তিরে সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ুন আর কি! এই বৃষ্টিতে আপনার ছাত্তোর আর আসবে না।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া পশুপতি সকাল সকাল শুইয়া পড়িল। আলো নিবাইয়া দিল।

শুইয়া শুইয়া শুনিতে লাগিল, ঝড় দালানের দেয়ালে যেন উন্মত্ত ঐরাবতের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িতেছে, রুদ্ধ দরজা-জানলা খড়খড় করিয়া ঝাঁকাইতেছে, আকাশ চিরিয়া মেঘের ডাক, ছাদের নল হইতে ছড়ছড় করিয়া জল পড়ার শব্দ···সমস্ত মিলিয়া ঝটিকাক্ষুব্ধ নিশীথিনীর একটানা অস্পষ্ট চাপা আর্তনাদের মতো শোনাইতেছে।

পশুপতি আরাম করিয়া কাঁথা টানিয়া গায়ে দিল।

সেই অবিরল বাতাস ও বৃষ্টিধ্বনির মধ্যে পশুপতি শুনিতে লাগিল, গুনগুন গুনগুন করিয়া কমল পড়া মুখস্থ করিতেছে। কণ্ঠ কখনও উচ্চে উঠিতেছে, কখনও ক্ষীণ—ক্ষীণতর—অস্ফুটতম হইয়া স্বরের রেশটুকু মাত্র কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেছে—তন্দ্রা-ঘোরে আঁধার আমবাগানের মধ্য দিয়া বাড়িমুখো যাইতে যাইতে সে শুনিতে লাগিল। মনে হইল, ঘরের দাওয়ায় কাঁধের পুঁটুলি নামাইয়া সে যেন ডাকিতেছে—কই গো কোথায় সব?

খোকা আসিয়া সর্বাগ্রে পুঁটুলি লইয়া খুলিয়া ফেলিল। জিনিসপত্র একটা একটা করিয়া সরাইয়া রাখিতেছে, কি খুঁজিতেছে পশুপতি তাহা জানে। ম্লান-মুখে কমল প্রশ্ন করিল—বাবা, আমার ছবির বই?

পশুপতি উত্তর দিল—সোনামানিক আমার, বই তো আনতে পারি নি। অপব্যয় করতে নেই—বুঝলি খোকা, পয়সাকড়ি খুব বুঝেসুঝে খরচ করতে হয়। তাহলে পরে আর দুঃখ পাবি নে।

ছেলে ঠোঁট ফুলাইয়া সরিয়া বসিল। অবোধ বালকের অভিমানাহত মুখখানির স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে কতক্ষণ পরে পশু-মাস্টার ঘুমাইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রিতে হঠাৎ জাগিয়া ধড়মড় করিয়া সে বিছানার উপর উঠিয়া

বসিল। প্রাণপণ বলে বারংবার কে যেন দ্বারে ধাক্কা দিতেছে। ঝড়ের বেগ আরও বাড়িয়াছে বুঝি! এ কী প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড, দরজা সত্য সত্যই চুরমার করিয়া ফেলিবে না কি?

অন্ধকার ঘর। পশুপতির বোধ হইল, বাহির হইতে কে যেন ডাকিয়া ডাকিয়া খুন হইতেছে—দুয়োর খুলুন—দুয়োর খুলুন—

তখনও ঘুমের ঘোর কাটে নাই। তাহার সর্বদেহ শিহরিয়া উঠিল। ঝটিকামথিত দুর্যোগ-আঁধার বর্ষা-নিশীথ। নির্জন সুখসুপ্ত গ্রামের একপাশে, দিগন্তবিসারী বিলের প্রান্তে রামোত্তম রায়ের বাহির-বাড়ির রোয়াকে দাঁড়াইয়া কে অমন আর্তকণ্ঠে বারংবার দরজা খুলিয়া দিতে বলে!

শিকলের ঝনঝনানি অতিশয় বাড়িয়া উঠিল। নিশ্চয় মানুষ। পশুপতি উঠিয়া খিল খুলিয়া দিতেই কবাট দুইখানি দড়াম করিয়া দেয়ালে লাগিল এবং ঝড়ের বেগেই যেন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল একটি পুরুষ, পিছনে এক নারী।

মেয়েটির হাতের চুড়ি ঝিনমিন করিয়া ঈষৎ বাজিয়া উঠিল এবং কাপড়-চোপড় হইতে অতি কোমল মৃদু সুগন্ধ আসিয়া পশুপতি মাস্টারের ঘর ভরিয়া গেল।

পুরুষ লোকটি আগাইয়া আসিতে গিয়া তক্তাপোশে ঘা খাইল। পশুপতি কহিল—দাঁড়ান, আলো জ্বালি।

হেরিকেন জ্বালিয়া দেখে, স্বাস্থ্য ও যৌবন-লাবণ্যে দুজনেই ঝলমল করিতেছে। মেয়েটি ঘরের মধ্যে আসে নাই, চৌকাঠের ওধারে ছাদের নলের নিচে দাঁড়াইয়া পরম শান্তভাবে ভিজিতেছিল, মুখভরা হাসি। দেখিয়া যুবক ব্যস্ত হইয়া কহিল—অ্যাঁ—ও কি হচ্ছে লীলা, এ কি পাগলামি তোমার? ইচ্ছে করে ভিজছ দুপুর রাত্রে?

সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া বধূ মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

যুবক আরও চটিয়া কহিল—বড্ড স্ফূর্তি—না? এই সেদিন অসুখ থেকে উঠলে, আমি যত মানা করি তুমি মজা পেয়ে যাও যেন।

আঙুল তুলিয়া লীলা চুপি-চুপি তর্জন করিয়া কহিল—বাবারে বাবা, তোমার শাসনের জ্বালায় যাই কোথায়? সেই তো কাপড় ছাড়তে হবে, তা একটুখানি নেয়ে নিলাম—বলিয়া আঁচল তুলিয়া মুখে দিল,. বোধকরি তাহার হাসি পশুপতি দেখিতে না পায় সেইজন্য।

যাক গে—আর একটা কথাও বলব না, মরে গেলেও না—বলিয়া যুবক গুম হইয়া রহিল। পরক্ষণে বাহিরে মুখ বাড়াইয়া ডাকিল—তুই কতক্ষণ ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করে ভিজবি, এখানে এনে রাখ্।

উহাদের চাকর এতক্ষণ বাক্স মাথায় দিয়া রোয়াকের কোণে দাঁড়াইয়া ছিল, ঘরের মধ্যে আসিয়া বাক্স নামাইয়া দিল।

যুবক কহিল—যদি ইচ্ছে হয় তবে দয়া করে বাক্সটা খুলে শিগগির ভিজে কাপড়চোপড়গুলো বদলানো হোক, আর ইচ্ছে যদি না হয় তবে এক্ষুনি ফিরে মোটরে যাওয়া যাক। আমি আর কাউকে কিছু বলছি নে।

মেয়েটির হাসিমুখ আঁধার হইল, হেঁট হইয়া বাক্স খুলিতে লাগিল।

কাণ্ড দেখিয়া পশুপতি একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ এত রাত্রে এই তরুণ-দম্পতি কোথা হইতে আসিল এবং আসিয়া নিঃসঙ্কোচে পশুপতির ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই অমনি রাগারাগি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এতক্ষণ ইহাদের মধ্যে কথা বলিবার ফাঁকই পাইতেছিল না, এইবার বলিল—আপনারা তবে কাপড় ছাড়ুন, আমি লোকটাকে নিয়ে কাছারিঘরে বসি গে।

যুবক যেন এইমাত্র পশুপতিকে দেখিতে পাইল। কহিল—কাপড়টা ছেড়ে আমিও যাচ্ছি। বড্ড কষ্ট দিলাম আপনাকে।...আমি এ বাড়িতে আরও অনেকবার এসেছি, রামোত্তমবাবু আমার পিসেমশাই হন। আপনাকে এর আগে দেখি নি। একটু আলাপ-টালাপ করব—তা মশায়, কাণ্ডটা দেখলেন তো? সেদিন অসুখ থেকে উঠেছে, কচি খুকি নয়—একটু যদি বুদ্ধি-জ্ঞান থাকে! একেবারে আস্ত পাগল।

লীলা মুখ রাঙা করিয়া একবার স্বামীর দিকে তাকাইল। তারপর রাগ করিয়া খুব জোরে জোরে ট্রাঙ্ক হইতে কাপড়চোপড় নামাইয়া ছড়াইয়া মেজেয় রাখিতে লাগিল। কাপড়ের সঙ্গে আতরের শিশি ঠিক করিয়া পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল।

পশুপতি ও চাকরটি ততক্ষণ কাছারিঘরে গিয়া বসিয়াছে।

যুবক কহিল—গেছে তো? তক্ষুনি জানি। আস্ত শিশিটা—এক ফোঁটাও খরচ হয় নি।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে লীলা কহিল—আর বোকো না; তোমার আতর আমি কিনে দেব কালই। তারপর কথা যেন কান্নায় ভিজিয়া আসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—অজানা জায়গায় এসে লোকজনের সামনে কেবল বকাবকি—

কেন? কিসের এত? আমি বিষ্টি লাগাব, খুব করব, অসুখ করে যাই মরে যাব—তোমার কি?

পাশাপাশি দুটি ঘর। কলহের প্রতি কথাটি পশুপতির কানে যাইতেছিল।

স্বামী উত্তর করিল—আমার আর কি—আমি তো কারও কেউ নই। ঘাট হয়েছে—আর কোনোদিন কিছু বলব না।

কিছুক্ষণ আর কথাবার্তা নাই। খুটখাট আওয়াজ, বাক্সর ভিতরের জিনিসপত্র নাড়াচাড়া হইতেছে।

লীলা বলিতে লাগিল—মোটরের হুড উড়িয়ে যে ভিজিয়ে দিয়ে গেল তাতে কিছু দোষ হয় না, আর আমি একটুখানি বাইরে দাঁড়িয়েছি অমনি কত কথা—আস্ত পাগল—হেনোতেনো—কেন, কি জন্যে বলবে?

অন্য পক্ষের সাড়া নাই।

পুনরায় বধূর কণ্ঠস্বর—ভিজতে আমার বড্ড আরাম লাগে। ছেলেবেলা এই নিয়ে মার কাছে কত বকুনি খেয়েছি। তা বকবে যদি তুমি আমায় আড়ালে বকলে না কেন? অজানা অচেনা কোথাকার কে-একজন তার সামনে···ওগো, তুমি কথা বলবে না আমার সঙ্গে?

স্বামী বলিল—না, বলব না তো। কেউ মরলে আমার কিছু আসে যায় না যখন—বেশ তো—আমি যখন পর।—

বধূ কহিল—কতদিন তো সাবধান হয়ে আছি। ছড়ছড় করে জল পড়ছে দেখে আজকে হঠাৎ কেমন ইচ্ছে হল। আমি আর করব না—কোনোদিনও না। ওগো, তুমি আমায় মাপ করো—সত্যি করব না।

স্বামীর কণ্ঠ অভিমানে কাঁপিতে লাগিল, বলিল—কথায় কথায় তুমি মরতে চাও—কেন? কি জন্য? আমি কি করেছি তোমার?

বধূ কহিল—না, মরব না।

—দিব্যি করো গা ছুঁয়ে যে কক্ষনো না—কোনোদিনও না—

স্বামীকে খুশি করিতে বধূ দিব্য করিল, সে কোনোদিন মরিবে না।

আরও খানিকক্ষণ পরে যুবক কাছারিঘরে ঢুকিল। পশুপতি কহিল—হয়ে গেছে? এবার চলুন বাড়ির মধ্যে, আমি আলো দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

যুবক কহিল—আজ্ঞে না। এক্ষুনি চলে যাব। সকালে পিসেমশাইকে বলবেন, জাগুলগাছির সুরেশ এসেছিল। থাকলাম না বলে চটে যাবেন—

পশুপতি কহিল—তবে আর কি। আত্মীয়ের বাড়ি এসে পড়েছেন যখন দয়া করে—

সুরেশ বলিল—দয়া করে নয় মশায়, দায়ে পড়ে। ফাল্গুন মাসে ওর টাইফয়েড হয়, একত্রিশ দিন যমে-মানুষে টানাটানি করে কোনো গতিকে প্রাণটুকু নিয়ে চেঞ্জে পালিয়েছিলাম। সেই গেছলাম আর আজ এই ফিরছি। স্টেশনে নেমে বিষ্টি-বাদলা দেখে বললাম—কাজ নেই লীলা, রাতটুকু ওয়েটিং-রুমে কাটানো যাক। তা একেবারে নাছোড়বান্দা—বলে, মোটরে হুড দেওয়া রয়েছে—এক ফোঁটা জল গায়ে লাগবে না, ঝড়-বাতাসের মধ্যে ছুটতে খুব আমোদ লাগে। শুনেছেন কখনও মশায়, ভূ-ভারতে এমন ধারা? এদেশের ট্যাক্সি—ফাঁকা মাঠের মধ্যে এসে বাতাসে হুড গেল উলটে। ভিজে একেবারে জবজবে। এখানে উঠতে কি চায়? ভিজে কাপড় বদলাতে একরকম জেদ করে নিয়ে এলাম।

পশুপতি কহিল—বেশ তো, ওঁদের সঙ্গে দেখা-টেখা করে অন্তত রাতটুকু কাটিয়ে কাল সক্কালেই চলে যাবেন।

সুরেশ বলিল—বলছেন কাকে? ওদিকে একেবারে তৈরি। এরই মধ্যে দু-দুবার দরজার উপর ঠকঠক হয়ে গেছে—শোনেন নি? বিষ্টি বোধ হয় ধরে গেল এইবার। আচ্ছা নমস্কার! খুব বিব্রত করে গেলাম—

তরুণ-তরুণী পাশাপাশি গুঞ্জন করিতে করিতে এবং তাহাদের পিছনে চাকরটি ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করিয়া রাস্তার উপরের মোটরে গিয়া উঠিল।

তারপরে সেই রাত্রে অনেকক্ষণ অবধি পশুপতি মাস্টার আর ঘুমাইতে পারিল না। ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, তারা উঠিয়াছে, আকাশ পরিষ্কার রমণীয়। শিশি ভাঙিয়া ঘরময় আতর ছড়াইয়া গিয়াছিল, তাহার উগ্র মধুর মাদক সুবাসে পশুপতির মাথার মধ্যে রিমঝিম করিয়া বাজনা বাজিতে লাগিল। এই ঘর তৈয়ারি হইবার পর বরাবর চুনসুরকি পড়িয়া ছিল, এই প্রথম আতর পড়িয়াছে এবং বোধকরি দুর্যোগের রাত্রে বিপন্ন তরুণ-দম্পতি কয়েক মুহূর্তের জন্য আসিয়া আতরের সহিত তাহাদের কলহের গুঞ্জন রাখিয়া গিয়াছে।

হেরিকেনটা তুলিয়া লইয়া পশুপতি প্রভাসিনীর চিঠিখানি গভীর মনো-যোগের সহিত আর-একবার পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে সমস্ত অন্তর

করুণায় ভরিয়া উঠিল। একটা সোহাগের কথা নাই, অথচ সমস্ত চিঠি ভরিয়া সংসারের প্রতি ও তাহাদের সন্তানের প্রতি কতখানি মমতা ছড়ানো রহিয়াছে! কোনোদিন সে এসব ভাবিয়া দেখে নাই।

জানালা খুলিয়া দিয়া অনেকক্ষণ একাগ্রে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ভাবিতে ভাবিতে পশুপতির মন চলিয়া গেল আবার সেই বহুদূরবর্তী পশর নদীর পারে তাহার নিজের বাড়িতে···এবং সেখান হইতে চলিয়া গেল আরও দূরে, প্রায় বিশ বছরের ওপারে বিস্মৃতের দেশে—যেদিন প্রভাসিনীকে বিবাহ করিয়া গ্রামে ঢুকিয়া সর্বপ্রথমে ঠাকরুনতলায় জোড়ে প্রণাম করিয়াছিল ···তারপর কত নির্জন নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের মধুর স্মৃতি—ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যাকালে চুরি করিয়া চোখোচোখি—সুপ্তিমগ্ন জ্যোৎস্নারাত্রি জাগিয়া জাগিয়া কাটানো—ভোর হইলে বউকে তুলিয়া দিয়া নিজে আবার পাশ ফিরিয়া শোওয়া··

এখন আর সে-সব কথা কিছু মনে পড়ে না, পৃথিবীতে কিন্তু তেমনি দুপুর সন্ধ্যা ও রাত্রি আসিয়া থাকে; পৃথিবীর লোক গান গায়, কবিতা পড়ে, প্রেয়সীর কানে ভালোবাসার কথা গুঞ্জন করে, আকাশে নক্ষত্র অচঞ্চল দীপ্তিতে ফুটিয়া থাকে, তারার আলোকে নারিকেল-পাতা ঝিলমিল করিয়া দোলে। পশুপতি সে সময় সংসারের অনটনের কথা ভাবে, জ্যামিতির আঁক কষে, নয় তো ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে জানলা আঁটিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

অকস্মাৎ তাহার বোধ হইল, চিত্রাঙ্গদার ভুলিয়া-যাওয়া লাইনগুলি তাহার যেন মনে পড়িতেছে। ছেলেমানুষের মতো মাথা দোলাইয়া দোলাইয়া সে গুনগুন করিতে লাগিল। এখনও ঠিক মনে পড়ে নাই···মনে হইল, এমনি করিয়া রাত্রি জাগিয়া আরো বহুক্ষণ অবধি যদি সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে পারে, সমস্ত কবিতাগুলি তাহার মনে পড়িয়া যাইবে।

তারপর হঠাৎ একটি অদ্ভুত রকমের বিশ্বাস তাহার মনে চাপিয়া বসিল। বহুকাল আগে একদিন স্টেশনে যে-মেয়েটির হাতে সচিত্র চিত্রাঙ্গদা তুলিয়া দিয়াছিল, সে-ই আজ আসিয়াছিল—এই বধূটি···লীলা, এই যেন সেই মুখ। ইহা যে কত অসম্ভব, সেই মেয়ে বাঁচিয়া থাকিলে এতদিনে নিশ্চিত তার যৌবন পার হইয়া গিয়াছে, এসব কথা পশুপতি একবারও ভাবিতে পারিল না। বারংবার তাহার মনে হইতে লাগিল, ট্রাঙ্কে এই বধূটির কাপড়চোপড় ছিল, সকলের নিচে ছিল সেই চিত্রাঙ্গদা—পাঁচ টাকা দামের। লীলা আতরের শিশি ভাঙিয়াছে, কে জানে হয়তো চিত্রাঙ্গদাও এই ঘরের মেজেয় ফেলিয়া

গিয়াছে। খুঁজিয়া দেখিলে এখনই পাওয়া যাইবে—কিংবা থাকগে এখন খোঁজাখুঁজি, কাল সকালে…

পরদিন পশুপতির ঘুম ভাঙিতে বেলা হইয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখে ইতিমধ্যে ননী আসিয়াছে। বেঞ্চের উপর বসিয়া চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া সে ফাস্ট´বুকের পড়া তৈয়ারি করিতেছে—

> One night when the wind was high a small
> bird flew into my room…
> একদিন রাত্রিবেলা যখন বাতাস প্রবল হইয়াছিল, একটি ছোট
> পাখি আমার ঘরের মধ্যে উড়িয়া আসিয়াছিল…

শুনিতে শুনিতে পশুপতি আবার চোখ বুজিল। ঘরের মধ্যে উড়িয়া-আসা ছোট্ট একটি পাখির কল্পনা করিতে লাগিল। হঠাৎ মনে হইল, রোদ উঠিয়া গিয়াছে, পাখির ভাবনা ভাবিবার সময় আর নাই। এখনই হয়তো রামোত্তম ছেলের পড়ার তদারক করিতে আসিবেন। উঠিয়া বসিয়া হুঙ্কার দিল—বানান করে করে পড়—

রাত্রির রোমান্স

বধূ ডাকিল—ঘুমুচ্ছ ?

মনোময় পাশ ফিরিয়া শুইল এবং বলিল—উঁহু—

বধূ কহিল—বালিশ কোথায় ? অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না তো ! হ্যাঁগো, আমার বালিশ কোথায় লুকিয়ে রাখলে ? না—এই যে পেয়েছি। বলিয়া আন্দাজি বালিশ খুঁজিয়া লইয়া তাহার উপর শুইয়া পড়িল।

মনোময় বলিয়া উঠিল, আঃ ঘাড়ের উপর শুলে কেন ? সরে গিয়ে জায়গায় শোও—

বধূ বলিল—সর্বনাশ ! গায়ের উপর শুয়েছি নাকি ? পিদ্দিমটা নিভে গেল, অন্ধকারে কিছু বুঝতে পারি নি। ভাগ্যিস কথা কইলে—

কিন্তু কথা যদি মোটে না-ই কহিত, তা হইলেও মনোময়ের অস্থিসার দেহটাকে তুলার বালিশ বলিয়া ভুল করা কাহারও উচিত নয়।

এবার শুইয়া পড়িয়া বধূ চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু কতক্ষণ! একা-একাই কথা চলিতে লাগিল।

—উঃ কী গরম! বৃষ্টি-বাদলার নাম-গন্ধ নেই, গরমে সিদ্ধ করে মারছে। তার উপর দু-দুটো উনুনে যেন রাবণের চিতে! সেই বেলা থাকতে রান্নাঘরে ঢুকেছি আর এখন বেরিয়ে আসা। ঘরে একটা জানলাও নেই···ওগো ও কর্তা,—ও ছোটবাবু, তোমরা রান্নাঘরে একটা জানালা করে দাও না কেন? এইবার করে দাও—বুঝলে?

তবু ছোটবাবু সাড়া দিল না। বোধকরি সে জানালা করিয়া দিবেই, তাই কথা কহিল না।

বধূর মুখের কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কয়টা মশা ভনভন করিয়া উঠিল। তবু যা হোক কথার দোসর জুটিল, ঐ মানুষটিকে আর ডাকিয়া ডাকিয়া খুন হইবার দরকার নাই। মশার সঙ্গেই আলাপ শুরু হইল।

—দাঁড়া, কাল তোদের জব্দ করছি। সন্ধ্যাবেলা নারকেলের খোসায় আগুন করে আচ্ছা করে ধুনো দেব, দেখি ঘরে থাকিস কি করে?

খানিক জোরে জোরে পাখা করিতে লাগিল।

তারপর মনোময়ের গায়ে নাড়া দিয়া বলিল—ঘুমুচ্ছ কি করে? মশায় কামড়ায় না? সরে এসো একটু, মশারি ফেলি—

এখানে বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে ঘুম সম্বন্ধে মনোময়ের বিশেষপ্রকার নিপুণতা আছে। মশা ক্ষুদ্র প্রাণী, কামড়াইয়া কি করিবে? ঘুম যদি সত্য-সত্যই আসিয়া থাকে, সুন্দরবনের বাঘে কামড়াইলেও ভাঙিবে না।

বধূ মশারি ফেলিল। মনোময়ের পাশটা গুঁজিয়া দিবার জন্য গায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। খাটের একেবারে কিনারা ঘেঁসিয়া শুইয়াছে মনোময়। বধূ তাহার হাতখানা সরাইয়া দিল, যেখানে সরাইয়া রাখিল, সেইখানেই এলাইয়া রহিল। পুনরায় তুলিয়া লইয়া সেই হাতখানা নিজের হাতের উপর রাখিল। তারপর মনোময়ের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—ঘুমুলে নাকি? ওগো শুনছ? এরি মধ্যে ঘুম!

মনোময় নড়িয়া চড়িয়া পাশবালিশটা টানিয়া লইয়া বলিল—ঘুম কোথায় দেখলে? বলো কি বলবে।

বধূ বলিল—এসো খানিক গল্প করি, এত সকাল-সকাল ঘুমোয় না—

মনোময় কহিল—করো।

—কালকে আমি গল্প বলেছি, আজ তোমার পালা। সেই রকম কথা ছিল না?

—হুঁ—

—তবে?

মনোময় বলিল—তা হোক, আজও তুমি বলো উষা। কালকের শেষটা শোনা হয় নি—ঘুম এসেছিল।

বধূর নাম উষা। বলিল—আজও তেমনি ঘুমুবে তো?

মনোময় কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল—কক্ষনো না—

উষা কহিল—কিন্তু এখনি তো ঘুমুতে আরম্ভ করেছ, ঐ যে দেখছি—

মনোময় বলিল—দেখতে পাচ্ছ? অন্ধকারে তোমার চোখ জ্বলে বুঝি—

উষা বলিল—জ্বলেই তো। সাত রাজার ধন মানিকের গল্প শোন নি—অজগর সাপ সেই মানিক মাথা থেকে নামিয়ে গোবরে লুকিয়ে রাখল, গোবর ফুঁড়েও তার আলো বেরোয়। তেমনি একজোড়া মানিক হচ্ছে আমার এই চোখ দুটো। চিনলে না তো!

মনোময় বলিল—কিন্তু মানিক ছাড়াও মেনি-বেড়ালের চোখ অন্ধকারে জ্বলে, বিজ্ঞান-পাঠ পড়ে দেখো।

—কিন্তু এবার তো আর চোখে দিয়ে দেখা নয় মশায়, হাত দিয়ে ছোঁওয়া। অন্ধকারের মধ্যে উষা মনোময়ের চোখের উপর হাত বুলাইয়া দেখিল, উহা যথানিয়মে মুদ্রিত হইয়া আছে।

ভারি রাগিয়া গেল।

—বেশ, ঘুমোও—খুব করে ঘুমাও—আমি জ্বালাতন করব না। বলিয়া সরিয়া গিয়া উলটাদিকে মুখ করিয়া শুইল।

মনোময়ও সরিয়া আসিল, আসিয়া তাহার একখানা হাত ধরিল। বলিল—ফিরে শোও, অত রাগ করে না—এদিকে একবার ফিরেই দেখো, ঘুমিয়েছি কি না। ফিরবে না? আহা যদি কথা না বলো মাথা নাড়তে কি বাধা?

অপর পক্ষ নির্বিকার। যেন ঘুম পাইয়াছে, তেমনি গভীর নিশ্বাস পড়িতেছে। মনোময় বলিল—ঘুমুলে নাকি? ও উষা, ঘুমিয়ে পড়েছ?

তারও পরীক্ষা আছে। সত্যিসত্যি যদি ঘুমিয়ে থাক 'হ্যাঁ'—বলে জবাব দাও।

এবার উষা কথা কহিল।

—খুব যা তা বুঝিয়ে যাচ্ছ!

মনোময় হাসিতে হাসিতে বলিল—কি?

—এই যে বললে, ঘুম এসে থাকলে আমি 'হ্যাঁ'—বলে উত্তর দেব। ঘুম এলে বুঝি জ্ঞান থাকে! ভাব, আমি বুঝি নে কিছু—আমি বোকা।

মনোময়ের দুর্গ্রহ। বলিয়া বসিল—বোকা নও তো কি! আমি বরাবর জেগেই আছি—তুমি চোখে হাত দিয়ে বললে, আমার চোখ বোজা। খোলা চোখে হাত দিলে বুজে যায় না কার? নিজের চোখে হাত দিয়ে দেখো না। আর, এই নিয়ে তুমি মিছামিছি রাগারাগি করলে—

উষাকে বোকা বলিলে খেপিয়া যায়। বলিল—আমি বোকা আছি, বেশ আছি—তোমার কি? বলিয়া জানালার ধারে একেবারে খাটের শেষপ্রান্তে চলিয়া গেল এবং তাহার ও মনোময়ের মধ্যেকার ফাঁকটুকুতে দুমদুম করিয়া দুইটা পাশবালিশ ফেলিয়া দিল।

মনোময় হতাশভাবে বলিল তা বেশ! মাঝে একেবারে ডবল পাঁচিল তুলে দিলে···

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—বেশ, আমার দোষ নেই—এবার নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাক।

যা বলিল তাই। হাই তুলিয়া সত্য-সত্যই পাশ ফিরিয়া শুইল।

তা হোক! উষাও পড়িয়া থাকিতে জানে। দুইজনে চুপচাপ। যদি কেহ দেখিতে পাইত, ঠিক ভাবিত উহারা নিঃসাড়ে ঘুমাইতেছে।

খানিক পরে উষা উসখুস করিতে লাগিল। এমনও হইতে পারে, মনোময় সুযোগ পাইয়া এই ফাঁকে সত্য সত্যই খানিকটা ঘুমাইয়া লইতেছে। ইহার পরীক্ষা করিতে কিন্তু বেশি বেগ পাইতে হয় না, গায়ে একটু সুড়সুড়ি দিলেই বোঝা যায়। ঘুম যদি ছলনা হয় মনোময় ঠিক লাফাইয়া উঠিবে, চুপ করিয়া কখনও সুড়সুড়ি হজম করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি সে না ঘুমাইয়া জাগিয়াই থাকে, এবং উষা গায়ে হাত দিবামাত্রই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠে! না—রাগ করিয়া শেষকালে অতখানি অপদস্থ হওয়া উচিত হইবে না।

ও-ঘরে বড় জায়ের ছেলে জাগিয়া উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। শেষে তিনি দালানে আসিয়া ডাকিলেন—ছোট বউ, অ ছোট বউ, ঘুমুলি নাকি?

বার দুই ডাকাডাকির পর উষা উঠিয়া গিয়া ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল—কি?

—তোর ঘরে স্পিরিটের বোতলটা আছে, বের করে দে—খোকার দুধ গরম করব।

বোতল বাহির করিয়া দিয়া তোশকের তলা হইতে দেশলাই লইয়া উষা প্রদীপ জ্বালিল। মধ্যেকার পাশবালিশের প্রাচীর তেমনি অটল হইয়া আছে। উষা যখন উঠিয়া গিয়াছিল, অন্তত সেই অবকাশে বালিশ দুইটির অন্তর্ধান হওয়া উচিত ছিল। কাণ্ডখানা কি?

দীপ ধরিয়া মনোময়ের মুখের দিকে তাকাইতেই বুঝিতে পারিল, সে দিব্য অঘোরে ঘুমাইতেছে—ঘুম যে অকৃত্রিম, তাহাতে সন্দেহ নাই। দাম্পত্য জীবনের উপর উষার ধিক্কার জন্মিয়া গেল। পুরুষমানুষের কেবল চিঠিতে চিঠিতেই ভালোবাসা। ভালোবাসা, না—ছাই! গরমের ছুটিতে ক-দিনের জন্য বাড়ি আসা হইয়াছে, একেবারে রাজ্যের ঘুম সঙ্গে করিয়া লইয়া। আজ যখন কাজকর্ম মিটাইয়া নিজেরা খাইয়া বাসনকোশন ও পিঁড়ি তুলিয়া এঘরে চলিয়া আসিতেছে—এমন সময় টুপটুপ করিয়া রান্নাঘরের পিছনে সিঁদুরে গাছের তলায় ক-টা আম পড়িল। সেজ জা প্রস্তাব করিলেন—চল না ছোট বউ, আম ক-টা কুড়িয়ে আনি। উষা বলিল—এখন থাকগে, সকালে কুড়োলেই হবে। সেজ জা বলিলেন—সকালে কি আর থাকবে? রাত থাকতেই পাড়ার মেয়েগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। তখন বড় জা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—না—না সেজবউ, ও ঘরে যাক। আর একজনের ওদিকে ঘুম হচ্ছে না, তা বোঝ? চলো, তুমি আর আমি কুড়োইগে। আজ তোরও খুব ঘুম ধরেছে, না রে উষা? উষায় লজ্জা করিতে লাগিল। জোর করিয়া বলিল—না, আমিও কুড়োতে যাব—এবং খুব উৎসাহের সহিত আম কুড়াইয়া বেড়াইয়াছিল। তখনই কিন্তু ছাঁত করিয়া মনে উঠিয়াছিল—জাগিয়া আছে তো?···

এবারে মনোময়ের ট্রাঙ্ক হইতে উষা কখানা উপন্যাস আবিষ্কার করিয়াছে। আজ রান্নাঘরে ভাত চড়াইয়া দিয়া তাহার একখানা লইয়া বসিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ গোবর্ধন পালিত মহাশয়ের রচিত 'অদৃষ্টের পরিহাস'। বইখানা

শেষ করিতে পারে নাই, ফেন উথলাইয়া উঠিল—অমনি সে পাতা মুড়িয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এখন এমন করিয়া শুইয়া কি করা যায়, ঘুম যে আসে না! কুলুঙ্গি হইতে বইখানা টানিয়া লইল।

খাসা লিখিয়াছে, পড়িতে পড়িতে উষা অবিলম্বে মগ্ন হইয়া গেল।

উপন্যাসের নায়িকার নাম অধীরা। সম্প্রতি তাহার সঙ্গীন অবস্থা। নায়ক প্রণয়কুমারকে দস্যু ভৈরব সর্দার ইতিপূর্বে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। অধীরা অনেক কৌশলে তাহার সন্ধান পাইয়া স্বয়ং দস্যুগৃহে গিয়াছিল, এখন রাত্রিবেলা ফিরিয়া আসিতেছে।

বর্ণনাটা এইপ্রকার—

> একে অমাবস্যার রাত্রি, তায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সূচীভেদ্য অন্ধকার, কেবল মধ্যে মধ্যে খদ্যোৎকুল ঈষৎ জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতেছে। এই অন্ধকার-মগ্ন নিস্তব্ধ নিশীথে অরণ্য-সমাকীর্ণ পথপ্রান্তে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে কে? পাঠক-পাঠিকাগণ নিশ্চয়ই চিনিতে পারিয়াছেন, ইনি আমাদের সেই জমিদার-দুহিতা ষোড়শী সুন্দরী অধীরা। কণ্টকে পদযুগল রক্তাক্ত হইতেছে, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন সময় পশ্চাতে পদধ্বনি শ্রুত হইল। নিশ্চয়ই ভৈরব সর্দারের অনুচর অনুসরণ করিতেছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া অধীরা আরও দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। পশ্চাতের পদধ্বনি ক্রমশ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। অধীরা অধিকতর বেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দুর্দৈববশত একটি বৃক্ষকাণ্ডে বাধিয়া পদস্খলন হইল। অনুসরণকারী তৎক্ষণাৎ বজ্রমুষ্টিতে তাহার হস্তধারণ করিল। অধীরা নানাপ্রকারে অঙ্গসঞ্চালন করিয়া দস্যুহস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা পাইতে লাগিল। এই সময়ে চকিতে বিদ্যুৎস্ফুরণ হইল। দামিনীর তীব্র আলোকে দেখিতে পাইল অনুসরণকারী আর কেহ নহে, স্বয়ং প্রণয়কুমার। প্রণয়কুমার প্রশ্ন করিল—পাপীয়সী, এই গভীর রাত্রে নিবিড় অরণ্য মধ্যে কোথায় চলিয়াছিস? আমি তোকে ভালবাসিয়া পরম বিশ্বাসে বক্ষে ধারণ করিয়াছি, সেই বিশ্বাসের এই প্রতিদান?—প্রণয়কুমার আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ মেঘগর্জন দিঙমণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া তাহার কণ্ঠস্বর বিলুপ্ত করিয়া দিল এবং প্রলয়বেগে বাত্যা ও ধারাবর্ষণ আরম্ভ হইল।

ঐ যে বাত্যা ও ধারাবর্ষণ শুরু হইল, ইহার পর পাতা তিনেক ধরিয়া আর তাহার বিরাম নাই। বর্ণনাগুলি বাদ দিয়া উষা পরের পরিচ্ছেদে আসিল। সেখানেও বৃহৎ ব্যাপার। প্রণয়কুমার একাকী পঞ্চাশজন আততায়ীকে কিরূপ বিক্রম-সহকারে ধরাশায়ী করিয়া দস্যুগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার

রোমাঞ্চকর বিবরণ। কিন্তু উষার তাহাতে মন বসিল না। ষোড়শী সুন্দরী অধীরা নায়ককে খুঁজিতে গিয়া যে উলটা উৎপত্তি ঘটাইয়া বসিল, সে কোথায় গেল? প্রণয়কুমারের বিক্রমের বৃত্তান্ত পরে অবগত হইলেও চলিবে, উষা তাড়াতাড়ি একেবারে উপসংহারের পাতা খুলিল।

উপসংহারে আসিয়া অধীরার দেখা মিলিল, কিন্তু বেচারী তখন অন্তিম-শয্যায়। এমন সময়ে অতি আকস্মিক উপায়ে প্রণয়কুমার তথায় উপস্থিত হইল। স্থান সম্ভবত হিমালয় কিংবা বিন্ধ্যাচলের একটি নিভৃত গুহা, কারণ ইতিপূর্বে উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গের বর্ণনা হইয়া গিয়াছে।

উষা পড়িতে লাগিল—

> অধীরা বলিল—আসিয়াছ হৃদয়বল্লভ? আমি জানিতাম তুমি আসিবে। এই সংসারে ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। শেষ মুহূর্তে বলিয়া যাই, আমি অবিশ্বাসিনী নহি। ভৈরব সর্দারের গৃহে যে ছদ্মবেশী নবীন দস্যু তোমার শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া দিয়াছিল, সে এই দাসী ভিন্ন আর কেহ নহে। হায়, আমাকে চিনিতে পার নাই।
>
> প্রণয়কুমার বক্ষে করাঘাত করিয়া কহিল—আমি কি দুরাত্মা! তোমার ন্যায় নিষ্পাপ সরলাকে তুষানলে দগ্ধ করিয়া হত্যা করিলাম। আমারই দুষ্কৃতিতে অদ্য একটি অম্লান অনাঘ্রাত কুসুম কাল-কবলিত হইতে চলিয়াছে। এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে?
>
> অধীরা গদগদ কণ্ঠে কহিল—তোমার কোন দোষ নাই, সমস্তই অদৃষ্টের পরিহাস। আমার জন্য তুমি কত যন্ত্রণা সহিয়াছ। যাহা হউক এই পৃথিবী হইতে অভাগিনীর অদ্য চিরবিদায়। আবার জন্মান্তরে দেখা হইবে! যাই প্রাণেশ্বর।
>
> এই বলিয়া অধীরা ঝঞ্ঝাতাড়িত লতিকার ন্যায় প্রণয়কুমারের পদতলে পতিত হইল।

বই শেষ হইয়া গেল, তবু উষার ঘুম আর আসে না। ঐ বইয়ের কথাই ভাবিতে লাগিল। এ সংসারে পুণ্যের জয় পাপের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে আর ভুল নাই। অতবড় দাম্ভিক দুর্ধর্ষ প্রণয়কুমার—তাহাকেও শেষকালে অধীরার শোকে রীতিমতো বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া ভাসাইতে হইয়াছে। হাঁ—বই লিখিতে হয় তো লোকে যেন গোবর্ধন পালিত মহাশয়ের মতো করিয়া লেখে।

বিছানার ও-পাশে তাকাইয়া মনোময়ের জন্য অনুকম্পায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। আজ ভালো করিয়া কথা কহিলে না, মাঝের বালিশ দুইটা

ছুঁড়িয়া ফেলিয়া একটু টানাটানিও করিলে না, করিলে তোমার অপমান হইত—বেশ ঘুমাও, এমনিভাবে অবহেলা করিয়া নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাও—কিন্তু একদিন বুক চাপড়াইতে হইবে। উষার রাগ আরও ভয়ানক হইল, রাগের বশে কান্না পাইল। এমন করিয়া এক বিছানায় শুইয়া থাকা যায় না। উষা ভাবিতে লাগিল, এখনই একখানা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া দূরে—বহুদূরে একেবারে চিরদিনের মতো চলিয়া গেলে হয়, কাল সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া তখন প্রণয়কুমারের মতো হাহাকার করিতে হইবে।

আলো লইয়া টেবিলের ধারে গিয়া সে সত্যসত্যই চিঠি লিখিতে বসিল। কিন্তু ছত্র পাঁচেক লিখিয়া আর উৎসাহ পাইল না। কারণ, দূরে—বহুদূরে—চিরদিনের মতো যে-স্থানে চলিয়া যাইতে হইবে, তাহার ঠিকানা জানা নাই। বাইরে উঠানের পরপারে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় লিচুগাছটি ডালপালা মেলিয়া ঝাঁকড়া-চুল ডাইনী-বুড়ির মতো দাঁড়াইয়া আছে। আর যাহাই হউক এই রাত্রিতে দরজার খিল খুলিয়া উহার তলা দিয়া কোথাও যাওয়া যাইবে না, ইহা নিশ্চিত। অতএব চিরদিনের মতো দূরে—বহুদূরে যাইবার আপাতত তাড়াতাড়ি নাই। উষা পুনরায় বিছানায় শুইতে আসিল। আসিয়া দেখে, ইতিমধ্যে মনোময় জাগিয়া উঠিয়া মিটমিট করিয়া তাকাইয়া আছে। আলো নিবাইয়া গম্ভীরমুখে সে শুইয়া পড়িল।

হঠাৎ মনোময় ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিল—উষা, উষা—দেখেছ—লিচুগাছের ডালে কে যেন ধবধবে কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে, জানালা দিয়ে ঐ মগডালের দিকে তাকিয়ে দেখো না।

উষা বুঝিল, ইহা মিথ্যা কথা। সে বড় ভীতু বলিয়া মনোময় মিছামিছি ভয় দেখাইতেছে। তবু তাকাইয়া দেখিবার সাহস হইল না, সে চোখ বুজিল। কিন্তু চোখ বুজিয়া আরও মনে হইতে লাগিল, যেন সাদা কাপড় পরিয়া তাহার মেজ জা একেবারে চোখের সামনে ঘুরঘুর করিয়া বেড়াইতেছেন। এই বাড়িতে মেজ জা গিয়াছেন, চৈত্রে চৈত্রে এক বৎসর হইয়া গিয়াছে, লিচুতলা দিয়া তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া গিয়াছিল।

উষা এমন করিয়া আর চোখ বুজিয়া থাকা বড় সুবিধাজনক বোধ করিল না। একবার ভাবিল—তাকাইয়া সন্দেহটা মিটাইয়া লওয়া যাক, মিছা কথা তো নিশ্চয়ই—ভূত না হাতি। সাহস করিয়া সে চোখ খুলিল, কিন্তু তাকাইয়া দেখা বড় সহজ কথা নয়। ক্যাঁচক্যাঁচ কটকট করিয়া বাঁশবনের

আওয়াজ আসিতেছে, তাকাইতে গিয়া কি দেখিয়া বসিবে তাহার ঠিক কি? মনোময়ের উপর আরও রাগ হইতে লাগিল। এতক্ষণ ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া জ্বালাইল, এখন জাগিয়া উঠিয়াও এমনি করে!

উঠিয়া তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিতে গেল, অমনি মনোময় খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া বসিল।

—ও কি? কি হচ্ছে? এই গরমে জানালা বন্ধ করলে টিকব কি করে?

উষা বলিল—আমার শীত করছে—

মনোময় বলিল—বোশেখ মাসে শীত কি গো?

উষা বলিল—শীত করে না বুঝি! কখন থেকে একলা একলা খোলা হাওয়ায় পড়ে আছি।

উষার গলার স্বর ভারি-ভারি।

মনোময় বলিল—আচ্ছা, আমি জানালার দিকে শুই—তুমি এই দিকে, কেমন?

উষা কহিল—থাক, থাক—আর দরদে কাজ নেই।

দু-ফোঁটা চোখের জল গড়াইয়া আসিয়া মনোময়ের গায়ে পড়িল।

মনোময় শুনিল না—বালিশ দুটাকে এক পাশে ফেলিয়া জোর করিয়া ধরিয়া উষাকে ডানদিকে শোয়াইয়া দিল। উষা আর নড়িল না, শুইয়া রহিল। একেবারে চুপচাপ।

খানিকক্ষণ পরে মনোময় ডাকিল—ওগো!

উষা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মনোময় জিজ্ঞাসা করিল—হাসছ কেন?

উষা বলিল—ঘুমুচ্ছিলে যে বড়!

মনোময় কহিল—তুমি যে রাগ করেছিলে বড়! এমন ভয় দেখিয়ে দিলাম—

উষা বলিল—না, তুমি বড্ড খারাপ। অমন ভয় আর দেখিও না। আমি সত্যি সত্যি যেন দেখলাম, সাদা কাপড়-পরা মেজদিদির মতো কে একজন। এখনো বুক কাঁপছে। তুমি সরে এসো—বড্ড ভয় করে—

ভাব হইয়া গেল।

টং—

বড় জায়ের ঘরে ক্লক আছে, নিশুতি রাত্রে তাহার শব্দ আসিল।

মনোময় বলিল—ঐ একটা বাজল—আর বকে না, এবার ঘুমানো যাক।

উষা বলিল—একবার আওয়াজ হলেই বুঝি একটা বাজবে। উঃ, কী বুদ্ধি তোমার! বাজল এই মোটে সাড়ে ন-টা।

মনোময় বলিল—সাড়ে ন-টা বেজে গেছে সাড়ে তিন ঘণ্টা আগে।

উষা বলিল—না হয় সাড়ে দশটা, তার বেশি কক্ষনো নয়।

মনোময় বলিল—তারও বেশি! আচ্ছা, দেশলাই জ্বালো, আমার হাত-ঘড়িটা দেখা যাক।

উষা তবু তর্ক ছাড়িল না।

—তা বলে এর মধ্যে একটা বাজতেই পারে না—

মনোময় বলিল—আলোটা জ্বালো আগে—

—জ্বালি। তুমি বাজি রাখো, হেরে গেলে আমায় কি দেবে?

মনোময় বলিল—যা দেব তা এখনো দিতে পারি—মুখটা এদিকে সরাও—

উষা বলিল—যাও!

দেশলাই ধরাইয়া কুলুঙ্গির মধ্য হইতে হাত-ঘড়ি বাহির করিয়া দেখা গেল, কাহারও কথা সত্য নয়—একটা বাজে নাই, আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছে।

সর্বনাশ! উষা শঙ্কিত হইয়া পড়িল। আবার খুব সকালে সকলের আগে উঠিতে হইবে। না হইলে রাধারানী নামক এক খুদে ননদী আছে, সে উহাকে খেপাইয়া মারিবে।

বিছানাময় স্বচ্ছ জ্যোৎস্না। চাঁদ অনেক নামিয়া পড়িয়াছে। উষা হঠাৎ জাগিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। আগে বুঝিতে পারে নাই। শেষে দেখিল তখনও ভোর হয় নাই। ভালো হইয়াছে, সেজ জা ও রাধারানীকে ডাকিয়া তুলিয়া রাত থাকিতে থাকিতেই ননদ-ভাজে মিলিয়া বাসন মাজা গোবর-ঝাঁট দেওয়া ও আর আর সকল কাজ সারিয়া রাখিবে, শাশুড়ি সকালে উঠিয়া দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া যাইবেন।

খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়া আগের রাত্রির কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে উষার হাসি পাইল। বাপরে বাপ, মানুষটি এত ঘুমাইতে পারে, এখনো বেহুঁশ! আগে ভালো করিয়া দেখিয়া লইল, মনোময় সত্যসত্যই ঘুমাইয়াছে কি-না, তারপর চুপিচুপি তাহার পায়ের গোড়ায় প্রণাম করিল। এ কয়দিন

রোজ সকালেই সে প্রণাম করে, কারণ গুরুজন তো! রাত্রে ঘুমের ঘোরে কতবার হয়তো গায়ে পা লাগে। তবে মনোময়কে চুরি করিয়া কাজটা করিতে হয়, সে জানিতে পারিলে ঠাট্টায় ঠাট্টায় অস্থির করিয়া তুলিবে।

মনোময়ও একটু পরে জাগিল। তাকাইয়া দেখে, পাশে উষা নাই। আকাশে তখনো চাঁদ আছে। কি কাজে হয়তো বাহিরে গিয়াছে, ঘুমের ঘোরে এমনি একটা যা-তা ভাবিয়া সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে জাগিয়া উঠিয়াও পাশে উষাকে দেখিতে পাইল না। তাহাতে অবশ্য আশ্চর্য নাই, রোজ সকালেই উষা অনেক আগে উঠিয়া যায়। সেলফ হইতে দাঁতন লইতে গিয়া মনোময় দেখিল, টেবিলে প্যাডের উপর উষার হাতের লেখা চিঠি রহিয়াছে। রাত্রে বলিয়া বসিয়া কি লিখিতেছিল বটে!

উষা লিখিয়াছে—

> তোমার কোন দোষ নাই। তুমি আমার জন্য কতই যন্ত্রণা সহিয়াছ। তুমি কতই বিরক্ত হইয়াছ। এই পৃথিবী হইতে অভাগিনীর চিরবিদায়। জন্মান্তরে দেখা হইবে, যাই—

ইহার পর 'প্রাণেশ্বর' কথাটা লিখিয়া ভালো করিয়া কাটিয়া দিয়াছে। উষার পেটে পেটে যে এত তাহা মনোময় আগে জানিত না। এরূপ লিখিবার মানে কি?

যাহা হউক সে বাহিরে গেল। অন্যদিন উষা এই সময়ে রান্নাঘরের দাওয়া নিকায়। আজ সেখানে নাই। এবার একটু শঙ্কা হইল। মেয়েরা তো হামেশাই আত্মহত্যা করিয়া বসে, যখন তখন শুনিতে পাওয়া যায়। খিড়কির পুকুর বেশি দূরে নয়, জলও গভীর। কিন্তু কি কারণে উষা যে এত বড় সাংঘাতিক কাজ করিবে, তাহা বুঝিতে পারিল না। রাত্রে ঘুমের ঘোরে হয়তো সে কি বলিয়াছে! আনাচ-কানাচ সকল সন্দেহজনক স্থান দেখিয়া আসিল, উষা কোথাও নাই। এমন মুশকিল যে একথা হঠাৎ মুখ ফুটিয়া কাহাকে জানাইতে লজ্জা করে। পোড়ারমুখী রাধারানীটাও সকাল হইতে কোথায় বাহির হইয়াছে যে তাহাকে দুটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবে!

অবশেষে মনোময় বড় বউদিদির ঘরে ঢুকিল। সে-ঘর ইতিপূর্বেই একবার খুঁজিয়া দেখা হইয়াছে।

বড়বধূ বিছানা তুলিতেছিলেন, বোধকরি মনোময়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, হাসিয়া বলিলেন—হারানিধি মিলল না? না ভাই, আমি চোর নই। ঘর তো আমাদের অজান্তে একবার দেখে গিয়েছ, এইবার বিছানাপত্তর ঝেড়েঝুড়ে দেখাচ্ছি—এর মধ্যে সেরে রাখি নি।

মনোময় বলিল—ঠাট্টার কথা নয় বউদি, ছোট বউ কোথায় গেল বল দিকি? এই দেখো চিঠি—

বলিয়া চিঠিখানা দেখাইল।

চিঠি পড়িয়া বড়বধূ গম্ভীর হইয়া গেলেন। বলিলেন—কি হয়েছিল বলো তো—এ তো ভয়ের কথা!

মনোময় প্রতিধ্বনি করিল—সাংঘাতিক ভয়ের কথা।

—তোমার দাদাকে বলি তবে?

বিমর্ষ মুখে মনোময় কহিল—না বলে উপায় কি?

বড়বধূ বলিলেন—ভালো করে খুঁজে-টুজে দেখেছ তো?

—কোথাও বাকি রাখি নি, বউদি!

—গোয়ালঘর, সিঁদুরে আঁবতলা?

—হুঁ।

—চিলেকোঠা?

—হুঁ।

—তোমার নিজের ঘরে? সিন্দুকের তলায় কি বাক্সের পাশে? দুষ্টুমি করে লুকিয়ে-টুকিয়ে থাকতে পারে।

মনোময় বলিল—তা-ও দেখেছি, তন্নতন্ন করে দেখেছি।

বড়বধূ হতাশভাবে বলিলেন—তবে কি হবে? আচ্ছা, সিন্দুকের ভিতরে, বাক্সের ভিতরে?

বলিতে বলিতে হাসিয়া ফেলিলেন।

মনোময় মাথা নাড়িয়া বলিল—বউদি, ব্যাপার কিন্তু সহজ নয়—

বড়বধূ বলিলেন—নয়ই তো! আচ্ছা এসো তো আমার সঙ্গে, আমি একটু দেখি—

বলিয়া মনোময়কে সঙ্গে করিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ ঘরটা দেখেছ?

এত সকালে রান্নাবান্না নাই—এ ঘরে আসিবে কি করিতে?

কিন্তু ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল, থালার উপর লঙ্কা ও লবণ সহযোগে কাঁচা আম জারানো হইয়াছে। মুখোমুখি বসিয়া উষা ও রাধারানী নিঃশব্দে মনোযোগের সহিত আহার করিতেছে।

মনোময়কে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়া উষা হাত গুটাইয়া লইল।

রাধারানী হাসিয়া উঠিল।

প্রেতিনী

চণ্ডীদহের মুখে পড়িয়া ডিঙি টলমল করিতে লাগিল। একে তো গাঙে ভয়ানক টান, তার উপর উলটা বাতাস। মাঝির কলিকায় আগুন কেবলমাত্র ধরিয়া উঠিয়াছে। হরিচরণ বলিল—না, না—মাঝি, তামাক খাওয়া রেখে দুই হাতে বোঠে চালাও দিকি—এবং মাঝির সেই কলিকা নিজের দুই হাতে চেটোর মধ্যে রাখিয়া অভিনিবেশসহকারে টানিতে আরম্ভ করিল। হইলে কি হয়, শান্তিতে তামাক খাওয়া তাহারও কপালে নাই। ছইয়ের ভিতরে চুড়ির আওয়াজ। চুড়ি অবশ্য নানা কারণে বাজিতে পারে—নিচু ছই, উঠিতে বসিতে হাত লাগিয়া যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু একবার—দুইবার—তিনবার, কলিকা রাখিয়া উঠিতে হইল—

ভিতরে ঢুকিয়া দেখে একটা টিনের ট্রাঙ্ক, সেইটা দুই হাতে জোর করিয়া ধরিয়া তাহার উপর মাথা রাখিয়া প্রভা বসিয়া আছে। হরিচরণকে দেখিয়া একটু হাসিবার মতো ভাব করিল। কহিল—নৌকো কি রকম টলমল করছে দেখো না—আর তুমি বসে বসে বেশ তামাক খাচ্ছিলে—

হরিচরণ বলিল—ভয় হচ্ছে না-কি তোমার?

প্রভা বলিল—কিসের ভয়? না, আমার ভয়-টয় নেই মশায়।···ওঃ, সর্বনাশ! তুমি যে অত কাছে এসে বসলে—মাঝে মোটে পাঁচ-সাত হাত জায়গা। আর একটুখানি দূরে গিয়ে বসতে হয়। মাঝিরা দেখলে ভাববে কি?

এটা প্রভার মিথ্যা কথা। দুজনের মাঝে যে ফাঁকটুকু ছিল, তাহা পাঁচ-সাত হাত তো নয়, হাত দুয়েকও হইবে না। কিন্তু প্রভার কাঁচা বয়স, বিয়ে মোটে বছর দুই আগে হইয়াছে, যা বলে তাহাতে তর্ক করিতে নাই।

হরিচরণ সরিয়া একেবারে পাশে আসিল। অমনি প্রভা তাহার কোলের উপর চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল।

একটু পরে মাথা তুলিয়া বলিল—আচ্ছা, আজকে যদি এখানে নৌকো ডুবে যায়—

হরিচরণ রাগ করিয়া উঠিল—ও-সব কি কথা! গাঙের উপর ভর-সন্ধ্যে-বেলা অমন বলতে নেই।

প্রভা নিষেধ মানিল না।—ধরো যদি ডুবেই যায়, আমি তো মোটেই সাঁতার জানি নে—তুমি কি করো তা হলে?

—কি করি? দিব্যি হাসতে হাসতে গাঙ পাড়ি মেরে একলা ঘরে ফিরে যাই। তুমি কি ভাব বলো দেখি?

প্রভা বলিল—না, তা কক্ষনো যাও না। সত্যি—তুমি কি কর আমার শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে, বলো না।

—তোমাকে জড়িয়ে ধরে সাঁতার কাটি।

প্রভা তবু ছাড়ে না।

—আর কোনো গতিকে যদি তোমার হাত ফসকে যায়? আমি তো অমনি চণ্ডীদ'র অথই জলে তলিয়ে যাব, তা হলে কি করবে?

হরিচরণ বলিল—তোমার আর কথা নেই আজ?

প্রভা জেদ করিয়া বলিল—না, বলো কি কর তা হলে? বলবে না? আচ্ছা, থাকগে।

মুখ ভার হইয়া উঠিল।

—তা হলে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে আমিও অমনি ডুবে মরব। ঐ গাঙের তলায় ফের যুগল-মিলন হবে।

প্রভা ঘাড় নাড়িয়া কহিল—ইঃ, তা আর হতে হয় না! সাঁতার-জানা মানুষ সাঁতার না দিয়ে ইচ্ছে করে ডুবে মরতে পারে কখনো?

—বিশ্বাস কর না?

প্রভা বলিল—না।

—তোমায় ছেড়ে আমি সত্যি-সত্যি বেঁচে থাকব, এই তুমি ভাব?

প্রভা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—ভাবি না তো কি! বেঁচে থাকবে এবং পছন্দমতো তিন নম্বরের জন্য তক্ষুনি ঘটক লাগাবে। পুরুষমানুষের আবার ভালোবাসা!

হরিচরণ বলিল—বেশ, তবে তাই। তোমায় আমি ভালোবাসি নে, আদর করি নে, জ্বালাতন করি—এই তো? ভালো ভালো কাপড়-গয়না দিতে পারি নে, আমি গরিব মানুষ—আমার আবার ভালোবাসা! বেশ—বেশ!

বলিয়া সে অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া মনোযোগের সহিত স্বভাবের শোভা দেখিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। শেষে প্রভাই কথা কহিল—ওদিকে একনজরে চেয়ে কি দেখছ? ওগো, কি দেখছ বল না! গোরু? মাছরাঙা? জেলেদের বউ? কই, জবাব দিলে না যে!

হরিচরণ নিরুত্তর।

প্রভা উঠিয়া বসিল। তারপর খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিল—রাগের পুরুষ অত রেগো না—তুমি ভালোবাস, ভালোবাস—এক ঝুড়ি, দশ ঝুড়ি, দশ হাজার ঝুড়ি ভালোবাস। হল তো!

সহসা জোর করিয়া দুইহাতে হরিচরণের মুখ নিজের দিকে ফিরাইয়া বলিতে লাগিল—তুমি ওদিকে তাকাতে পাবে না, কক্ষনো না—এই বলে দিলাম। মাঝ-গাঙে আমার একা একা ভয় করে না বুঝি। কই, তাকাও আমার দিকে—কথা কও—

কাজেই কথা বলিতে হইল: বলিল—কি কথা?

প্রভা কহিল—আমি শিখিয়ে দেব না-কি? আচ্ছা, বলো—আর কোনো-দিন আমি তামাক খাব না, কারণ মুখ দিয়ে ভারি বিশ্রী গন্ধ বেরোয়, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী পছন্দ করেন না—বলো, বলো—

হরিচরণ বলিল—মুখের কথা ফস করে তো বলে ফেললে! প্রথম যখন তামাক খাওয়া প্র্যাকটিস করি সে কৃচ্ছ্র সাধনের ইতিহাস তো শোন নি। নিমু দাসকে দেখেছ—কৈবর্তপাড়ার নিমাই?

প্রভা গল্প শুনিতে ভারি ভালোবাসে। গল্পের গন্ধ পাইয়া তৎক্ষণাৎ পরম উৎসাহে সায় দিল—হুঁ—

—ঐ নিমুর সঙ্গে খুব ভাব করেছিলাম। রোজ দুপুরে ইস্কুল পালিয়ে তার বাড়ি যেতাম। আমাকে দেখে খুব খাতির করে ছাঁচতলায় কোদালখানা নামিয়ে দিত—দিয়ে নিমু নিজেই যেত তামাক সেজে আনতে। ফিরে আসতে একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা দেরি হত—যত্ন করে তামাক সাজত কি-না! ততক্ষণ

হলুদের ভুঁই তৈরি করবার ব্যবস্থা। ঠিক-দুপুরের রোদ্দুরে ঘণ্টাদেড়েক ধরে জমি কোপানো—একবার ভাব তো ব্যাপারখানা।

প্রভা কহিল—ওমা আমার কি হবে! এতখানি কষ্ট করতে তামাক খাবার জন্যে?

হরিচরণ কহিল—এই শেষ না-কি? একদিন কথাটা কেমন করে বাবার কানে উঠল। একটা আস্ত কল্কি ভাঙলেন পিঠের উপর। সংসারে একেবারে ঘেন্না ধরে গেল। বললে বিশ্বাস করবে না, তখন তো মোটে বারো-তেরো বছর বয়স—শেষ রাতে 'জয় গুরু' বলে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গের সম্বল একটা দেশলাই, এক কৌটো তামাক এবং বাবার নকশি-কাটা শখের কলকেটা।

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় গেলে?

হরিচরণ বলিল—কিছু তো ঠিক করে বেরুই নি। যাচ্ছি তো যাচ্ছি। মাঝে মাঝে গাছতলায় বসে তামাক সেজে নিচ্ছিলাম। গোড়ায় ফুর্তিও ঠেকছিল খুব—একেবারে মাঠের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে সকলের সামনে ইঞ্জিনের মতো ধোঁয়া উড়িয়ে চলে যাওয়া! কিন্তু সারাদিন ঐ ধোঁয়া ছাড়া পেটে আর কিছু পড়ল না। সন্ধেবেলা মহাবিপদ, তামাক গেল ফুরিয়ে—

প্রভা কহিল—তারপর?

—তারপর বোধগম্য হল যে সন্ন্যাসে মজা নেই। কিন্তু আপাতত এক ছিলিম তামাক এবং রাত কাটাবার একটুখানি জায়গার তো দরকার, শেষে ভাত-টাত জোটে ভালোই। একজন চাষা শুকনো খেজুরপাতার আঁটি নিয়ে যাচ্ছিল, ডাক দিলাম—ও মিয়া সাহেব, তোমার হাতের কলকেয় কিছু আছে না-কি? সাফ জবাব দিল—না। ফের জিজ্ঞাসা করলাম—এ গাঁয়ের নাম কি? বলল—কমলডাঙা।

প্রভা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—কমলডাঙা? ঐখানেই তো দিদির বাপের বাড়ি—না?

হরিচরণ প্রশ্ন করিল—দিদি? তোমার আবার দিদি কে? চিনলাম না তো।

প্রভা বলিল—আমার দিদি। সরযূ,—আমার আগে যিনি ছিলেন গো। তুমি প্রথমে কমলডাঙায় বিয়ে কর নি?

হরিচরণ বলিল—উঁহু, কলমিডাঙায়। কমলডাঙা সেই কোথায়—সাত-সমুদ্দুর পার। আর কলমিডাঙা ঐ সামনে—থাল পাঁচ-সাত বাঁকের পর গিয়ে পড়ব।

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল—তাই না কি? আমাদের এই নৌকো দিদির বাপের বাড়ির গাঁ দিয়ে যাবে?

হরিচরণ বলিল—হুঁ, তা ছাড়া আর পথ কই? ও মাঝি, নৌকো কলমি-ডাঙার খাল দিয়ে উঠবে তো?

কিন্তু মাঝি কি বলে শুনিবার মোটেই অপেক্ষা না করিয়া প্রভা বলিল—আমি নামব কিন্তু, নেমে এক দৌড়ে দিদির বাপের বাড়ি গিয়ে সব দেখেশুনে আসব। হাসছ যে—হাসলে শুনব না। যাব আর আসব, একমিনিটও সেখানে থাকব না, কেমন?

হরিচরণ বলিল—যাঃ, তা কি হয়?

—কেন হবে না? দিদির বাবা-মা বুঝি আমার পর! আমি যাব—কিচ্ছু দোষ হবে না।

হরিচরণ বলিল—দোষের কথা কে বলছে? ঘাট থেকে সে বাড়ি অনেক দূর।

প্রভা কহিল—অনেক দূর? দু-কোশ দশ-কোশ? যাও—ও তোমার যেতে না দেবার কথা!

ইহারও উত্তরে হরিচরণ একটা-কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু প্রভা শুনিলই না। সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—ও শুনেছি। যখন সেই ঘাটে যাব আমায় বোলো। হ্যাঁ—তুমি যা বলবে তা আমি জানি। ও মাঝি, কলমিডাঙায় নৌকো গেলে আমায় বোলো, একটু নামব।

বুড়া মাঝি স্বীকার করিল।

প্রভা পুনরায় আরম্ভ করিল—দিদি মারা যান এই কলমিডাঙায়—না?

হরিচরণ বলিল—হ্যাঁ, বাপের ভিটে যেন ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল। এসে দশটা দিনও কাটল না। সে তো তুমি সব শুনেছ।

সে গল্প প্রভা আগেই শুনিয়াছে। হরিচরণ অবশ্য সর্বদা চাপা দিতে যায়, কিন্তু প্রভাকে পারিবার জো আছে! একটা একটা করিয়া সব শুনিয়া তবে ছাড়িয়াছে।

বছর চার আগের কথা, তখন হরিচরণ চৌধুরি-সেরেস্তায় নায়েবি করিত। আষাঢ়-কিস্তির টাকা আদায় হইয়াছে, সেই টাকা লইয়া কলিকাতায় জমিদার-বাড়ি যাইবে। পানসিও ঠিক হইয়া গিয়াছে। ক-দিন পরে রথ, মতলব আছে কলিকাতা হইতে অমনি রথের বাজার সারিয়া আসিবে—গোটা পাঁচ-

সাত কলমের আঁবের চারা, এক সেট ছিপ-সুতা-বড়শি, সরযূর জন্য একখানা হাতিপাড় ঘটকার শাড়ি—পাড়টা একটু পছন্দ করিয়া কিনিতে হইবে, অমন গায়ের রঙের সঙ্গে যাহাতে মিল হয়। এই সমস্ত ঠিক হইয়া আছে, কিন্তু হঠাৎ সরযূ বাধাইল মুশকিল।

সন্ধ্যার সময় কেহ কোথাও নাই, হরিচরণ নিজের মনে টাকার চালান ঠিক করিতেছিল—হঠাৎ সরযূ আসিয়া সামনে বসিল। হরিচরণ একবার চাহিয়া দেখিতেই বিনা ভূমিকায় বলিল—তোমার নৌকোয় আমি কলমিডাঙায় যাব। চালানের যোগটা যাহাতে নির্ভুল হয় হরিচরণের মন ছিল সেই দিকে, শুধু বলিল—হুঁ। সরযূ অমনি তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—তা হলে জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিগে? হরিচরণ প্রশ্ন করিল—কি—কি বলছ? কিন্তু সরযূ অনাবশ্যক উত্তর দিবার জন্য একমুহূর্তও দাঁড়াইল না। পরে চালান লেখা শেষ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া যখন সরযূর দেখা মিলিল, তখন তাহার বাক্স গোছানো প্রায় সারা। কলমিডাঙায় রথের সময় বড় ধুম-ধাম হয়। হরিচরণের এই পানসিতে চড়িয়া সরযূ যেখানে যাইবে, চাঁপা-তলার ঘাট পথেই পড়ে—সেইখানে তাহাকে নামাইয়া দিতে হইবে, তারপর শুধু রথের মেলার ক-টা দিন বাপের বাড়ি থাকিয়া আবার হরিচরণের ফিরতি-বেলায় সেই নৌকাতেই ফিরিয়া আসিবে—এই ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই পাকা হইয়া গিয়াছে, আর তাহার নড়চড় হইবার উপায় নাই। হরিচরণ একটু প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিল, সরযূ বলিল—বাঃ রে, তুমি যে 'হুঁ' বললে, আগে রাজি হয়ে শেষকালে—এবং মুখের উপর মেঘ ঘনাইয়া আসিল। কাজেই বরকন্দাজকে একটু বড় দেখিয়া পানসি আনিতে বলিয়া দেওয়া হইল। শ্বশুর-মহাশয়কেও চিঠি লেখা হইল, বুধবারে দিনের ভাঁটায় খালের ঘাটে যেন পালকি-বেহারা উপস্থিত থাকে।

এই যে এত জেদ করিয়া বাপের বাড়ি আসা, কিন্তু চাঁপাতলার ঘাটে যখন নৌকা লাগিল সরযূ কেমন হইয়া গেল—যেন নামিবার উৎসাহ পায় না। নামিতে গিয়া ফিরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তারপর হরিচরণের কাছে আসিয়া বলিল—আমি যাব না, তুমি এসো, না হলে একা একা আমি কক্ষনো যাচ্ছি নে। কিন্তু হরিচরণের তো নামিবার উপায় নাই। সঙ্গে বিস্তর কাঁচা টাকা—লাটের কিস্তি আসিয়া পড়িয়াছে, টাকাটা ঠিক সময়ে পৌছিয়া দেওয়া দরকার, পথে একটুও দেরি করিবার জো নাই। মেয়েমানুষে এ সব বোঝে

না। সরযূর ধারণা, হরিচরণ ঠিক রাগ করিয়াছে। রাগ যে করে নাই, তাহা যতই বলা যায় কিছুতে বিশ্বাস করিবে না। কেবলই বলে—জেদ করে এসেছি বলে তুমি ঠিক রাগ করেছ, ঠিক—ঠিক—তোমার মুখ দেখে বুঝেছি—আমাকে ঠকাতে পারবে না—হাসলে কি শুনি? বিপুল বেগে হাস্য করিলেও ভুলিবে না, এমনি মুশকিল! ওদিকে ঘাটের উপর শ্বশুর মহাশয় স্বয়ং পালকি-বেহারা সহ উপস্থিত। হরিচরণ একবার নামিয়া প্রণাম করিয়া এবং সবিশেষ নিবেদন করিয়া বিদায় লইয়া আসিয়াছে। এখন তিনি ঠায় রৌদ্রে দাঁড়াইয়া, অথচ মেয়ে-জামাইয়ের বিদায়ের পালা আর সাঙ্গ হয় না। হরিচরণ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বলিল—যাও, যাও, শ্বশুর মশায় কি ভাবছেন বল তো? সরযূর সেই আগের কথা—রাগ কর নি? আচ্ছা গা ছুঁয়ে বলো। হ্যাঁ, বলো যে ফিরতি-বেলা সঙ্গে নিয়ে যাবে—

সরযূর গা ছুঁইয়া হরিচরণ বলিল—নিয়ে যাব।

সে শপথ রক্ষা হয় নাই।

এ সব পুরানো কথা। ডিঙি চড়িয়া আজ রাত্রে দুজনে সরযূর বাপের বাড়ির ঘাট দিয়া চলিয়া যাইবে, ইহা শুনিয়া অবধি প্রভার কেবলই নানারূপ মনে উঠিতে লাগিল। নৌকায় উঠিয়াই ছইয়ের একদিকের অনেকখানি খড় ছিঁড়িয়া সে মস্ত বড় ফাঁক করিয়া লইয়াছে, সেখান হইতে উত্তরের পাড় বেশ দেখা যায়। সেই ফাঁক দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া যে-সতীনকে জীবনে কোনো দিন দেখে নাই তাহার কথাই ভাবিতেছিল। হরিচরণও চুপ করিয়া বসিয়া। ছপ-ছপ করিয়া দাঁড়ের আওয়াজ···এক একবার ধনুকের তীরের মতো পাশ কাটাইয়া জেলে-ডিঙি আগাইয়া যাইতেছে। হঠাৎ মাঝি চেঁচাইয়া উঠিল—বাঁয় দাঁড় মারো—ডাইনে দ'—গাজি বদর বদর—। অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। একটা পাখি জলের কোথায় বসিয়া ছিল, মাঝির চিৎকারে ফরফর করিয়া ডিঙির উপর দিয়া ও-পারে উড়িয়া গেল।

প্রভা মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আজকে অমাবস্তে?

হরিচরণ বলিল—উঁহু। অমাবস্তে কাল, নিশিপালন উপোস দুই-ই! অমাবস্তের খোঁজ কেন?

প্রভা কহিল—দিদি যেদিন মারা যান সেদিনও ঘোর অমাবস্তে শুনেছি—না?

হরিচরণ প্রভার মুখের দিকে চাহিল। বলিল—এখনও ঐ কথা ভাবছ? যা চুকেবুকে গেছে, সে-সব আবার কেন?

প্রভা কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ওগো, আজ যদি আবার অমনি চুকে যায়, আমার কথাও আর তুমি ভাববে না তা হলে?

হরিচরণ বলিতে লাগিল—শোন কথা! তুমি আজ হলে কি? যখন তখন যা-তা বলা আদিখ্যেতা। না, অমন বলে না, কি কথা কেমন ক্ষণে পড়ে যায়, কিছু বলা যায় কি?

প্রভা একটু হাসিল।

হরিচরণ বলিল—হাসছ? আমি ঐ রকম কালাকাল মানতাম না—পাঁজি-টাজি ডোণ্ট্ কেয়ার করতাম। শোনো তবে, সরযূকে নামিয়ে দিয়ে তো কলকাতায় গেলাম। কাছারি থেকে খবর গেল, বিপিন সা জোর করে মহালের বাঁধ কেটে দিয়েছে। সেদিন অমাবস্যে, তারপর স্যুহ্যিগেরোন। খাজাঞ্চি মশায় বললেন—এমন দিনে কখনও বেরুবেন না, শাস্ত্রে পই-পই করে বারণ আছে। না শুনে রওনা হলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, চাঁপাতলার ঘাটে নৌকো বেঁধে নিজে গিয়ে সরযূকে তুলে আনব—এত করে বলে দিয়েছিল! যাত্রার ফল অমনি সঙ্গে সঙ্গে। ঘাটে পৌঁছে দেখি, আমাকে আর যেতে হল না—সে-ই এসেছে।

এ কথা তো প্রভা শোনে নাই। জিজ্ঞাসা করিল—এসেছিলেন? আমরা শুনেছি যে আর দেখা হয় নি।

হরিচরণ বলিল—হাঁ প্রভা, এসেছিল, দেখাও হয়েছিল। চাঁপাতলায় নয়, তার রশিটাক পশ্চিমে—বটতলার শ্মশানঘাটে।

বলিতে বলিতে সে চুপ করিয়া গেল।

তখন উত্তর-বিলে ঝোড়োকণায় একসারি তালগাছের মাথার উপর ক্রমে আঁধার করিয়া আসিতেছে, একটা একটা করিয়া তারা ঢাকিয়া যাইতেছে। প্রভা হঠাৎ কহিল—একটা কথা বলব?

—কি?

—আজকে নৌকো এখানে বেঁধে রাখো, কালকের জোয়ারে যাব।

হরিচরণ বলিল—তাতে লাভ কি?

প্রভা বলিতে লাগিল—তুমি অমত কোরো না। এই রাত্তিরে কলমিডাঙায় গেলে তুমি কক্ষনো আমায় নামতে দেবে না, তা জানি। কালকে সেই

অমাবস্তে, কাল দিনমানে ঘাটে নৌকো বেঁধে আমি দিদির বাবার ওখানে ছুটে যাব। গিয়ে বলব, আমি এসেছি—ঘরে নাও। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, অমত কোরো না। আমার বাবা নেই, কাল দিনমানে আমি বাবার কাছে যাব।

বলিতে বলিতে হরিচরণের পায়ের কাছে পড়িয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। এমনি ছেলেমানুষ!

কিন্তু সত্যসত্যই তো মরা-সম্পর্কের কুটুম্ববাড়ি বিনা খবরে অমন করিয়া নূতন বউকে তোলা যায় না। লোক বলিবে কি? হরিচরণ প্রভাকে শান্ত করিতে লাগিল—ছিঃ, কাঁদে না, আচ্ছা পাগল তুমি! একবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো তো, তা কখনো হয়?

প্রভা মাথা তুলিয়া বলিল—কি হয় না?

—বলছি, তুমি ওঠো। ভগবান যাকে নিয়ে গেলেন, তার জন্যে হা-হুতাশ করে ফল কি? ও ভুলে থাকাই ভালো।

প্রভা আগুন হইয়া উঠিল।

—জানি, জানি, তোমরা তা খুব পার। তোমরা ভালোবাস না ছাই! সব মুখস্থ-করা কথা। আজ যদি ঝড় ওঠে, নৌকো ডুবে যায়, আমি মরি—কালকেই আর একজনের সঙ্গে কত সোহাগ হবে! তখন আমার কথা কেউ বলতে গেলে অমনি মুখ চেপে ধরবে—

হরিচরণ হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল—রাগ করে চোখ বুজে আছ না-কি? গাঙ ছাড়িয়ে নৌকো যে খালে ঢুকছে। এখানে মোটে হাঁটুজল। নৌকো ডুবলেও আমরা ডুবব না, দেখো না তাকিয়ে।

প্রভা রাগ করিয়া জবাব দিল না, তাকাইয়াও দেখিল না।

নৌকা তখন খালে ঢুকিয়া তরতর বেগে যাইতেছিল। প্রভা বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আকাশে তারা নাই, চারিদিকে আঁধার—ভালো করিয়া ঠাহর করিলে ঝাপসা দেখা যায়। খালের ধারে কাহাদের লাউ-মাচা, জোয়ারের জল তাহার নিচে অবধি তলাইয়া দিয়াছে। প্রভার নড়াচড়া নাই। চরের ধারে সারি সারি ক-খানা ঘর ও খড়ের গাদা দিগন্ত-বিসারী ধানখেত পাহারা দিতেছে। হঠাৎ তাহারই মধ্যে কোন দাওয়া হইতে খঞ্জনী বাজিয়া উঠিল। আকাশভরা মেঘ, কোনো পারে একটা লোকের ছায়া দেখা যায় না। প্রভা বসিয়াই আছে—যেন একখানি ছবি, ছইয়ের ভিতরে অন্ধকার পটের উপর পাকা ধানের রঙ দিয়া ছবি আঁকা। হরিচরণও চুপ

করিয়া ছিল। কিন্তু কতক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা বড় অসহ্য ঠেকিল। প্রভার হাত ধরিয়া নাড়িয়া বলিল—শুনছ? শুনছ?

—কি?

শোঁ-শোঁ করিয়া অনেক দূর হইতে শব্দ আসিতে লাগিল, দূরের কোনো গাঁয়ে বাদল নামিয়াছে। হরিচরণ বলিল—অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কি দেখছ? এদিকে ফেরো না। এখনও রাগ আছে নাকি?

প্রভা কহিল—রাগ কিসের?

—রাগ নয় তো কি? কেবল ঐ রাগটাই যা তোমার দোষ, নইলে তোমায় এমন ভালো লাগে!

এবার প্রভা মুখ ফিরাইল, একটুখানি হাসি ঠোঁটে ফুটিল। বলিল—সত্যি না-কি?

হরিচরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—নিশ্চয়ই, বুক চিরে দেখাতে পারি—

প্রভা কহিল—দেখাও না একটু। তারপর হাসিতে হাসিতে অতি তরল স্বরে প্রশ্ন করিল—আচ্ছা, ঐ কথাটা—ঠিক ঐ কথাটা কতবার তুমি দিদিকে বলেছ, আমায় বলতে পার?

হরিচরণ মুষড়াইয়া গেল। সরযূর ভূত তবে তাহাকে এখনও ছাড়ে নাই! হয়তো রাতে দুপুরে মাঝে মাঝে যখন মাথার ঠিক থাকে না, সরযূকে এইরূপ কোনো কোনো কথা বলিয়া থাকিবে, কে তাহা মনে করিয়া রাখিয়াছে? সকলেই এমন বলিয়া থাকে, কিন্তু সে-সব স্বীকার করিবার জায়গা ইহা নয়। তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল—কক্ষনো না, একদিনও না—

প্রভা কহিল—কি সাধুপুরুষ! একদিনও না? হাত-পা ছেড়ে দিয়ে গাঙের তলায় যুগল-মিলন হবার কথা-টথা দিদিকে কোনোদিন বল নি—যেমন আজকে আমায় বলছিলে?

প্রভা খুশি হইতেছে বুঝিয়া হরিচরণ আরও উৎসাহে প্রতিবাদ করিতে লাগিল—যাকে-তাকে একথা বলা যায় না-কি? ও তোমাকেই শুধু বললাম—বুঝলে প্রভা, সে শুধু নামেই তোমার সতীন, ভালোবাসার ভাঁগ পায় নি।

ঠিক এমনি সময়ে মাঝি বলিয়া উঠিল—কলমিডাঙায় এলাম মাঠাকরুন—। কশাড় হোগলাবনের মধ্যে ঢুকিয়া হোগলার আগা কাঁপাইতে কাঁপাইতে নৌকা ডাঙায় আসিয়া লাগিল। হরিচরণের মুখের হাসি নিবিয়া গেল। তাহার কেমন মনে হইল, যাহাকে কোনোদিন ভালোবাসে নাই বলিতেছিল, সে যেন

কথাটা আশপাশ কোনোখান হইতে শুনিয়া ফেলিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এ ঠিক সরযূরই কান্না, সুরের তীব্রতায় যেন সহস্রগুণ জোরে আসিয়া বুকে লাগিতেছে। বাতাস উঠিয়াছে। ঘাটের উপরে বাঁশঝাড়, নীরন্ধ্র অন্ধকার—সেখানে কটর-কটর-কট সে যে কি শব্দ উঠিতেছে, যেন কে সমস্ত চিবাইয়া ভাঙিয়া-চুরিয়া একাকার করিয়া ফেলে আর কি! সেই অন্ধকারে কিছু দূরে বাঁওড়ের কিনারায় হরিচরণ অকস্মাৎ যেন সরযূকে দেখিতে পাইল। সরযূকে সে কতকাল চোখে দেখে নাই, মন হইতে সে যেন মুছিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজ দেখিল, তেমনি খুব ফরসা এবং কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা টকটক করিতেছে, পরনে লালপাড় শাড়ি, রঙ কাঁচা-হলুদের ন্যায়—সে যে তাহাতে কোনো ভুল নাই। সরযূ আজ অন্ধকারের মধ্যে আশশ্যাওড়া ও ভাঁটের জঙ্গল ভাঙিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিতেছে। বাওড়ের বাঁশের সাঁকো পার হইতে পারিল না, সেখান হইতে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ডাকিতেছে—আমায় ফেলে যেও না, নিয়ে যাও—নিয়ে যাও। হরিচরণ চোখ বুজিল, হাত দিয়া কান ঢাকিল, তবু কানে ঢুকিতে লাগিল ঝড়ের একটানা শব্দ—উ-উ-উ, ভাষাহীন একটানা কান্না। মনে হইল, ঐ শব্দ আসিতেছে সাঁকোর ওপার হইতে, সেখানে মুখ থুবড়াইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া সরযূ কাঁদিতেছে। সে উহাদের কথাবার্তা শুনিতে পাইয়াছে—শুনিয়া বুক চাপড়াইয়া বিজন শ্মশান-ঘাটায় একলা প্রেতিনী মানুষের ভালোবাসার জন্য মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। মড়মড় করিয়া একটা গাছ ভাঙিয়া পড়িল। যেন সাঁকো পার হইয়া চলিয়া আসিল এবার! চেঁচাইয়া বলার দরকার—মাঝি, মাঝি, বোঠে ধরো, দাঁড় লাগাও, পালাও, পালাও—

দরকার তো বটে, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

উপসংহার

নবগোপাল কবিতা লেখে, সে কবিতা মাসিকপত্রে ছাপা হয়।

জনার্দন সেন নেবুতলায় থাকেন। লোহার কারবার করেন বটে, কিন্তু ভদ্রলোক রসগ্রাহী। আজ বছর পাঁচেক সেন মহাশয়ের সহিত নবগোপালের পরিচয় হইয়াছে, শ্যামবাজার হইতে নেবুতলা অবধি হাঁটিয়া মাঝে মাঝে সে

কবিতা শুনাইতে আসে। জনার্দন দিব্য চোখ বুজিয়া শুনিয়া যান, কোনো তর্ক তুলিয়া গোলমাল করেন না এবং উপসংহারে নবগোপালের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক মিষ্টকথা বলিয়া থাকেন।

কি করিয়া যে তরুণ কবি এবং প্রবীণ লোহার ব্যাপারির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছিল তাহা জানি না। তোমরা ভাবিবে, ইহার মূলীভূত হেতু কাতু অর্থাৎ কাত্যায়নী—জনার্দনের মেয়ে। কিন্তু সে কথা আর বলিবার জো রহিল না. ২৪শে তারিখে কাতুর বিয়ে হইয়া যাইতেছে, নবগোপালের মেসে আজ নিমন্ত্রণের চিঠি আসিয়াছে।

তা ছাড়া আজ না হয় কাতু ভারিক্কি হইয়াছে, পাঁচ বছর আগে ছিল একফোঁটা এতটুকু মেয়ে, বজ্জাতের শিরোমণি। তাহার সঙ্গে প্রেম! জনার্দনের সহিত কাব্য-আলোচনা মাসাবধি চলিবার পরে নবগোপাল কাতুকে দেখিয়াছিল, তাহার আগে কাতু বলিয়া কেহ আছে জানিতই না।

এক রবিবারে দুপুরবেলা নবগোপাল কবিতা পড়িতেছে। সাত দিনের মধ্যে গড়ে তিন-সাতে একুশ নয়, তাহার দুইটা কম—উনিশটা কবিতা লিখিয়াছে। তাহার মধ্যে চার-পাঁচটা এমন অদ্ভুত হইয়াছে যেন চোখের জল টানিয়া নিয়া আসে। নবগোপাল পড়িয়া যাইতেছিল, জনার্দন চোখ বুজিয়া গূঢ়মর্ম উপলব্ধি করিতেছিলেন। খানিক পরে গড়গড়ার টান বন্ধ হইল, অতিরিক্ত ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া থাকে। নবগোপাল পড়িয়া যাইতে লাগিল। সহসা সন্দেহ জাগিল, গড়গড়ার টান বন্ধ হইল ভাবাবেশে কিংবা নিদ্রাবশে? ডাকিল—জনার্দনবাবু, শুনছেন? জনার্দনের সাড়া নাই।—দুত্তোর! বলিয়া সে কবিতার খাতা বন্ধ করিল।

এই সময়ে নজর পড়িল, দুয়ারের কাছে ডুরে-কাপড়-পরা একটি ছোট মেয়ে মুখ বাড়াইয়া মিটমিট করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। মেয়েটির দিকে চাহিতেই হাসিয়া সে মুখ লুকাইল। নবগোপাল ডাকিল—ও খুকি, এসো না—এসো এখানে। খুকি দিল এক ছুট—ঝমর-ঝমর করিয়া মল বাজিতে বাজিতে মিলাইয়া গেল। বেশ তো—খাসা তো—খঞ্জনপাখি কখনো চোখে দেখে নাই, শুনিয়াছে সে পাখি নাচিতে নাচিতে পলাইয়া যায়।

হঠাৎ জনার্দন চোখ খুলিলেন—কই? থামলে কেন? পড়ো—এই প্রথম দেখা।

একদিন নবগোপাল গিয়া দেখিল—জনার্দন নাই, একটা বড় অর্ডার পাইয়া

বড়বাজার লোহাপটিতে গিয়াছেন। ফিরিতেছিল, কিন্তু ঠিক দুপুরের রোদে অনেকখানি পথ হাঁটিয়া বড় কষ্ট হইয়াছে, একটু না জিরাইলে পারা যায় না। জুতা খুলিয়া ফরাসের উপর বসিয়া খানিক পাখা করিল। আধঘণ্টা কাটিয়া গেল, তবু জনার্দনের দেখা নাই। আজ আর হইবে না।

উঠিয়া জুতা পায়ে দিতে গিয়া নবগোপাল আর জুতা খুঁজিয়া পায় না। তক্তাপোশের নিচে তাকাইয়া দেখিল, সেখানে নাই। চৌকাঠের বাহিরে যদি রাখিয়া আসিয়া থাকে—খুঁজিয়া দেখিল, সেখানেও নাই। নিমন্ত্রণ-বাড়ি নয় যে জুতা চুরি যাইবে, পাড়াগাঁ হইলে ভাবা যাইত শিয়ালে মুখে করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে ঘরেও কেহ আসে নাই। জুতা-বিভ্রাটে নবগোপাল চিন্তিত হইল। সাড়ে চারি টাকার জুতাজোড়া—একমাসও হয় নাই।

হঠাৎ দেখিতে পাইল তক্তাপোশের ওদিকের পায়ার কাছে একজোড়া মল পড়িয়া আছে। মলের অধিকারিণীর কথা মনে পড়িল। তারপর ঠাহর হইল, মলজোড়ার কাছাকাছি সিমেন্টের একটা খালি পিপে পড়িয়া আছে, সেটা যেন নড়িতেছে।

নবগোপাল কহিল—কে? কে ওখানে? খুকি, তুমি জুতো নিয়েছ নাকি? সিমেন্টের পিপে খুকখুক করিয়া হাসিতে লাগিল।

নবগোপাল বলিল—ও খুকি, বেরিয়ে এসো—ওখানে বিছে-টিছে কামড়াবে, অমন জায়গায় লুকিয়ে থাকে! আচ্ছা, এই আমি চোখ বুজলাম—এই—এই—কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি নে, চোখ খুলে দেখব আমার জুতোজোড়া আপনা-আপনি পড়ে আছে—

জুতোজোড়া সত্যসত্যই যথাস্থানে পৌছিল, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নবগোপাল চোখ মিটমিট করিয়া দেখিতেছিল। কাতু পলাইয়া যাইতেছে, ধাঁ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল।

—ওরে দুষ্টু, শব্দ হবে বলে মল খুলে রেখে জুতো-চুরি—এত বুদ্ধি তোমার? কেমন, এইবার?

কাতু আঁকিয়া-বাঁকিয়া হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু নবগোপালের শক্ত মুঠি খুলিল না। হঠাৎ সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। নবগোপাল ভারি অপ্রস্তুত হইল। বলিল—কাঁদ কেন খুকি, কি হল?

খুকি বলিল—আমার লাগে না বুঝি! হাত একেবারে ভেঙে গেছে, উহু-হু—

মহাব্যস্ত হইয়া নবগোপাল বলিল—দেখি, কোথায় লাগল? না, কিচ্ছু হয় নি—ফুঃ—আচ্ছা, ধুলোপড়া ধুলোপড়া ছাগলের শিং—

কিন্তু মন্ত্র শেষ হইবার আগেই যন্ত্রণা নিরাময় হইল। নবগোপাল ধূলা পড়িতেছে, কাতু ফিক করিয়া হাসিয়াই দৌড়। দৌড়—দৌড়। পিছন হইতে নবগোপাল ডাকিতে লাগিল—খুকি, তোমার মল পড়ে রইল—নিয়ে যাও—নিয়ে যাও। আর খুকি!

পরদিন আর কোনো বাধা নাই, জনার্দন বসিয়া আছেন, মহা আড়ম্বরে কাব্যচর্চা হইতেছে। কাতু কাহাকেও কিছু না বলিয়া সরাসরি ফরাসের উপর গিয়া বাবার কাছে গম্ভীর হইয়া বসিয়া পড়িল। এই অতি-শান্ত মেয়েটির যেন ইহা নিত্যকার অভ্যাস। এমন একমনে শুনিতে লাগিল যে চোখের পাতাটিও নড়ে না।

কবিতা পড়া শেষ হইল। নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল—কেমন শুনলে খুকি? কাতু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—ভালো। একটু পরে বলিল—তুমি অনেক ছড়া জান—আমায় শিখিয়ে দেবে?

নবগোপাল তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিল যে উহা ছড়ার মতো হেয় জিনিস নয়—কবিতা, বইয়ের মধ্যে ছাপা হইয়া বাহির হয়। কিন্তু কাতু প্রত্যয় করিল না। এই লোকটা—জামা-গায়ে কাপড়-পরা আর সকলের মতো মানুষ একটা—তাঁহার ছড়া নাকি ছাপা হইয়া বই হয়! মাথা নাড়িয়া বলিল—তুমি বই ছাপাও? যাঃ, মিথ্যেবাদী কোথাকার—বই না আরো কিছু! কাতু সম্প্রতি বানান করিয়া করিয়া পড়িতে শিখিয়াছে, বইয়ের সম্ভ্রম বোঝে।

নবগোপালের বড় ইচ্ছা হইল, নিজের নাম ছাপানো অবস্থায় দেখাইয়া এই বোকা মেয়েটার তাক লাগাইয়া দেয়। কিন্তু বাড়ি হইতে একবার ঘুরিয়া আসিতে না পারিলে তাহার উপায় নাই। জনার্দন হিসাবী মানুষ, সাহিত্য-রসিক বটে—কিন্তু মাসিকপত্র কিনিয়া পয়সার অপব্যয় করেন না।

আর একদিন দুপুরবেলা রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে—নবগোপাল খাতা বগলে ঘামিতে ঘামিতে আসিয়া রোয়াকে উঠিল। ঘরের ভিতর ফড়ফড় করিয়া ফুরশির আওয়াজ উঠিতেছে, কর্তা যে বাড়িতে আছেন এবং সচেতন অবস্থায় আছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, নবগোপাল পুলকিত হইয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু যাহা দেখিল, তাহাতে বিশেষ আশা রহিল না।

জনার্দন ইজিচেয়ারে পড়িয়া নাক ডাকাইতেছেন, ফুরশির আওয়াজ বলিয়া যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নাকের ডাক, দূরে হইতে নাক ও ফুরশির আওয়াজের প্রভেদ নির্ণয় করা দুষ্কর। কাতুও মেঝের উপর সর্বাঙ্গ এলাইয়া বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে। নবগোপাল মনঃক্ষুন্ন হইল। এই কাঠ-ফাটা রোদে শ্যামবাজার হইতে এত পথ আসিয়াছে!

মনে হইল, কাতুর কি অসুখ করিয়াছে, ঘুমের ঘোরে কাশিয়া কাশিয়া উঠিতেছে, সমস্ত মুখ লাল, মাঝে মাঝে কাটা-কবুতরের মতো ছটফট করিয়া উঠে। নবগোপাল বড় ব্যস্ত হইয়া ডাকিল—কাতু, ও কাতু, কাত্যায়নী! কাতু চোখ মেলিল বটে, কিন্তু কথা বলে না। এত ডাকাডাকি, জবাব নাই —স্বর বন্ধ হইয়া গেল নাকি? ডাক্তারেরা এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট কোনো কোনো ব্যারামের কথা বলিয়া থাকে বটে। জনার্দনকে ডাকিয়া তুলিতে যাইতেছে, সহসা কাতু লাফ দিয়া উঠিল, বলিল—বাব্বাঃ, দুপুরে একটু ঘুমুতে দেবে না— কী জালাতন! সঙ্গে সঙ্গে নাক-মুখ দিয়া প্রচুর ধোঁয়া নির্গত হইল। বোঝা গেল, সে কেন কথা কহিতেছিল না। তামাক টানিতে টানিতে জনার্দন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, সাজা তামাক পাইয়া পোড়ারমুখী চুরি করিয়া টানিয়া দেখিতেছিল। নবগোপাল বলিল—তামাক খাচ্ছিলি তুই—আমি বলে দেব, সব্বাইকে বলে দেব।

কাতু প্রতিবাদ করিল—বা-রে, আমি ঘুমিয়েছিলাম না? দেখ নি আমার চোখ বোজা? আমি তামাক খাই নি।

নবগোপাল বলিল—ও রে মিথ্যুক, তামাক খাস নি? তবে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল কেন রে—নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ইঞ্জিনের চোঙের মতো?

কাতু সাফ অস্বীকার করিল—কখন? কক্ষনো নয়। অমন মিছে কথা বোলো না।

—মিছে কথা? নবগোপাল হাত ধরিয়া ফেলিল—দেখি, মুখ শুঁকে দেখি—এই এখনো গন্ধ রয়েছে, তোমার বাবাকে জাগিয়ে দেখাব। দাঁড়াও—

কাত্যায়নী তাহার কনুইতে দিল কামড়, একেবারে দুটা দাঁত বসিয়া গেল। নবগোপাল হাত ছাড়িয়া দিয়া যন্ত্রণায় বসিয়া পড়িল। কনুয়ের সে দাগ আজও মুছিয়া যায় নাই।

নবগোপাল ভাবিল মেয়েমানুষ হইয়া তামাক খায়, হউক না ছোটমানুষ— অমন মেয়েকে ছাই পাতিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়, তাহার রক্তটুকুও যেন

মাটিতে না পড়ে। আপনার কেহ হইলে সে সেদিন ঐ মেয়েকে পিটাইয়া হাড় ভাঙিয়া দিত।

সেই পাঁচ বছর আগেকার চঞ্চল দুরন্ত কাতু আজ আনতনয়না শান্ত কিশোরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি গত বুধবারের বৃত্তান্তটা শোনো—

বুধবার বিকালবেলা সেই যে বড় জল হইয়া গেল, তাহার কিছু আগে নবগোপাল যথারীতি খাতাসহ জনার্দনের বাড়ি গিয়াছিল। বৈঠকখানার দুয়ার ভেজানো, সে অবস্থায় ধাঁ করিয়া ঢুকিয়া পড়িতে নাই—আগে কড়া নাড়িতে হয়, কড়া যদি না থাকে বারকয়েক সশব্দে কাশিলেও চলে। নবগোপালের তো সে কাণ্ডজ্ঞান নাই। ঘরে ঢুকিয়া মহা বেকুব হইয়া গেল। পাঁচ বছর এ বাড়িতে গতায়াত, কোনোদিন গিন্নি নবগোপালের সামনে পড়েন নাই, তিনি বৈঠকখানার দিকে আসেন না। কিন্তু ঐ দিন আসিয়াছিলেন এবং বিপুল বপু লইয়া তক্তাপোশের আধখানা জুড়িয়া বসিয়াছিলেন, কর্তার সঙ্গে কি একটা কথা হইতেছিল। নবগোপালকে দেখিয়া মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া কেবলমাত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া লজ্জা রক্ষা করিলেন, ঐ বিশাল দেহখানা লইয়া অন্দরে পলাইয়া যাওয়া তো সোজা কথা নয়!

জনার্দন ঠেকাইয়া দিলেন—আহা উঠছ কেন? ও যে নবগোপাল, ঘরের ছেলের মতো! ওর পদ্য পড় নি? দাড়ি-টাড়ি উঠলে ঠিক রবি ঠাকুর হবে বলে দিচ্ছি।

গিন্নি আর দাঁড়াইয়া লজ্জা করিলেন না। সাধ্যও ছিল না, এইটুকু দাঁড়াইয়াই হাঁপ ধরিয়াছিল। বলিলেন—তুমি নবগোপাল? কোনোদিন দেখি নি বটে, ওদের মুখে শুনে থাকি। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো বাবা, বোসো—। এবং একটু পরেই সহসা কর্তার উপর ঝাঁঝিয়া উঠিলেন—হাত গুটিয়ে বসে থাকলে যে! ফর্দ-টর্দ করো, ভদ্দোরলোককে শুধুমুখে বিদায় করতে হবে নাকি?

গিন্নি বলিয়া গেলেন, কর্তা নিরাপত্তিতে ফর্দ করিতে লাগিলেন—সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতুয়া, ক্ষীরমোহন ইত্যাদি ইত্যাদি, ভদ্রলোককে ঠিক যে প্রকার অভ্যর্থনা করিতে হয়! প্রথম আলাপের দিনই গিন্নির মিষ্টান্নের কথা মনে পড়িয়াছে অথচ জনার্দন পাঁচ বছর কেবল ভূরিভূরি মিষ্টকথাই শুনাইয়াছেন। এই বস্তুতান্ত্রিক আপ্যায়নে নারীজাতির প্রতি ভক্তিতে নবগোপাল আপ্লুত হইয়া উঠিল।

গিন্নি উঠিলেন, বড় ব্যস্ত। বলিলেন—তুমি এসেছ, থির হয়ে যে ছুটো কথা বলব বাবা, তার কি জো আছে? দেখিগে আবার ওদিকে, চারখানা লুচির যোগাড় তো করতে হবে!

লোকে নাকি বলিয়া থাকে, বাংলা দেশে কবিতা লিখিয়া কোনো খাতির নাই!

কিন্তু পরমাশ্চর্যের বিষয় এই যে নিজহাতে নগদ আট আনার মিষ্টান্নের ফর্দ করিয়া দিয়া এবং তদতিরিক্ত লুচির প্রস্তাবের পরেও জনার্দন হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন—আজকে যে তুমি এসেছ, খাসা হয়েছে—তোমার কথাই ভাবছিলাম, ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন। ওরে বেহায়া মেয়ে, তারা এক্ষুনি এসে পড়বে—এ দিকে যে বড় ঘুরঘুর করছিস?

বেহায়া মেয়ে বলা হইল কাতুকে। সে ওদিকের দুয়ারের সামনে দিয়া যাইতে যাইতে নবগোপালকে দেখিয়া দাঁড়াইল, হয়তো ঘরেও আসিত, কিন্তু বাবার তাড়া খাইয়া সরিয়া গেল।

নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল—কারা আসবে?

জনার্দন বলিলেন—আহিরিটোলা থেকে—কারা-টারা নয় হে—সেই এক-জনই, তোমাদের আজকালকার যেমন দস্তর। আমি এ ভালোই বলি—যার জিনিস সে-ই দেখেশুনে বাজিয়ে নিয়ে যায়, মন্দ কি!

নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল—কাতুর বিয়ে নাকি?

—সে কি বাপু, আমার হাত? জন্ম মৃত্যু বিয়ে তিন বিধাতায় নিয়ে—যদি আর-জন্মে ওদের হাঁড়িতে চাল দিয়ে থাকে, তবে তো? বাবাজীবন নিজেই দেখতে আসছেন আজ।

নবগোপাল কহিল—বেশ, ভালো কথা।

জনার্দন বলিতে লাগিলেন—ভালো বলে ভালো! আজ যদি ওখানে লেগে যায়, বুঝব মেয়ের ভাগ্যি, মেয়ের বাবারও ভাগ্যি। হাঁ—সম্বন্ধ বটে! অবিনাশ দত্তর নাম শোন নি? সে-ই—

নামটি হয়তো সুবিখ্যাত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নবগোপাল শুনে নাই। জনার্দনের কথাতেই সমুদয় পরিচয় প্রকাশ পাইতে লাগিল।—তবু গিন্নি বলেন, এমন পটের মতো মেয়ে দোজবরের হাতে! আরে, লোহাপটিতে তিন-তিনখানা দোকান, কমসে কম লাখো টাকা খাটছে—দোজবরে বললেই হল? ভালোভালি দু-হাত এক হোক, তারপর বছরের মধ্যে আমার এই ব্যবসার

ভোল ফিরিয়ে না দিতে পারি তো তখন দেখো। বাবাজীবন মানুষ খুব ভালো, এরি মধ্যে অনেক আশা-টাশা দিয়েছেন—বুঝলে?

নবগোপাল বলিল—তবে আমি উঠি, আপনারা ব্যস্ত আছেন—

জনার্দন বলিলেন—উঠবে মানে? আমি যে ভাবছিলাম তোমার কথাই। বাবাজীবন নিজে মেয়ে দেখবেন, আমি বাপ হয়ে কি করে সেখানে থাকব? এসে যখন পড়েছ, তুমি ঘরের ছেলে—তোমাকে সব সেরে-সামলে দিতে হবে। যে হাবা মেয়ে, কি কথায় কি সব উত্তর দিয়ে বসবে তার ঠিক কি!

যথাসময়ে বাবাজীবন আসিলেন। আধুনিক দস্তুর অনুযায়ী নিজেই পাত্রী দেখিতে আসিয়াছেন বটে, তা বলিয়া বয়স হিসাবে তিনি কিন্তু নিতান্ত আধুনিক নহেন। ভুঁড়ি দেখিলেই প্রত্যয় জন্মে টাকা আছে এবং লোকটি কাজেরও। আসিয়াই হুকুম করিলেন, চটপট নিয়ে আসুন, কিছু সাজাবেন না—একেবারে এক কাপড়ে, যেমন আছে তেমনি—

ঝি কাতুকে লইয়া আসিল। জনার্দন নবগোপালকে বিশেষ প্রকারে ইশারা করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। কিন্তু কাতু সত্যসত্যই এক কাপড়ে আসে নাই। দেখিলে হাসি আসে, সাজিলে-গুজিলে তাহাকে কি মানায়? টিপ পরিয়া চুলে পাতা কাটিয়া মা ঠাকুরমা এবং বাড়িসুদ্ধ বোধকরি বা পাড়াসুদ্ধই সকলের নানা আকারের বিবিধ গহনায় সর্বাঙ্গ বোঝাই করিয়া রাঙা বেনারসির আঁচল লুটাইতে লুটাইতে কাতু আসিয়া ঘাড় নিচু করিয়া দাঁড়াইল। অবিনাশ হাঁকিলেন—তোলো, তোলো—মুখটা উঁচু করো—ও ঝি, মুখটা তুলে ধরো গো! ঝি মুখ উঁচু করিয়া ধরিল, কিন্তু তখনই নামিয়া পড়িল, অবিনাশ দুই চোখের দূরবীন কষিবার সময় পাইলেন না। আর মেয়ে ঘামিয়া ঘামিয়া খুন হইতেছে, পড়িয়া যায় আর কি! নবগোপাল হাত ধরিয়া বসাইয়া দিল।

অবিনাশ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—উঁহু, বসলে হবে না—হাঁটিয়ে দেখতে হবে। ঝি, তুমি নিয়ে যাও তো ঐ কোণ অবধি—

হাঁটাইয়া দেখা হইল। খোঁপা খুলিয়া চুলের বহর মাপা হইল। হাতের কব্জিতে বুড়া-আঙুল ঘসিয়া ঘসিয়া অবিনাশ সঠিক বুঝিলেন, পরিদৃশ্যমান রঙটাও মেকি নহে। কিন্তু দৃষ্টিপরীক্ষা লইতে গিয়া বাধিল মুশকিল। কাতু কিছুতেই চোখ মেলিয়া তাকাইতে পারে না। এদিকে নেপথ্য হইতে জনার্দন নবগোপালকে পুনঃ পুনঃ ইঙ্গিত করিতেছেন এবং হাত-পা নাড়িয়া কাতুর উদ্দেশে শাসাইতেছেনও খুব। কিন্তু খানিকটা ঘাড় তুলিয়া তাকাইতে গিয়াই

আবার নিচু হইয়া পড়ে! নবগোপাল বুঝাইতে লাগিল—এমন দেখি নি—আহা, অত লজ্জা কিসের? বুঝলেন অবিনাশবাবু, বড্ড লাজুক—যেন একালের মেয়ে নয়। এমন ভালো আপনি মোটে দেখেন নি। কই তাকাও, তাকাও না—আচ্ছা, আমার দিকে তাকালেই হবে—আমার দিকে—হাঁ, এই যে—ভালো করে—

কোনোপ্রকারে একপলক চাহিয়াই কাতু ঘাড় গুঁজিল, যেন দুটা চোখের খোঁচা মারিল। ছোটবেলায় আর একদিন এই মেয়েটাই দুটা দাঁত বসাইয়া দিয়াছিল।

অবশেষে কাতু ছুটি পাইল। সঙ্গে সঙ্গে জনার্দন আসিলেন এবং আসিল লুচিসহযোগে সেই সন্দেশ ক্ষীরমোহন প্রভৃতি একখানি মাত্র রেকাবি বোঝাই হইয়া। দেখা গেল অবিনাশের উদরে আয়তনের অনুপাতে স্থানেরও প্রাচুর্য আছে। নবগোপাল উঠিল। জনার্দন কিছুতেই ছাড়িবেন না—শুভকর্মের মধ্যে এসে পড়লে, একটা পান খেয়ে যাও। কিন্তু নবগোপাল দাঁড়াইল না।

মোড়ে আসিয়া আধপয়সার পান কিনিল, ফিরিয়া ফিরিয়া জনার্দনের বাড়ির দিকে তাকাইতে লাগিল, দোক্তা লইল, আর একবার সুপারি চাহিয়া লইল, বোঁটার আগায় করিয়া একটুখানি চুনও লইল। শেষে ভকভক করিয়া অবিনাশের গাড়ি তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেলে সে বড়রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

আজ সকালে নবগোপালের মেসে একখানা লাল রঙের চিঠি আসিয়াছে—আগামী ২৪শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার আহিরিটোলা-নিবাসী ৺পীতাম্বর দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান অবিনাশচন্দ্র দত্ত বাবাজীউর সহিত মদীয় কন্যা কল্যাণীয়া কাত্যায়নীর শুভবিবাহ হইবেক। মহাশয় সানুগ্রহে উক্ত দিবস ইত্যাদি। চিঠি পড়িয়া নবগোপালের মনে হইল, তাহার কর্তব্যচ্যুতি ঘটিয়াছে, শুভকর্মের কতদূর কি হইল এ কয়দিনের মধ্যে একবার সন্ধান লওয়া উচিত ছিল।

বিকালে বেড়াইতে বেড়াইতে নেবুতলা গেল। জনার্দনের সঙ্গে দেখা হইল না, তিনি হোগলার মেরাপ বাঁধিবার বায়না দিতে গিয়াছেন। কাতুকে ডাকিয়া এক গ্লাস জল চাহিল। জল খাইতে খাইতে নবগোপাল কহিল—তোর ভাগ্যি ভালো রে কাতু, অবিনাশের বউ হচ্ছিস—শুনেছিস তো কত বড়লোক, শুনিস নি আবার! শ্বশুরবাড়ির কথা চুরি করে সব শুনেছিস। সত্যি, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

কাতু গেলাস লইয়া চলিয়া যাইতেছিল, নবগোপাল আবার বলিল—তোর বিয়ের পদ্য ছাপাব, আজ দুপুরে লিখে ফেলেছি, এইসা হয়েছে—

কাতু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—সত্যি নাকি? ভালো হয়েছে?

—খুব ভালো হয়েছে—হবে না কেন? প্রাণের ভেতর থেকে এসেছে কি-না! তুই তো পর নোস—

কাতু হাসিয়া কহিল—পর নই, আপনার?

—বড্ড আপনার রে! আচ্ছা শুনে দেখ—পকেটেই আছে। পকেট হইতে পদ্য বাহির করিয়া সে পড়িতে লাগিল। সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর বিষয় উল্লেখ করিয়া স্বামী শ্বশুর-শাশুড়ি পরিজন স্বধর্ম স্বদেশ প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুর প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া অবশেষে নবদম্পতির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করা হইয়াছে, কোনো বিষয়ে আর খুঁত ধরিবার জো নেই।

পড়া শেষ করিয়া নবগোপাল সগর্বে কহিল—কেমন হয়েছে? বল তো এবার, লজ্জা করিস নে—

—না, লজ্জা করব না, দেখি—বলিয়া কাতু কবিতাটি লইয়া কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। ছিঁড়িয়া নির্বাকভাবে চলিয়া যাইতেছিল। নবগোপাল প্রথমটা হতভম্ব হইয়া গেল; তারপর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—ছিঁড়লে যে বড়! কেন আমার কবিতা ছিঁড়লে—কেন?

কাতু শান্তভাবে কহিল—তুমি ছাইভস্ম লিখবে কেন? আমাদের যে শুনে ঘেন্না ধরে যায়—

নবগোপাল কহিল—আমি ছাইভস্ম লিখি?

—লেখই তো। তুমি যদি পদ্য ছাপাও আমি গলায় দড়ি দেব। কী করেছি আমি তোমার? বলিয়া কান্না চাপিতে চাপিতে কাতু ছুটিয়া পলাইল।

কবিতার নিন্দা করিলে নবগোপাল ক্ষমা করে না। সে সাব্যস্ত করিয়াছে, কাতুর বিয়েয় সে যাইবে না। না যাক, তাহাতে শুভকর্ম আটকাইয়া থাকিবে না। তোমরা যদি বিয়ে দেখিতে চাও, ২৪শে সন্ধ্যার পর নেবুতলা লেনে ঢুকিয়া পড়িও, মিষ্টান্ন মিলিবে। নম্বরটা ভুলিয়া গিয়াছি, জামরুল-গাছ-ওয়ালা সাদা বাড়ি—দেখিলেই চিনিতে পারিবে।

পিছনের হাতছানি

বড় ছেলেটির কিছু হইল না, মেজটির কিন্তু পড়াশুনায় চাড় খুব। সারা সকাল বন্ধুদের বাড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া কলেজের নোট সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। বন্ধুচক্রের পরিধিও বড় কম নয়—সেই টালিগঞ্জ-বেহালা ইস্তক। ফিরিতে এগারোটা বাজিয়া যায়। ইহাতেও বোধকরি সময়ে কুলাইয়া উঠে না। তাই ইদানীং মায়ের কাছে একটা মোটর-সাইকেলের ফরমায়েশ হইয়াছে।

গিন্নি আসিয়া কহিল—শুনছ গো, একটা বিশেষ কথা আছে—

গিরিজার এমন হইয়াছে যে ভূমিকা শুনিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারে, কথা খুলিয়া বলিতে হয় না। সে বাড়ির কর্তা সন্দেহ নাই, কিন্তু মা ও ছেলেরা মিলিয়াই খাসা কাজকর্ম চালাইয়া যায়, তাহাকে দরকার পড়ে না। কেবল যা মধ্যে মধ্যে এই প্রকার বিশেষ কথা শুনিতে হয়। কারণ, আবশ্যকমাত্রই টাকা বাহির করিয়া দেওয়া—ইহার অত্যাশ্চর্য কৌশলটি একমাত্র তাহারই জানা আছে।

অতএব কথাটি শুনিতে হইল। শুনিয়া গিরিজা ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিল—সুমতি, শ্রীমানদের পায়ে হাত দিতে বলি নে, তবু একবার তাকিয়ে যেন দেখে তাদের বাপের পায়ে এই এখানে কতগুলো কাটাখোঁচার দাগ।

সুমতি হাসিমুখে কহিল—তোমার সঙ্গে ওদের তুলনা? তুমি ছিলে কি লোকের ছেলে, আর ওদের বাপ কত বড়লোক!

—তা বটে! বলিয়া গিরিজাও একটু ম্লানভাবে হাসিল। বলিল—দেখো নীলগঞ্জের ইস্কুল ছিল আমার মামাবাড়ি থেকে পাকা দুই ক্রোশ—

সুমতি হাত-মুখ নাড়িয়া বাধা দিয়া বলিল—আবার সেই সাতকাণ্ড রামায়ণ শুরু করবে নাকি এখন? রক্ষে করো মশাই, আমি চলে যাচ্ছি—আমার ঢের কাজ—

ছোট মেয়ে মিনা কুকুর-বাচ্চাটাকে কোলে লইয়া এতক্ষণ বিস্কুট খাওয়াইতেছিল। সে-ও উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—মা, গাড়ি বের করতে বলি? আজ কিন্তু একঝুড়ি ফুল চাই আমার, আজকে পুতুলের বিয়ে—

গিরিজার একটা নিশ্বাস পড়িল। ইহারা কেহই তাহার সে ইতিহাস শুনিতে চায় না। তার বয়স পঞ্চাশের কোঠা পার হইয়া গিয়াছে। এক অখ্যাত পাড়াগাঁয়ে আনন্দ ও অশ্রুজলে নিষিক্ত জীবনের কতকগুলি দিন

হেলা-ফেলায় ছড়াইয়া রাখিয়া আসিয়াছে। এখন বার্ধক্যের সীমায় আসিয়া মুখ ফিরাইয়া তাহাদের হয়তো মাঝে মাঝে দেখিতে ইচ্ছা করে। সত্যই তো! তার নিজের ভালো লাগে বলিয়া যাহাদের সে বয়স নয় তাহাদের ভালো লাগিবে কেন? তার উপর কাহিনীটা একেবারেই ঘরে ঘরে যে রকম ঘটিয়া থাকে, তাই—

অর্থাৎ কচি ছেলে ও বিধবাকে রাখিয়া গিরিজার বাবা মারা গেলেন—দয়া করিয়া কোনো অবিবাহিতা মেয়ে রাখিয়া যান নাই। দেনায় ভিটা বিক্রি হইল। গিরিজার মা ছেলে লইয়া ভূষণডাঙায় ভাইয়ের বাড়ি উঠিলেন। ভাই সীতানাথবাবুর বাড়ি গোমস্তাগিরি করিতেন। সীতানাথ ঐ গ্রামেরই—গ্রাম সুবাদে ওঁদের সকলের দাদা। অবস্থা ভালো, মানে চার গোলা ধান, খেত-খামার ও মোটা সুদে টাকা-দাদনের কারবার। গিরিজা মামার বাড়ি থাকিয়া দুই ক্রোশ দূরের নীলগঞ্জের বড়-ইস্কুলে পড়িত। শীতকালে আসন্ন সন্ধ্যায় ইস্কুল হইতে ফিরিবার পথে খেজুরগাছের মাথায় চড়িয়া ভাঁড়ের মধ্যে পাকাটি দিয়া খেজুর-রস চুরি করিয়া খাইত। ইস্কুলের সেকেণ্ড-পণ্ডিত মহাশয় ব্যাকরণের একটা শব্দরূপ খাতায় পাঁচবার লিখিতে হুকুম দিয়া টেবিলে মাথা হেলাইয়া নাক-ডাকা শুরু করিতেন, পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ঘণ্টার মধ্যে পাঁচবার লেখা সারা করিয়া কেহ যে তাঁহাকে দেখাইতে আসিবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। অতএব নিদ্রাটা বেশ নিরুপদ্রবে ঘটিত। গিরিজা সেই ফাঁকে ইস্কুল পলাইয়া খাল পার হইয়া চরের খেতের মটরশুঁটি আনিয়া ইচ্ছামতো ভোগ-বিতরণ করিত। এমনি করিয়া তাহার বয়স বাড়িয়া চলিল, লেখাপড়া যে কতদূর বাড়িয়াছে তাহাতে প্রবীণেরা সন্দেহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু একদা সমস্ত গ্রামটিকে সচকিত করিয়া সে পাশ করিয়া ফেলিল তৃতীয় বিভাগে।···

গিন্নি কাপড়-চোপড় পরিয়া বাহির হইবার মুখে আর-একবার হানা দিয়া গেলেন।—ওগো, ছেলেটা যখন ধরেছে, দিয়ে দাওগে—বুঝলে? বলিতে বলিতে নামিয়া গেলেন।

বেয়ারা আসিয়া সকালের ডাক রাখিয়া গেল। একখানা অমৃতবাজার পত্রিকা, খান দুই-তিন ক্যাটালগ ও একগাদা চিঠি। চিঠিগুলির উপরে নানা ফার্মের নাম ছাপানো আছে, অতএব ভিতরের বৃত্তান্ত না খুলিয়াও বলা চলে। কেবল একখানিতে সে-সব কিছু নাই। গিরিজা খুলিয়া দেখিয়া অবাক! মনোরমা লিখিয়াছে।

মেয়েলি হাতের গোটা গোটা অক্ষর, কাটাকুটি ও বানান-ভুলের অন্ত নাই। মুসাবিদা যাহারই হোক, হরফগুলি সেই মনোরমার আদি ও অকৃত্রিম। কিন্তু ইংরাজিতে বাহিরের ঠিকানা লিখিয়াছে বোধকরি নীলমণি—মনোরমার স্বামী।

অসংখ্য প্রণতিপুরঃসর নিবেদন করিয়াছে—

> দাদা, এই গরিব ভগ্নীটিকে বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন। মনোরমা বলিয়া যদি চিনিতে না পারেন, ঘোষেদের পুঁটির কথা আশা করি মনে পড়িবে। আজ তিন বৎসর হইল পিতাঠাকুর মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন—

এই মনোরমা ভূষণডাঙার সীতানাথবাবুর মেয়ে—গিরিজার মামা যাহার চাকরি করিতেন। সীতানাথ মারা গিয়াছেন। পাকা দাড়ি, মাথায় টাক—তিনি গিরিজাকে বড় ভালোবাসিতেন। পাশের খবর বাহির হইলে নিমন্ত্রণ করিয়া পুকুর হইতে মাছ ধরাইয়া কাতলা মাছের মস্ত মাথাটা তাহার পাতে দিয়াছিলেন। আর আদর-আপ্যায়ন যে কত, যেন ভূ-ভারতে এণ্ট্রান্স পাশ আর কেহ করে নাই!

> —পিতাঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতে যে কি দুর্দিন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আর কি লিখিব। গত বৎসর বন্যায় চিতলমারির বাঁধাল ভাসিয়া যায়, ফলে ধানের এক চিটাও গোলায় উঠে নাই। আগের বৎসরের যাহা ছিল, তাহাতে কোনো গতিকে সংসার চলিতেছে। আপনার ভগ্নীপতিকে কতদিন হইতে সকলে মিলিয়া বলিতেছি যে ভদ্রলোকের ছেলের চাষবাস করিয়া পোষায় না, কলিকাতায় গিয়া চাকরি-বাকরি কর, কিন্তু এমন অবুঝ মানুষ কখন দেখি নাই। দুঃখের কথা আর কি লিখিব, মেজ খোকা ও ছোট খুকি আজ তিন মাসের বেশি ভুগিয়া ভুগিয়া অস্থিচর্মসার হইয়াছে, গঞ্জের ডাক্তার ডাকিয়া যে তাহাদের একবার দেখাইব এমন পয়সা নাই। অবশেষে উনি রাজি হইয়াছেন। জোত-জমি মোড়লদের সহিত ভাগ-বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া উনি আপনার কাছে যাইতেছেন। অতি সত্বর একটা চাকরি ঠিক করিয়া দিবেন, অন্যথা না হয়। শুনিলাম, আপনি খুব বড় একটা আপিসের বড়বাবু—সাহেবরা আপনার মুঠার মধ্যে। যেমন করিয়া পারেন, আপনার আপিসে ঢুকাইয়া লইবেন। ও বাড়ির সকলে কেমন আছেন তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।
>
> প্রণতা—শ্রীমনোরমা মিত্র

পুনশ্চ করিয়া লিখিয়াছে—

> আগামী পরশ্ব সোমবার সকালেই উনি আপনার বাসায় পৌঁছিবেন। অবিলম্বে একটা চাকরি করিয়া না দিলে আমি তিনটি ছেলেমেয়ে লইয়া ভিটায় শুকাইয়া মরিব, আর উপায় নাই।

অর্থাৎ নীলমণির আগমন হইতেছে এবং যদি বাড়ি হইতে বাহির হইবার পথে হাঁচি-টিকটিকির কোনো উপদ্রব না ঘটিয়া থাকে, মেজ খোকা ও ছোট খুকি নূতন কোনো গোলযোগ বাধাইয়া না বসে, তাহা হইলে মেলগাড়িতে সারারাত্রি জাগিয়া চোখ লাল ও গুঁড়া-কয়লায় সর্বাঙ্গ বোঝাই করিয়া এখনই এই বাড়িতে দর্শন দিবেন।

গিরিজার মনে পড়িয়া গেল, একটা সুযোগ আছে বটে। আজকালের মধ্যেই তার অফিসের হেড ক্লার্ক বাবু তিন মাসের লম্বা ছুটি লইয়া শরীর মেরামত করিতে পশ্চিমে যাইতেছেন। সেকেণ্ড ক্লার্ক তাঁর জায়গায় কাজ করিবেন। তাহা হইলে মাস তিনেকের জন্য আপাতত নীলমণিকে ঢুকাইয়া লওয়া যায়।

নীলমণির কপাল ভালো এবং গিরিজারও। কারণ, চাকরি না হইলে কতদিন যে এই বাসায় পড়িয়া অন্ন ধ্বংস করিত, বলা যায় না। পুঁটির স্বামীকে তো তাড়াইয়া দেওয়া যায় না!

পুঁটির নাম করিলেই কেন জানি না মনে আসে, কোথায় কবে সে একটা ছবি দেখিয়াছিল একটা লাউয়ের দুটা ঠ্যাং গজাইয়াছে—সেই ছবির কথা। লাউটি যেন গুটি-গুটি পা ফেলিয়া তাহার মামার নোটের খেতে শাক তুলিয়া বেড়াইত। কিন্তু আজ আর সে পুঁটি নাই—মনোরমা হইয়াছে এবং তিনটি ছেলেমেয়ের মা!

ঘরটা কেমন আঁধার-আঁধার ঠেকিতেছিল, গিরিজা উঠিয়া পুবের জানালাটা খুলিয়া দিল। সামনে একটা চারতলা বাড়ি দৃষ্টি আড়াল করিয়া খাড়া রহিয়াছে। বাড়ির পাশ দিয়া সরু গলি। গলির মাথায় একটুখানি ফাঁকা জমি, তাহাতে ক-টা নারিকেল গাছ। সকালের আলোয় গাছের পাতাগুলি ঝিলমিল করিয়া নড়িতেছে।

অনেকদিন—পুঁটির বিয়ের পর গিরিজা আর মামার বাড়ি যায় নাই। তারপর বয়স কতখানি ভাঁটাইয়া গিয়াছে—পুঁটিরও গিয়াছে। গিরিজা হালকা লোক নয়, ইদানীং কাজকর্ম করিয়াই সময় পায় না, কলিকাতার বাহিরে যে জীবজগৎ আছে এবং তাহার সঙ্গে ঐ জগতের একদিন যে নিবিড় পরিচয় ছিল, তাহা প্রায়ই ভুলিয়া বসিয়া থাকে। তবু পুঁটির সব কথা স্পষ্ট মনে পড়িল। সেই যে শ্যামল ছোট মেয়েটা রুক্ষ চুলের বোঝা কস্তাপেড়ে শাড়ির আঁচল এবং কালো ডাগর চোখ নাচাইয়া যেখানে সেখানে পাড়াময়

ঘুরিয়া বেড়াইত—সে আজ গৃহিণী হইয়াছে, বড় কলসি কাঁখে করিয়া দীঘির ঘাটে জল আনিতে যায়, ধান ভানে, ছেলেমেয়ের খবরদারি করে, হয়তো বড় জ্বালাতন হইলে ছেলে ঠেঙাইয়া আবার নিজেই কাঁদিতে বসে, কোন্দল করে, সারারাত জাগিয়া রোগা ছোট মেয়েটিকে বাতাস করে—এবং সেই পুঁটি আজ লিখিয়াছে, গিরিজা চাকরির যোগাড় করিয়া না দিলে তাহারা ভিটায় শুকাইয়া মরিবে।…

নিচে বাথরুমের কাছে অকস্মাৎ ভয়ানক রকমের বীররসের শুরু হইল, অর্থাৎ এতক্ষণে বড় ছেলের ঘুম ভাঙিয়াছে। আশ্চর্য নয়, রামায়ণে লেখা আছে—কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙিলে নাকি ত্রিভুবনসুদ্ধ কাঁপিত।

আর ভূষণডাঙায় এখন হয়তো গোবর-নিকানো কাঁচা দাওয়ার উপর চাটাই পাতিয়া বসিয়া মনোরমার ছেলে দুলিয়া দুলিয়া পড়া মুখস্থ করিতেছে, ঘুনশিতে বাঁধা গলার একরাশ নানা আকারের মাদুলি সঙ্গে সঙ্গে দুলিতেছে। মনোরমা খালের ঘাটে সেই বাঁকা তালগাছটার গুড়িতে বসিয়া মাজন দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া কড়াই মাজিতেছে। তালগাছটা কি এতদিন বাঁচিয়া আছে? কবে উপড়াইয়া খালে পড়িয়া গিয়াছে, তার ঠিক নাই। একদিন কচি-তাল কাটিতে গিয়া ঐ গাছের বাগুড়ায় পা হড়কাইয়া গিরিজা পড়িয়া গিয়াছিল। খালের জলে পড়িয়াছিল বলিয়া লাগে নাই, কিন্তু পুঁটি বাড়িতে তার মাকে বলিয়া দিয়া মার খাওয়াইয়াছিল।…নীলমণিকে চাকরি করিয়া দিতেই হইবে। পুঁটি লিখিয়াছে, পুঁটি তার পর নয়। ঐ পুঁটির সঙ্গে একটা বড় সম্পর্ক ঘটিতে ঘটিতে বড় বাঁচিয়া গিয়াছে। সেটা গিরিজার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়।

গিরিজার পাশের খবর আসিল এবং সীতানাথ নিমন্ত্রণ করিয়া কাতলা মাছের মুড়া খাওয়াইলেন। সেই দিন সন্ধ্যায় মামা মায়ের সঙ্গে তার বিয়ের কথা বলিতেছেন। নিজের বিয়ের প্রসঙ্গ কে না শুনিতে চায়? গিরিজাও চুরি করিয়া শুনিল। সীতানাথবাবু বড় ধরিয়াছেন, তাঁহার ছেলে নাই, ভিটায় প্রদীপ জ্বলিবে না, সেই আশঙ্কায় পুঁটিকে গিরিজার হাতে সমর্পণ করিয়া তাকে ঘরজামাই করিয়া রাখিতে চান। মামা সীতানাথের নানাবিধ আয়ের বিস্তৃত ফিরিস্তি দিয়া গিরিজা যে কতদূর সুখে থাকিবে উৎফুল্ল মুখে তাহার পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন। ম্লান দীপালোকে মায়ের মুখ-ভাবটা ঠিক ঠাহর হইতেছিল না, তিনিও বোধকরি বিমুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন —কিন্তু সে ঘরজামাই হইবে এবং পুঁটি তাহার বউ হইবে, কোনোটাই

গিরিজার ভালো লাগিল না। আলো জ্বালাইয়া ঢোল ও সানাই বাজাইয়া পালকি চড়িয়া ক্রোশের পর ক্রোশ মাঠ বাঁওড় ধানখেত ও বাঁশবাগান পার হইয়া এক নূতন গ্রামে যাইবে, তারপর শুভদৃষ্টির সময়ে একখানি খাসা টুক-টুকে মুখ দেখিবে যাহাকে সে আর কোনোদিন দেখে নাই। সে কেমন মজা! আর এই পুঁটি লালচেলিতে সর্বাঙ্গ মুড়িয়া জবুথবু হইয়া তাহার পাশে দাঁড়াইবে একথা ভাবিতেই হাসি পায়।

পরদিন সকালবেলা রথখোলার গাছে চড়িয়া সে জামরুল খাইতেছিল, দেখিল পুঁটি চলিয়াছে। ডাকিল—এই দাঁড়া। পুঁটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল—না, দাঁড়াবার কি জো আছে, আজ যে আমার ছেলের সঙ্গে চারুর মেয়ের বিয়ে। কালা-দার কাছে যাচ্ছি, কলার খোলার পালকি করে দেবে বলেছে···ও গিরি-দা, দুটো ভালো জামরুল ছুঁড়ে দাও না—

বলিয়া পুঁটি লোলুপ চোখে গাছটির দিকে চাহিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

গিরিজা ভাবী বধূর সঙ্গে প্রেম-সম্ভাষণ শুরু করিল—তোকে ছাই দেব মুখপুড়ি, দাঁড়াতে বললাম—তা নয় ফরফরিয়ে চললেন কালার কাছে। যাক না এই ক-টা মাস—আসুক অঘ্রান, তারপরে দেখে নেব। তখন কালার কাছে গেলে ধরব চুলের মুঠি—

পুঁটি রাগিয়া বলিল—সক্কালবেলা গাল-মন্দ কোরো না বলছি। জেঠাই-মাকে যদি না বলে দিই—

গিরিজা নিরুদ্বেগ কণ্ঠে কহিল—বলগে যা। তাতে আর কিছু হচ্ছে না মণি। বাড়িতে শুনে দেখিস—তোর সঙ্গে আমার বিয়ে। আগে হয়ে যাক, মজাটা টের পাবি। তখন কথার উপর জবাব করলে পিঠের উপর তিন কিল—

বলিয়া গাছের উপর হইতেই উদ্দেশে শূন্যে মুষ্টি সঞ্চালন করিল।

এই নিদারুণ সম্ভাবনার কথা শুনিয়া পুঁটির মুখখানা কেমন হইয়া গেল, আর ঝগড়া করিতে জোর পাইল না। তবু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মুখ ঘুরাইয়া বলিল—ধ্যেৎ!

—সত্যি কিনা বুঝতে পারবি তখন। নে—নে—আর দেমাক করে চলে যায় না, এই কটা নিয়ে যা। সে কয়েকটা জামরুল ছুঁড়িয়া দিল। কিন্তু পুঁটি লইল না।

গিরিজা ভাবিল, বিবাহ করিলে পুঁটিটাকে কিন্তু খুব জব্দ করা যায়।

সেদিন ছিপ তৈরির সময় একটু ধরিয়া দিতে বলিয়াছিল, তা মুখের উপর না বলিয়া চলিয়া গেল। আর একদিন পুঁটির মার তাস চুরি করিয়া ঢেঁকিশালে বসিয়া কজনে খেলিতেছিল। একখানা পঞ্জা হয় হয়, আর সেই সময় কিনা পুঁটি মাকে ডাকিয়া আনিয়া বকুনি খাওয়াইয়া তাস কাড়িয়া লইয়া চলিয়া গেল! কিন্তু বউ হইলে এ সকল চলিবে না, তখন গিরিজা যা বলে তাই করিতে হইবে এবং যাহার কাছে নালিশ করুক গিরিজাই হইবে হাইকোর্ট। আর তখন পুঁটিদের দক্ষিণের ঘরে তক্তাপোশের উপর বসিয়া সকলের সামনে শাশুড়ির ঐ তাস লইয়া সে বিন্তি খেলা করিবে তবে ছাড়িবে।

কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসে সুপারি-কাটা হইতে আরম্ভ করিয়া কানের বাজু কণ্ঠমালা সমস্তই গড়ানো সারা, তবু বিবাহ হইল না। নূতন ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, আগের দিন সীতানাথের স্ত্রী আসন্ন শুভকার্যের খরচের জন্য অনেক রাত্রি অবধি চিঁড়া কুটিলেন। পরদিন আর উঠিতে পারিলেন না, বুকে বড় ব্যথা। এবং একুশ দিনের দিন পাড়ার সকলে তাঁহার মাথা ভরিয়া সিঁদুর ও দুই পায়ে আলতা পরাইয়া চিতায় তুলিয়া দিয়া আসিল। শুভকর্মে বাধা পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে গিরিজা এক দূরসম্পর্কীয় পিসে মহাশয়ের সঙ্গে চাকরি করিতে কলিকাতায় গেল। মাস দুই উমেদারি করিয়া চাকরি জুটিল—এক মার্চেণ্ট অফিসে বিল-সরকারি। কয়েক মাস পরে ইহা ছাড়িয়া দিয়া কাঁকিনাড়ায় একটা পাটকলে ঢুকিল, কুলিদের হাজিরা লিখিবার কাজ। চাকরিটা ভালো—দু-চার পয়সা উপরি আছে। তাহার পর তিরিশ বছর উপরওয়ালার মন ভিজাইবার নানা কৌশল আয়ত্ত করিয়া আজ সেখানকার বড়বাবু হইয়াছে।

চাকরির প্রথম কয়েক বছর মা ভাইয়ের বাড়িতেই ছিলেন এবং গিরিজার ভূষণডাঙায় যাতায়াত ছিল। একবার পূজার সময় সীতানাথ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—আর কেন বাবা পরের গোলামি করে শরীরের এই হাল করছ? আয়না ধরে দেখো তো কি দশা হয়েছে! আফিসের খাটনি কি সোজা? তুমি বরঞ্চ এই মরসুম থেকে খেতের কাজ দেখো। বুড়ো হয়েছি, আর পেরে উঠি নে। যা কিছু খুদ-কুঁড়ো আছে তোমরা বুঝে-সুজে নাও। গড়িমসি করে ক-বছর কেটে গেল, এবারে আর দুহাত এক না করে ছাড়ছি নে।

গিরিজা জবাব দেয় নাই, ঘাড় নিচু করিয়া হবু-জামাইদের যেমনটি হইতে হয়, তেমনি ভাবে চলিয়া গেল। কিন্তু ঐ যে ঠায় রৌদ্রে তেপান্তরের মাঠের

মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়া খেতের মাটি উপযুক্তরূপ গুঁড়ানো হইল কি না এবং আরও কত বোঝা সার উহাতে ঢালিতে হইবে—এই সব তদারক করিয়া বেড়ানো মোটেই ভদ্রতাসঙ্গত বলিয়া ঠেকিল না।

একটু পরে সে রান্নাঘরের মধ্যে পুঁটিকে আবিষ্কার করিয়া বলিল—পুঁটি, একটু চা করে দে না লক্ষ্মীটি। পুঁটির বয়স বাড়িয়াছে, চোখের তারা একটু বেশি স্থির ও যেন বেশি কালো হইয়াছে। সে খাসা চা তৈয়ারি করে।

পুঁটি চা করিতে লাগিল। গিরিজা কলিকাতার গল্প শুরু করিল। শহরের গল্প শুনিতে পুঁটির বড় ভালো লাগে। সেখানে রেড়ির তেল দিয়া প্রদীপ জ্বালাইতে হয় না, কল টিপিলেই আপনি জ্বলিয়া উঠে। আকাশে যে ঝিলিক মারে উহাকে সাহেবেরা তারের ভিতর পুরিয়া রাখিয়াছে, বড় বড় গাড়ি ঐ তার ছুঁইয়াছে কি গড়গড় করিয়া চলিতে থাকে। সকল কথা পুঁটি বিশ্বাস করে না। তবে চিড়িয়াখানা ও বায়োস্কোপ তাহার বড় দেখিতে ইচ্ছা করে। বর্ণ-পরিচয় যখন তাহার শেষ হইল তখন প্রথম পাতার নিচে বানান করিয়া দেখিল লেখা আছে কলিকাতা। তারপর সে পড়িয়াছে—শিশুশিক্ষা, পাক-প্রণালী, মহাভারত, কঙ্কাবতী, কুণ্ডলতার মনের কথা—কত বই! সব বইয়ে সেই এক জায়গার নাম দেখিয়াছে, কলিকাতা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বইওয়ালা কলিকাতায় বসিয়া বই তৈয়ারি করে। কলিকাতা শহরটা তার বড় দেখিতে ইচ্ছা করে। ফস করিয়া বলিল—আমাকে একবার নিয়ে যাবেন কলিকাতায়?

গিরিজা তাহার দিকে একটুখানি চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল—যাবই তো। বাধা পড়ে গেল যে—নইলে এতদিন কোন কালে নিয়ে যেতাম—

গিরিজার হাসি দেখিয়া পুঁটির খেয়াল হইল। সে লজ্জায় মরিয়া গেল—আর কথা না কহিয়া চা করিয়া দিয়া ওঘরে চলিয়া গেল।

মাস কয়েক পরে সীতানাথ সদম্ভে একদিন চাটুজ্জের আটচালায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—খেপেছ দাদা, ঐ চটকলের কুলির হাতে মেয়ে দেব আমি? কাজ তো কুলির সর্দার, ইজ্জতের সীমা নেই! কুলিরা হপ্তাভোর খেটে যা রোজ পাবে, তার উপর ভাগ বসানো—ও চাকরি ক-দিন? যেদিন সাহেবেরা টের পাবে গলাধাক্কা দিয়ে দূর করে দেবে।...আমি ঐ নীলমণির সঙ্গে কথা পাকা করলাম। খাসা ছেলে, মুখে কথাটি নেই। পাশ-টাশ নাই বা করেছে, পাশ করেই বা কে কি করছে—

তিন-চার দিনের মধ্যেই সীতানাথের উষ্মার হেতুটা সকলের কাছে প্রকাশ পাইয়া গেল। গিরিজা কাহাকেও কিছু না জানাইয়া বিবাহ করিয়া বসিয়াছে। কি করিয়া কবে যে সুমতির সঙ্গে এই বিবাহের আয়োজন শুরু, তাহা সে-ই বলিতে পারে। গিরিজা শুনিয়াছিল, সুমতি শহুরে মেয়ে, চালাক চতুর, আবার ইংরাজি পড়িয়াছে। তাহার প্রমাণ পাইতেও দেরি হইল না। ফুলশয্যার রাত্রিতে আর উৎকণ্ঠা দমন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সুমতি, তুমি ইংরাজি জান? সুমতি বলিল—না। গিরিজা দমিয়া গিয়া বলিল—সে কি? শুনলাম তুমি ন্যাড়াগির্জে মেয়েদের ইস্কুলে পড়েছ। সুমতি কহিল—ফার্স্ট বুকের খানিকটা পড়েছিলাম, তা কিচ্ছু মনে নেই। গিরিজা বলিল—মনে নেই? কখ্‌খনো নয়, ও তোমার দুষ্টুমি। আচ্ছা বল তো দি র‍্যাম মানে কি? সুমতি একটুখানি ভাবিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া চুপি-চুপি বলিল—বর।

শুভক্ষণের বাক্য, মিথ্যা হইল না। সুমতি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিল, সেই প্রকারই ফলিয়া গিয়াছে। গিরিজার অবস্থা ভালো হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর বড়দরের আত্মীয়-স্বজন জুটিয়াছে। ঐ সবের সঙ্গে চলিবার কায়দা গিরিজা আজও দুরস্ত করিতে পারে নাই। কিন্তু সুমতি ভারি ভারি সিন্দুক ও আলমারির চাবিগুলি এবং ততোধিক ভারি আত্মীয়-সম্প্রদায় মায় গিরিজাকে পর্যন্ত অক্লেশে বহিয়া বেড়ায়। আজ পঞ্চাশের পারে পৌঁছিয়া সংসারের রথচক্রের বিরাট বহর দেখিয়া গিরিজা ঘাবড়াইয়া যায় এবং ভাবে, ভাগ্যিস মেষশিশুর মতো হাবা নিতান্ত আনাড়ি ঐ মনোরমার সঙ্গে তার বিয়ে হয় নাই!

সীতানাথবাবু পাটোয়ারী ব্যক্তি, মনে যাহাই থাকুক বাহিরে কোনো কাজে কাহারও খুঁত ধরিবার সাধ্য নাই। নীলমণির সঙ্গে বিবাহ সাব্যস্ত হইলে যথাসময়ে গিরিজার কাছে পোস্টকার্ডের চিঠি আসিল যে মনোরমা তাহার বোনের সামিল, অতএব গিরিজাকেই খাটিয়া-খুটিয়া শুভকর্মটি সুসম্পন্ন করিতে হইবে। গিরিজা অফিসের ছুটি করিয়া পতিব্রতা-মার্কা সিঁদুরকৌটা এবং একজোড়া গিনি সোনার শাঁখা কিনিয়া যথাসময়ে ভূষণডাঙায় পৌঁছিল। মামি-ঠাকরুন আর অকারণ বিলম্ব করিলেন না, সীতানাথ যে তাহাকে চট-কলের কুলি বলিয়াছেন—পৌঁছিবামাত্রই যথাসম্ভব গুছাইয়া বর্ণনা করিলেন এবং মন্তব্য করিলেন—ঐ কৌটায় সিঁদুর ভরিয়া না দিয়া বাসি উনান হইতে

বিনামূল্যের বস্তু-বিশেষ ভরতি করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু গিরিজা খুব খাটিল, আগাগোড়া পরিবেশন করিল, চেঁচাইয়া গলা ভাঙিল, নীলমণির মাথায় দইয়ের হাঁড়ি উপুড় করিয়া মাঘের রাত্রিতে তাহাকে নাওয়াইয়া তবে ছাড়িল।

খাটিয়া-খুটিয়া সকলে বিয়ে-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে শুইয়া পড়িয়াছে। ফরাসের উপর ঢালা বিছানা এবং গিরিজার ঠিক পাশেই তাহার মামা, তাঁহার বোধকরি একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। পাড়ার বউ-ঝিরা বিদায় লইয়াছেন, বাসরঘরে আর গণ্ডগোল নাই। বরের সঙ্গে পুঁটি কিরূপ প্রেমালাপ করিতেছে, সেটা গিরিজা একটু দেখিবার প্রয়োজন বোধ করিল। কিন্তু মামার নিদ্রাকে বিশ্বাস নাই। বুড়া বয়সে কাশির দোষ তো আছেই, তা ছাড়া রাত্রির মধ্যে অন্তত বার আষ্টেক তামাকের পিপাসা হয়। এখনই হয়তো টিকা ধরাইতে বসিবেন এবং পাশে গিরিজাকে না দেখিলে যতগুলি ভদ্রলোক এখানে ঘুমাইতেছেন সকলকে জাগাইয়া রীতিমত তদন্ত শুরু হইবে। গিরিজা মাথার বালিশটার উপর পাশবালিশটা শোয়াইল এবং পাশবালিশের আগাগোড়া লেপমুড়ি দিয়া খাট হইতে নামিয়া আসিল। নিচে মেজের উপর কখন আসিয়া শুইয়াছে ও-বাড়ির ছোকরা চাকর বনমালী। গিরিজা তাহা জানে না, অন্ধকারে তাহার ঘাড়ের উপর পা চাপাইয়া দিতেই সে হাউমাউ করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মাতুল মহাশয়ের ঘুম ভাঙিল এবং আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়া আরম্ভ করিলেন— কি! কি! কি! গিরিজা চট করিয়া মেজের উপর বসিয়া পড়িয়া বনমালীর মুখে হাত দিল। ব্যাপারটি বুঝিয়া ফেলিয়া বনমালী সামলাইয়া বলিল—কিছু নয়—একটা বেড়াল। হামাগুড়ি দিয়া গিরিজা বাহিরে আসিল। তারপর বাসরঘরের বেড়ার বাখারি ফাঁক করিয়া সমস্ত শীতের রাত্রি ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু পুঁটি চেলি জড়াইয়া ভৌগোলিক পৃথিবীর মতো গোলাকার হইয়া পড়িয়া ছিল। বেচারা নীলমণি চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। সোহাগ অভিমান ক্রোধ—মায় দোরের খিল খুলিয়া বাহির হইবার উপক্রম পর্যন্ত, কিন্তু তাহাতে অন্যপক্ষের চুড়িগাছি পর্যন্ত নড়িল না। হতোৎসাহ হইয়া অবশেষে নীলমণি নির্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিল। নীলমণির দুর্গতি দেখিয়া গিরিজা সেদিন খুব খুশি হইয়াছিল।

* নিচে অরগ্যান বাজিয়া উঠিল, গানের মাস্টার আসিয়াছেন। তৎসহ সঙ্গীত, মিনার গলা—‘রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি’। মিনারা তবে বেড়াইয়া

ফিরিয়াছে! গিরিজা ভাবিল, ওখানে গিয়া বলিয়া আসে—বাপু হে, তোমরা ছাত্রী-শিক্ষকে মিলিয়া যে কাণ্ডটা করিতেছ ওটা কি ঠিক বাঁশির আওয়াজের মতো হইতেছে, না হৈ-রৈ শব্দে কাহাকেও বাঁশ লইয়া তাড়াইয়া যাওয়া? টেবিলে আর যে চিঠিগুলা পড়িয়া ছিল, গিরিজা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

প্রথমখানি চিঠি নহে—ওরিয়েণ্টাল কিউরো শপের বিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রটি আবার কলারসিক। ঘর সাজাইবার জন্য তিনি একটি একহাতপ্রমাণ পাথরের নটরাজের মূর্তি কিনিয়াছেন। কণিষ্কের প্রপিতামহের আমলের মূর্তি—তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে—সে হিসাবে দাম খুব সস্তা, মোটে পঁচাত্তর টাকা। মূর্তিটির নাক নাই বলিয়া দাম কষিয়া বাদ দিয়া দাঁড়াইয়াছে একাত্তর টাকা পাঁচ আনা।

পরেরখানি জ্ঞানদায়িনী সভার সম্পাদক লিখিয়াছেন। চারি পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া অভিধানের প্রচুর জ্ঞান জাহির করিয়া গিরিজাকে বিবিধ বিশেষণে অভিহিত করণান্তর স্থূলকথাটি নিচে ব্যক্ত করিয়াছেন—কিঞ্চিৎ চাই।

তৃতীয়খানা নিতাইচাঁদ দাসের চিঠি। দাস মহাশয় বৈষ্ণব সজ্জন, ভাষাও বিনীত। সবিনয়ে জানাইয়াছেন—শতকরা মাত্র আঠারো টাকা সুদ ধরিয়াও হ্যাণ্ডনোট সুদে-আসলে অনেক দাঁড়াইয়াছে। সকাল বিকাল বাসায় আসিয়াও নিতান্ত দুরদৃষ্টবশত গিরিজার ধরা পাওয়া যায় না। গিরিজার ন্যায় মহৎ ব্যক্তি তাহার মতো কীটাণুকীটের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিয়া অক্লেশে এতদিন মিটাইয়া দিতে পারিতেন। তিন দিনের মধ্যে নিতান্তই যদি কোনো ব্যবস্থা না হয় তবে দাস মহাশয় অতীব দুঃখের সহিত আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

তার পরেরখানির উপরে ছাপা—দি গ্রেট বেঙ্গল মোটর ওয়ার্কস। পেট্রোলের দাম বাকি।

তারপর, ছক্কড়লাল ক্ষেত্রি—

অতঃপর, পি. মুদেলিয়ার এণ্ড কোং—

অন্যান্যগুলি গিরিজা আর পড়িল না। এইসব চিঠি পড়িয়া ইদানীং তাহার আর উদ্বেগ-আশঙ্কা হয় না। আজ বছর পাঁচেক ধরিয়া দিনের পর দিন এমনই আসিয়া থাকে, তাহাতে নূতন কিছু নাই। চিঠিগুলি ব্লটিং-প্যাডের উপর হইতে ঠেলিয়া রাখিয়া মনোরমার চিঠিখানি সে আর-একবার পড়িল।

পড়িতে পড়িতে দুঃখ হইল, আজ সীতানাথবাবু যে বাঁচিয়া নাই! থাকিলে

দেখিতে পাইতেন, চটকলের কুলি বলিয়া একদিন যাহাকে গালি দিয়াছিলেন, তাহার কাছে তাঁর মেয়ে কত করিয়া চিঠি দিয়াছে। ইচ্ছা করিলে সে অক্লেশে নীলমণির চাকরি করিয়া দিতে পারে। আর যদি তাহাকে তাড়াইয়া দেয়, তবে নীলমণি গ্রামের ভিটায় ফিরিয়া মনোরমার সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া অনাহারে শুকাইবে।

আবার সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হইল, সীতানাথ বাঁচিয়া থাকিলে অবশ্য চমৎকার হইত—কিন্তু তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে এবং আশঙ্কার বিষয় স্বর্গ হইতে নাকি সর্বত্র নজর চলে। এই যে চিঠির গোছা গিরিজা একপাশে ঠেলিয়া রাখিল—কলিকাতা শহরের কত লোকের সঙ্গে তাহার আনাগোনা, কেহই ইহার খবর রাখে না। কিন্তু এগুলি সেই স্বর্গীয় পাটোয়ারি ব্যক্তিটির নজর এড়াইতে পারিয়াছে তো?

গিরিজা তখন খুব ছোট, একদিন কি খেয়াল চাপিয়াছিল—তার ছোট রাঙা ছাতাটা মাথায় দিয়া হনহন করিয়া বড় রাস্তা দিয়া গঞ্জমুখো চলিয়াছিল। মা পিছন হইতে ডাকিতেছিলেন—ও খোকা, যাস নে—ফিরে আয়, ফিরে আয়। খোকা শুনিল না, এক-একবার পিছন ফিরিয়া মায়ের দিকে তাকায়, হাসে, আরো জোরে জোরে চলে। তারপর মা ছুটিয়া আসিয়া তাকে কোলে করিয়া ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। ঘটনাটা কিছুই নয়, ভূষণডাঙার কথা ভাবিতে এমনই মনে পড়িয়া গেল যে তাহার মা বাঁচিয়া নাই।

সেই গ্রামটিকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। এখন যাহারা খালে ছিপ-বড়শিতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, কেহই গিরিজাকে চিনিতে পারিবে না। আর এই বুড়া বয়সে সে যদি তলতাবাঁশের ছিপ কাটিয়া খালের পাড়ে তাহাদের পাশে বসিতে যায়—কেবল হাস্যকর নহে, এখনই ছক্কড়লাল-নিমাইচাঁদ-সুমতি-কোম্পানি ব্যাপারটি রীতিমত মর্মান্তিক করিয়া তুলিবেন। গত বৎসর গিরিজার নিউমোনিয়া হইয়াছিল। বড় বড় ডাক্তার ডাকিয়া এবং বিস্তর তদ্বির করিয়া সুমতি ও পুত্রকন্যারা তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছিল—বোধকরি তাহার অভাবে বাসাখরচের অসুবিধা ঘটিবে এই আশঙ্কায়। যমালয়ে পলাইয়াও যে স্বস্তি পাইবে সে পথ ইহারা মারিয়া রাখিয়াছে। মা বাঁচিয়া থাকিলে এবার একবার ভূষণডাঙায় বেড়াইয়া আসিত। মনোরমার বিয়ের পর আর ওদিকে যাওয়া ঘটে নাই।

মনোরমার বিয়ের পরদিন গিরিজা সকাল সকাল খাইয়া ট্রেন ধরিবার জন্য

ছুটিতেছিল। বিলের প্রান্তে আমবাগানের সরু পথে আসিয়া পড়িয়াছে, এমন সময় পিছনে গ্রামের মধ্যে বাসি-বিয়ের সানাই বাজিয়া উঠিল। বিলের মধ্যে পড়িয়া আর শুনা গেল না। এই সমস্ত গিরিজা ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ কত বৎসর পরে যৌবন পার হইয়া আসিয়া মনোরমার চিঠির সঙ্গে যেন সেই সানাইয়ের একটুখানি সুর কানের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুঁটির সঙ্গে যখন তার বিয়ের কথা চলিতেছিল, পুঁটি বলিয়াছিল—আমাকে নিয়ে যাবেন কলকাতায়? আর সে জবাব দিয়াছিল—যাবই তো। আজ যদি জীবনের সেই মোহনায় ফিরিয়া গিয়া পুঁটির সঙ্গে তার দেখা হয়, গিরিজা ঠিক বলিত—ওরে মুখপুড়ি, তোর এ দুর্বুদ্ধি কেন হইয়াছে? ঐ খালের ঘাট আউশধান ও পাটে ভরা হন্তের বিল, তকতকে নিকানো আঙিনাটুকুন—এসব ফেলিয়া কোথাও টিঁকিতে পারিবি, ভাবিয়াছিস?—এবং যদি সত্যই পুঁটির সঙ্গে তার বিয়ে হইয়া যাইত, অভাবের মধ্যে পুঁটি ঝগড়া করিত, কাঁদাকাটা করিত, তবে বড় অসহ্য হইলে ছাতা মাথায় সে পাটের খেতের ধারে গিয়া বসিত, তবু নীলমণির মতো এখানে ধরনা দিতে আসিত না।

নিচে হইতে সাড়া আসিল—গিরিজাবাবু আছেন? গলাটা নিতাইচাঁদের মতন। দরজার কাছে মিনাকে দেখা গেল, গিরিজা ডাকিয়া বলিল—যাও, বলে এসগে বাবা বাড়ি নেই। মিনা থোপা-থোপা চুল নাচাইয়া নিচে ছুটিল। মিনা মেয়ে ভালো; বয়স কম হইলে কি হয়, খাসা গুছাইয়া বলিতে শিখিয়াছে।

নিচে হইতে পুনশ্চ শোনা গেল—আচ্ছা খুকি, বাড়ির ভেতর বলগে ভূষণডাঙা থেকে এক বাবু এসেছেন, এখানেই থাকবেন।

অতএব নীলমণি আসিয়াছে, নিতাইচাঁদ নয়। গিরিজা নিচে নামিল। বলিল—এসেছ? বেশ বেশ···থাকো দু-চার দিন। আর, চাকরির যা অবস্থা—সব অফিস থেকে লোক কমাচ্ছে। সন্ধান পেলে তোমাকে চিঠি লিখে জানাব। কিন্তু চাকরির লোভে এখনকার এই পাটের মরসুমটা যেন নষ্ট কোরো না ভায়া···

খ দ্যো ত

প্রথম প্রকাশ

শ্রাবণ ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ

শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে উৎসৃষ্ট

গ ল্প সূ চী

অসময়

এই অসময়ে যে সন্তুদা ?

সময়-অসময়ের জ্ঞান নেই বাসন্তী। তুমি আসতে বললে, ঘড়ির কাঁটা সেই থেকে যেন অচল হয়ে আছে। একটা ঘণ্টা পার হতে দশ ঘণ্টা করে সময় নিচ্ছে।

নটায় আসতে বললাম—

নটা আজ বাজবে না বলে মনে হচ্ছে। কখন এসেছি জান ? ঠিক চারটেয়। পার্কে বসে থাকলাম খানিক, সোয়াস্তি পাই নে। পা টনটন করছে বাড়ির সামনে ঘুরে ঘুরে। তারপর 'দুত্তোর'—বলে ঢুকে পড়েছি।

মোটেই সময় নেই সন্তুদা। তোমায় ফিরে যেতে হবে। এখন সিনেমায় যাচ্ছি। আমি, ইলা আর মলয় মিত্তির। সেই যে বি-গ্রুপের মলয় মিত্তির—চিনতে পারছ না ? মলয় টিকিট কিনে রেখেছে মেট্রোর।

না-ই বা গেলে। কতকাল পরে দেখা !

সে হয় না, কথা দিয়ে ফেলেছি। নটার পরে এসো তুমি। নিশ্চয় এসো। কত দিনের কত কথা জমে আছে ! ঐ সময় কেউ থাকবে না—কেউ আসবে না আমার ঘরে। বলে দিয়েছি, শরীর খারাপ—রাত্রে বোর্ডিং-এ খাব না। মলয় মিত্তির—বুঝতেই পারছ—ছবি দেখার পর হোটেলে না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বে না।

সন্তোষ বিমর্ষ হল।

মুশকিল ! আমার তো নটায় আসা শক্ত। মহারাজগঞ্জের প্রিন্স ডিনারে ডেকেছেন। তাঁকে ধ্রুপদ শেখাই। তাঁর টেনিসের পার্টনারও আমি।

কি করছ আজকাল সন্তুদা ?

ক্রিকেটখেলার দরুন সেই যে কাস্টমসে নিয়েছিল—এখন অফিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সেখানে। মাইনে কুল্যে সাড়ে চারশ। পোষাচ্ছে না।

মহারাজ টানছে ম্যানেজার করবে বলে ; ভাবছি কাস্টমসের চাকরি ছেড়ে দেব। তুমি কি বল ?

বাসন্তীর মুখ কালো হয়ে যায়। ইস, এত কদর গান ও খেলাধূলার ! বাসন্তী ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, আর তিনটে সোনার মেডেল—

হেসে উঠে বলল, চাকরি আদপেই পছন্দ নয় আমার। মলয়ও তাই বলে। আমার ইস্কুলের চাকরি না ছাড়িয়ে সে শুনবে না। কিন্তু স্ত্রী হওয়া —সে-ও এক ধরনের গোলামি। লক্ষপতির ছেলে মলয়—এ বিয়েয় সুখশান্তি হয়তো হবে, কিন্তু স্বাধীনতা থাকবে না। কি বল ?

হাতঘড়ি দেখে শশব্যস্ত হয়ে উঠল বাসন্তী।

সময় হল সিনেমার। কাপড়-চোপড় বদলে একটু ভদ্রস্থ হতে হবে। মলয় মিত্তিরের সঙ্গে যাচ্ছি—বুঝলে না ? ওঠো তা হলে সন্তুদা। নটায় এসো। এসো কিন্তু—

আজকে হবে না। ডিনারের নেমন্তন্ন। দেখি, রবিবারে যদি সম্ভব হয়।

বেরিয়ে এসে নিশ্বাস পড়ে সন্তোষের। পোশাকে-প্রসাধনে ঝলমল করছে বাসন্তী। তিরিশ বছর বয়সকে বিশে দাঁড় করিয়েছে সজ্জার কৌশলে। এ সাজও পছন্দ নয় তার—সিনেমায় যাবার নূতন বেশ নিতে চলল। মলয় মিত্তিরের মতো ছেলেকে কলের পুতুলের মতো নাচাচ্ছে। মেয়েমানুষ বলেই এত খাতির, এত সমাদর !

আলাপ জমানোর দরকার বাসন্তীর সঙ্গে। অনেক বড়ঘরের ছেলে চরিয়ে বেড়ায়—বাসন্তীর বন্ধু হিসাবে যদি ভাব করা যায় বড়লোকদের সঙ্গে ! কলকাতা ছাড়বার পর সম্পর্কশূন্য হয়ে পড়েছে ঐ সমাজে। এখন নূতন করে সংযোগ-স্থাপনার দরকার।

কিন্তু নটায় আসা সম্ভব নয় কোনোক্রমে। নূতন ট্যুইশানি জুটেছে—নটা থেকে দশটা একঘণ্টা গান শেখাতে হবে একটা মেয়েকে। পনেরো টাকা করে দেবে। সামান্য টাকা—কিন্তু শহরে নিরাশ্রয় এসে দাঁড়িয়েছে, ঐ টাকাই বা দিচ্ছে কে ?

সকাল সকাল সে চলল। সাড়ে আটটায় যদি শুরু করতে পারে, সাড়ে নটায় শেষ করে সেই সময় আসবে বাসন্তীর কাছে। তবু সময় থাকবে আধঘণ্টা কথাবার্তার।

ট্রামে যাচ্ছে মেট্রোর সামনে দিয়ে। ঐ আলোকস্মিত ঘরের মধ্যে আনন্দে মশগুল বাসন্তী, মলয় মিত্তির ও বান্ধবীদের সঙ্গে ছবি দেখতে এসেছে। যার যেমন অদৃষ্ট!

ছাত্রীর বাড়ি বাইরের ঘরে গিয়ে বসল। কর্তা ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, সময় হয় নি তো! আধঘণ্টা আগে এসে পড়েছেন।

সন্তোষ আমতা-আমতা করে বলল, একটু দরকার ছিল। আজকের দিনটা সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে নটা অবধি থেকে যদি যেতে পারতাম, সুবিধে হত।

কর্তা বললেন, সে হবে কি করে? আর এক মাস্টার পড়াচ্ছেন যে!

অতএব অপেক্ষা করতে লাগল সন্তোষ। টং-টং করে নটা বাজতেই ভিতর থেকে বেরিয়ে এল শিক্ষক। বাসন্তী। পরনে আধময়লা মিলের শাড়ি, পায়ে ধুলোভরা স্যাণ্ডেল। পোশাক বদলে এসেছে ঠিকই।

কর্তা বললেন, এক ঘণ্টায় পনেরো টাকা—তাই আপনি কাঁইকুঁই করছিলেন। জিজ্ঞাসা করে দেখুন এঁকে। দেড় ঘণ্টা পড়ান—সাকুল্যে বারো।

শ্রীবাসুদেবায়

মার্বেল-পাথরের দোকান পরাশরের।

কমলাক্ষ রায় একদিন দোকানে এলেন।

ইয়ে হয়েছে। একটা মার্বেল-স্লাবে সুন্দর করে লিখে দেবে—'শ্রীবাসুদেবায়'।

কিসের জন্য রায় মশায়?

দেউড়িতে বসাব। ঘরবাড়ি আর যাবতীয় ভূসম্পত্তি ঠাকুরের নামে দিয়ে দিচ্ছি। যে ক-টা দিন আছি, স্বামী-স্ত্রী আমরা ঠাকুরসেবায় কাটিয়ে দেব।

পরাশর পরমোৎসাহে ঘাড় নাড়ে। নশ্বর সংসারে ঠাকুর-সেবার মতো মহৎ কাজ আর কি?

এবং ফরমায়েশমতো লিখে ফটকের গায়ে বসিয়ে দিয়ে এল সে একদিন। অদূরে মন্দিরের মধ্যে শ্রীমূর্তি প্রসন্ন হাসি হাসছেন।

*

তিন বছর পরে।

কমলাক্ষ আবার দোকানে এসেছেন। সহিস গাড়ির ছাত থেকে পাথরখানা নামিয়ে এনে রাখল।

খুলে নিয়ে এলাম পরাশর। ঐ সাইজের আর-একটা পাথরে লিখে দাও—'নন্দন কানন'। সেইটে বসাব।

আজ্ঞে?

উৎফুল্ল কণ্ঠে কমলাক্ষ বললেন, ছেলে হয়েছে। গিন্নির বুড়ো বয়সের ছেলে—বুঝতেই পারছ! নাম দিয়েছেন, নন্দদুলাল। ছেলে যখন হয়েছে, ঠাকুরের নামে ঘরবাড়ি দেবার মানে হয় না। ছেলেই বা কি বলবে বড় হয়ে?

ঘাড় নেড়ে পরাশর সায় দিল। এমন অবিবেচনার কাজ উচিত নয় কোনোক্রমে।

ইয়ে হয়েছে। বুধবারে আটকড়াই-ফুটকড়াই। সন্ধ্যাবেলা যেও—কেমন?

পরাশর বুধবার সন্ধ্যায় গিয়ে আটকড়াই-ফুটকড়াই খেল এবং 'নন্দন কানন' বসিয়ে দিয়ে এল ফটকে।

মন্দিরে শ্রীবাসুদেব প্রসন্ন হাস্যে আশীর্বাদ করছেন নবজাতককে।

কুড়ি বছর পরে।

পলিতকেশ কমলাক্ষ দেখা দিলেন আবার দোকানে। সোফার গাড়ি থেকে পাথরটি নামিয়ে আনল।

এটায় আর চলবে না পরাশর। ইয়ে হয়েছে—নতুন একটা লিখে দাও—'নন্দ-নির্মলা-নিকেতন'।

ভাঙা চশমা নাকের উপর ঠিক করে নিয়ে পরাশর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

ছেলের বিয়ে আঠাশে। লক্ষ্মী মেয়ে—ভারি পছন্দ আমাদের। নাম নির্মলা। আমার যা-কিছু ওদেরই তো হবে! বর-কনে বাড়ি ঢুকবে—তার আগেই মার্বেলটা লাগিয়ে দিতে চাই। নতুন বউ বড্ড খুশি হবে! কেমন মতলব করেছি বলো?

পরাশর মুগ্ধকণ্ঠে স্বীকার করল, নববধূ বাড়ি ঢুকতে গিয়ে নিজের নাম পড়বে—এমন তাজ্জব মতলব ইতিপূর্বে আর কারো মগজে আসে নি।

এরই তিন দিনের দিন কমলাক্ষ আবার এসেছেন। বিপর্যস্ত চেহারা—চোখের কোণে কালি। তিনটে দিনে যেন তিরিশ বছর বুড়িয়ে গেছেন তিনি।

ওহে পরাশর, লিখে ফেলেছ নাকি? আর দরকার হবে না।

কি হল রায় মশায়?

নিশ্বাস ফেলে কমলাক্ষ বলেন, নন্দদুলাল চলে গেছে। শেষ রাতে ওলাউঠা হল, সন্ধ্যার আগেই সব শেষ। শ্রীবাসুদেব পায়ে টেনে নিলেন তাকে। 'নন্দ-নির্মলা' লিখতে হবে না। লেখো 'শ্রীবাসুদেবায়'।

ভাঙাচোরা বাতিল পাথর স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে ছিল উঠানের প্রান্তে। তার ভিতর থেকে ধূলিমলিন পুরানো একখানা টেনে বের করল।

নতুন আর লিখতে হবে না রায় মশায়। সেইখানাই আছে। ঝেড়ে-ঝুড়ে নিলে চলবে।

ফটকে লাগিয়ে দিয়ে এল। শ্রীবাসুদেব কৌতুকস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

কুণ্ডলা সেনের প্রেমিক

বৃষ্টি হয়ে গেছে। প্যাচপেচে পথ।

কুণ্ডলা সেন শহর থেকে ফিরছে। ছটার গাড়ি ধরতে পারে নি অল্পের জন্য, পরেরটায় এসেছে। স্টেশনে পৌঁছেছে তখন সাড়ে সাতটা।

মেয়ে-ইস্কুলের চাকরি নিয়ে মাস তিনেক সে এসেছে এই জায়গায়। কাপড়চোপড় ও কিছু প্রসাধন-সামগ্রী কিনবার জন্য শহরে গিয়েছিল। একজনের কাছে শ-খানেক টাকা ছিল, সেটাও আদায় করে নিয়ে এসেছে। আরও টুকিটাকি কাজ ছিল। নানা কাজে দেরি হয়ে গেল।

পাড়াগাঁ জায়গা। দিনকাল ভালো নয়, লোকের অভাব-অভিযোগের অন্ত নেই। পথ-ঘাট নির্জন। ইস্কুলও মাইলখানেক হবে স্টেশন থেকে। এইজন্য বেলাবেলি আসতে চেয়েছিল কুণ্ডলা। কিন্তু ঘটে উঠল না।

তাই হনহন করে পথ অতিক্রম করছিল দেহভারে ধরণী প্রকম্পিত করে।

স্টেশন থেকেই মনে হয়েছিল, কে-একজন পিছু নিয়েছে। গোড়ায় আমল দেয় নি। কেউ কোনো কাজে চলেছে—সম্ভবত বামুনপাড়ার দিকে চলেছে, এগিয়ে ডানহাতি মোড় ঘুরবে।

কিন্তু বামুনপাড়ার মোড় চলে গেল। লোকটা নিরবচ্ছিন্ন অনুসরণ করে চলেছে।

ভ্রূ কুঞ্চিত হল কুণ্ডলা সেনের। পাড়াটা ছাড়িয়েই দু-ধারে বাঁশবন। ঘন-সন্নিবিষ্ট। দিনমানেই আঁধার হয়ে থাকে। ঐখানে কাজ হাসিল করবার মতলব নাকি লোকটার? অতএব পাড়ার সীমানা পার না হতেই হেস্তনেস্ত করা আবশ্যক।

সুঁড়িপথে সে নেমে পড়ল। হরিশ গরাইর বাড়ি অদূরে। মেয়ে-ইস্কুলের বেয়ারা হরিশ—ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মজুমদার মশায়ের বাড়ির চাকরও। চার ভাই তারা—সবাই এক-একটা দৈত্য। এখানে যদি লোকটা বজ্জাতি করতে আসে, পরম দুর্গতি আছে তার অদৃষ্টে।

ঐ তো! কুণ্ডলা দ্রুতপায়ে খানিকটা এগিয়ে কাঁঠালগাছের আড়ালে দাঁড়াল। এসে পড়ল লোকটা। কুণ্ডলা সহসা পিছন থেকে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, দাঁড়াও—কে তুমি?

টর্চ ফেলল তার মুখে। আলোয় মুখ দেখে বিস্মিত হল। ফার্স্ট ক্লাস-কামরা থেকে নেমে এই ছোকরাই সতৃষ্ণ চোখে বার বার তাকাচ্ছিল তার দিকে। সুদর্শন চেহারা।

কোথায় যাবেন আপনি?

দীপ্তিনারায়ণ মজুমদারের বাড়ি।

চালাকির জায়গা পান না? মজুমদার-বাড়ি যেতে এদিকে আসবেন কেন?

ছোকরা নিরুত্তর থাকে। কুণ্ডলা পুনশ্চ প্রশ্ন করে, মজুমদার মশায় আপনার কে হন?

বাবা—

সবিস্ময়ে কুণ্ডলা বলে, আপনিই তবে—

আমার নাম শ্রীতৃপ্তিনারায়ণ মজুমদার।

আবার টর্চ ফেলতে হয়, ভালো করে দেখতে হবে। কুণ্ডলা এসে অবধি তৃপ্তির গুণগান শুনছে। কেমিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস-ফার্স্ট হয়ে নামজাদা অধ্যাপকের কাছে সাকরেদি করছে। স্বভাব-চরিত্রও যুবজনের দৃষ্টান্তস্বরূপ—সিগারেটটি অবধি খায় না।

কুণ্ডলা কোমল কণ্ঠে (তার পক্ষে কণ্ঠস্বর যতদূর কোমল করা সম্ভব) আহ্বান করল, আসুন—

তৃপ্তিনারায়ণ যেন এরই প্রতীক্ষা করছিল। বিনাবাক্যে সঙ্গে চলল। কোয়ার্টারে পৌঁছে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে কুণ্ডলা একদৃষ্টিতে তাকাল আবার তৃপ্তির দিকে।

আচ্ছা, সত্যি করে বলুন। বাঁশবন পার হয়ে গেলেই তো আপনাদের বাড়ি। সোজা না গিয়ে আমার পিছু নিয়ে এতটা পথ ঘুরলেন কেন?

তৃপ্তি আমতা-আমতা করে।

কুণ্ডলা সাহস দিচ্ছে, বলুন, বলুন না—

কিন্তু কিছুই বলতে পারে না সে। ঘেমে উঠছে। সুন্দর মুখের বিহ্বল অপ্রতিভ ভাব কুণ্ডলা পরম কৌতুকে উপভোগ করছে।

মানে···ইয়ে হল কিনা—

কুণ্ডলা বলে, বুঝতে পেরেছি। থাক।

তৃপ্তিনারায়ণ মুখ তুলতে পারে না, মাটির দিকে চেয়ে থাকে। কুণ্ডলা হাত ধরে বসাল। চা করে খেল দুজনে।

অনেকক্ষণ পরে সঙ্কুচিত ভাবে তৃপ্তি বলে, ওঠা যাক।

ঘড়ি দেখে কুণ্ডলা চমকে ওঠে, ইস—দশটা বেজে গেছে।

চলে যাচ্ছি তা হলে—

অতি কাতর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তৃপ্তি। যাবে, কিন্তু পা কিছুতে উঠছে না যেন তার। নিশ্বাস ফেলল সে কুণ্ডলার দিকে তাকিয়ে।

বিমোহিত কুণ্ডলা সেন।

চলুন, এগিয়ে দিয়ে আসি খানিকটা।

একটু থেমে বলে, আপনিও কিন্তু আবার পৌঁছে দিয়ে যাবেন। নইলে একা-একা ফিরে আসব কেমন করে?

খিলখিল করে অজস্র হাসি হেসে উঠল কুণ্ডলা। এমন হাসি হাসতে পারে, সে জানত না। তৃপ্তিনারায়ণও হাসে।

কুণ্ডলা বলে, এবারে আমি পৌঁছতে যাব। তারপর আপনি পৌঁছে দিয়ে যাবেন। সারারাত্রি এমনি চলবে। কেমন?

বেরুল দুজনে। যাবার আগে কুণ্ডলা সেন আয়নায় একনজর মুখ দেখে আসে। থপথপে শরীর নিয়ে এত দ্রুত ছুটতে পারে সে! মুখটাও যেন রোগা-রোগা দেখাল। এবং মুখের উপর ঔজ্জ্বল্য।

গুনগুন করে কি বলছে কুণ্ডলা। মনের আনন্দে বকে যাচ্ছে। বাঁশতলা ঘনান্ধকার। তৃপ্তিনারায়ণ তার হাত ধরল। কুণ্ডলা আপত্তি করে না। সাহস পেয়ে হাত ধরে তৃপ্তি পাশে পাশে চলেছে। অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে চলেছে তারা।

আপনাদের বাড়ির আলো—ঐ যে! জানেন না, আপনাদের ইস্কুলের কাজ নিয়ে এসেছি আমি।…ফিরে চলুন, এবার আমায় পৌঁছে দেবেন। যা কথা ছিল।

কিন্তু অদ্ভুত আচরণ তৃপ্তিনারায়ণের। কুণ্ডলার হাত ঝটকা মেরে সরিয়ে সে ছুটল। এক দৌড়ে ফটকের সামনে। বিষম জোরে কড়া নাড়ছে। দরজা খুলে যেতেই ঢুকে পড়ল। পিছনে তাকিয়ে দেখল না একটিবার।

কুণ্ডলা হতভম্ব হয়ে অন্ধকারে খানিক দাঁড়িয়ে রইল। ব্যাপার কতকটা আন্দাজ করেছে। বাড়ির কেউ দেখে ফেলবে—এই আশঙ্কায় ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল সে। কিন্তু এটা উচিত নয়। বড়লোক এবং চাকরিদাতার পুত্র হলেও এত বাড়াবাড়ি সহ্য করা শক্ত কুণ্ডলার পক্ষে।

পরদিন ভোরবেলা কুণ্ডলা সেন মজুমদার-বাড়ি এল। দীপ্তিনারায়ণের সঙ্গে দরকার ইস্কুল সম্পর্কে—কিন্তু কর্তা অনেক বেলায় শয্যাত্যাগ করেন, এটা সকলের জানা।

হরিশকে কুণ্ডলা প্রশ্ন করে, তৃপ্তিবাবু এসেছেন নাকি শুনলাম?

হরিশ বলে, তিনি অনেকক্ষণ উঠেছেন। পড়াশুনা করছেন।

কোথায়?

হরিশ দোতলার বৈঠকখানা দেখিয়ে দিল। দিয়ে কাজে চলে গেল।

কুণ্ডলা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে। কেউ নেই কোথাও। টিপিটিপি পিছনে এসে সে তৃপ্তির হাতের বই কেড়ে নিল।

হুলস্থুল ব্যাপার! আর্তনাদ করে তৃপ্তিনারায়ণ ছুটল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল পাঁচ-সাতটা ধাপের নিচে। বাড়ির সবাই ছুটে এল।

চিৎকারের অনুপাতে আঘাত কিছুই নয়। তৃপ্তির বোন আশা কুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করে, বাবার কাছে এসেছেন বুঝি? ডেকে তুলব?

প্রতিহিংসাপর কুণ্ডলা তৃপ্তিকে দেখিয়ে বলে, না—এসেছি ওঁর কাছে। কাল আমার বাসায় রুমাল ফেলে এসেছিলেন, সেইটে দিতে এসেছি।

দাদা আপনার বাসায় গিয়েছিলেন?

তৃপ্তির অঞ্চলব্যাপ্ত গৌরব ধূলিসাৎ করবার অভিপ্রায়ে কুণ্ডলা বলে, হ্যাঁ—স্টেশন থেকে পিছু নিলেন, চা-টা খেলেন আমার বাসায়, তারপরও ছাড়লেন না, সঙ্গে টেনে নিয়ে এলেন এই অবধি।

আশা হাততালি দিয়ে বলে, তাই বলুন। দাদা দেমাক করেন, একলা বাঁশতলা পার হয়ে এসেছেন। সে কি বিশ্বাস হবার কথা?

কেন?

দাদার বড্ড ভূতের ভয় রাত্রিবেলা—

হরিশ বলে, দিনমানেও। সকালবেলা কি কাণ্ডটা করলেন, দেখতে পেলেন তো?

ইস্কুলের বেয়ারা হরিশকে, রোজ পাঁচ-সাত ঘণ্টা কাটাতে হয় কুণ্ডলা সেনের কাছাকাছি।

দুই জানলা

পুরীর এক হোটেলে গিয়ে উঠেছে। ঘরটি নিরিবিলি এবং অতিশয় ছোট—কায়ক্লেশে একটা সরু খাট পড়েছে। তা হোক—এই যথেষ্ট। সঙ্কীর্ণ একটুখানি জায়গাই কাম্য তাদের। ছুটিতে আছে কিংবা নেই—কারো নজরে পড়বে না। খাট না হলে বা কি—মেজেতেও শুতে রাজি। এক হাত জায়গার মধ্যে পরম ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকবে। সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিলেই ব্যস, আর কোনো ঝামেলা নেই—নিশ্চিন্ত মুখোমুখি বসে দেদার ভবিষ্যতের ছবি আঁকো। চাকরটাকে মোটা বখশিশ কবুল করেছে ভাত ও চা-জলখাবার ঘরে দিয়ে যাবার জন্য। খাওয়ার টেবিলে অনেকে বসে বসে আড্ডা জমায়, গায়ে পড়ে আলাপ করতে আসে। এ সমস্ত নিরতিশয় বিরক্তিকর এদের কাছে।

ঘরে দুটো জানলা—এ-জানলায় সমুদ্র, ও-জানলায় শহর। দুজনে দু-জানলায় গিয়ে বসে অনেক সময়। মৃদুকণ্ঠে কথাবার্তা চলে।

পার নেই, তল নেই—কি বিরাট সমুদ্র! দুনিয়ার নৌকোগুলো, দেখো দেখো, কেমন যাচ্ছে ঢেউয়ের উপর দিয়ে!

অপর জানলা থেকে বলে, তোফা তোফা বাড়ি এদিকে। লোকজন নেই—খালি বাড়ি নাকি?

তালা দেওয়া আছে। মালিকরা ছুটিছাটায় এসে তালা খোলে বছরে এক-আধবার।

ঢুকে পড়া যাক ওর একটায়—

সমুদ্রমুখো জানলা থেকে প্রতিবাদ আসে, ইঁদুরের মতো তোমার খালি গর্তে ঢুকে পড়ার ঝোঁক। ঢেউ খেতে খেতে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলো দুজন দূরদূরান্তে চলে যাই।

গল্পকর্তা অবিনাশ একটা সিগারেট ধরিয়ে গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, কথাবার্তাগুলো কিংবা এই জানলায় বসবার বৃত্তান্ত অবশ্য আনুমানিক। কিন্তু হলফ করে বলতে পারি, ঐ ধরনেরই ফিসফিস-গুজগুজ চলত ওদের মধ্যে।

কাদের কথা বলছেন?

বাঁকাচোখে তাকিয়ে অবিনাশ বললেন, আন্দাজ করো না—

নিশ্চয় আমাদের মিনি আর তরুণ। পালিয়ে বিয়ে করে কোন হোটেলে উঠেছিল না তারা?

অবিনাশ দারোগা হেসে ঘাড় নাড়লেন।

সমুদ্র পাড়ি দেবার যোগাড়ে ছিল অমলকান্তি—আই. সি. এস. অমলকান্তি হে—লড়ায়ের বাজারে সরকারি সাড়ে তিন লাখ টাকা মেরে এখন যে শ্রীঘরে বাস করছে। আর শহরের খালি বাড়ি যার মন টানছিল, তার নাম কাসেম আলি—স্বনামধন্য সিঁধেল।

একমুখ ধূম উদ্গীরণ করে অবিনাশ বলতে লাগলেন, কলকাতায় সে সময়টা ভীষণ দাঙ্গা। তারই মধ্যে এরা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের তাজ্জব নিদর্শন দেখিয়ে দিল। হোটেলের ঘরে এক বালিশ মাথায় এক সতরঞ্চিতে শয়ান দুজনকে আমি গ্রেপ্তার করি।

নতুন গল্প

ভদ্রলোক উপরওয়ালার ঘরে গেলেন। মহাব্যস্ত তখন উপরওয়ালা। একটা ফাইল নিয়ে তার উপর নীল পেন্সিলে কি সব মন্তব্য করছিলেন নিবিষ্ট হয়ে। সামনের চেয়ারটা সশব্দে একটুখানি সরিয়ে ভদ্রলোক বসে পড়লেন। চোখ তুললেন এবার উপরওয়ালা। ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, কি ?

ছুটি চাই—অন্ততপক্ষে তিনটে দিনের।

এখন হতে পারে না। কাজের অত্যন্ত চাপাচাপি। দরখাস্ত নামঞ্জুর করবার সময় লিখে দিয়েছি তো সে কথা।

তাই আর একটা দরখাস্ত নিয়ে এলাম।

দরখাস্তটা মেলে ভদ্রলোক ফাইলের উপরে রাখলেন। অতএব না পড়ে উপায় নেই। কাজের ব্যাঘাতে বিরক্ত হয়ে উপরওয়ালা বাঁকা চোখে পড়তে লাগলেন। প্রথমটা অবহেলাভরে পড়ছিলেন, তারপর হাতে তুলে নিলেন কাগজখানা।

পদত্যাগ-পত্র। দেশে যেতেই হবে—ছুটি দেওয়া যদি সম্ভবপর না হয়, কর্তৃপক্ষ এই পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করে যেন বাধিত করেন।

উপরওয়ালা সবিস্ময়ে ভদ্রলোকের আপাদমস্তক একনজর দেখে নিলেন। মাথা খারাপ হল নাকি এঁর ? বললেন, চাকরির চেয়ে ভাইয়ের বিয়ের আমোদ-স্ফূর্তি বড় হল আপনার কাছে ?

মা লিখেছেন যাবার জন্য। না গেলে দুঃখ পাবেন। চাকরি যায় যাক—মায়ের হুকুম অমান্য করতে পারব না।

এ বাজারে আড়াই-শ টাকার চাকরিটা যাচ্ছে। ভেবে-চিন্তে দেখুন ভালো করে।

দশটা থেকে তিনটে—এই পাঁচ ঘণ্টা ধরেই ভাবলাম। দু-বেলা খাচ্ছিলাম, চাকরি গেলে না হয় দু-দিন অন্তর খাব।

বেশ !

উপরওয়ালা খশখশ করে হুকুম দিলেন দরখাস্তের উপর। ভদ্রলোক দেখলেন—লিখেছেন, ছুটি মঞ্জুর, পদত্যাগ গৃহীত হল না। ডানহাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্য।

আপনার মতো মানুষ দুর্লভ আজকালকার দিনে। আপনার মাতৃভক্তি ও তেজস্বিতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

কিন্তু উত্তর-প্রত্যুত্তরের সময় আর নেই। সাড়ে তিনটে বাজে দেয়াল-ঘড়িতে। তিনটে-বাইশের গাড়ি ধরতে পারলে বড় সুবিধা হত, সেটা গ্রামের স্টেশনে ধরে। এখন সাড়ে পাঁচটার মেল ছাড়া গতি নেই। সেটা গ্রাম অতিক্রম করে পাঁচ মাইল দূরের জংশন-স্টেশনে থামবে রাত্রি দশটায়। পাঁচ মাইল বেশি কিছু নয়—তবে রাত্রিবেলা, আর এই বর্ষাকালের পথঘাট। পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে নিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা হওয়ার দরকার—সাড়ে পাঁচটার গাড়ি ফসকে না যায় কোনোক্রমে।

জংশন-স্টেশনে গাড়ি থামল, বৃষ্টিও নামল মুষলধারে। ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারে চারিদিক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

স্টেশন-মাস্টার সুপরিচিত। তিনি বললেন, এই অভদ্রার মধ্যে যাবেন না। যা হোক দুটো ডাল-ভাত খেয়ে আমার বাসায় শুয়ে থাকুন।

কিন্তু শুনলেন না ভদ্রলোক। এত হাঙ্গামা-হুজ্জুতের পর বাড়ির কাছা-কাছি এসে আটকে থাকবেন, সে হতে পারে না কিছুতে।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, তবু ছাতা বন্ধ করে চলেছেন। জোর বাতাসে ছাতা খোলা চলে না। তা ছাড়া বন্ধ ছাতা লাঠির মতো ঠুকে ঠুকে পথের আন্দাজ নিতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—এই একটু সুবিধা। অনেকবার আছাড় খেয়ে জলকাদা ভেঙে অনেক দুঃখে পথ এগোচ্ছেন।

কিন্তু বিপদের যেন শেষ নেই। বিদ্যুতের আলোয় নদীর অবস্থা দেখে বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। কূলপ্লাবী স্রোতোধারায় বাঁশের সাঁকো ভেসে গেছে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে মুহূর্তকাল ভাবলেন তিনি। তারপর 'জয় মা গঙ্গা'—বলে অকুতোভয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

ভিজে কাপড়চোপড়ে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিলেন।

কই গো—

সম্পাদক রোষদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, এ কি মশায়? নতুন গল্প দেবার কথা।

লেখক বললেন, নতুনই তো—

আমাদের পড়াশুনো নেই, এই বুঝি মনে করেন? এ তো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা—আধুনিক ঢঙে লিখে এনেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র নয়, ভদ্রলোকের নাম চন্দ্রনাথ শিকদার। চাঁদাবাবু বলে সকলে।

নাম আলাদা হোক, ঘটনা হুবহু এক। ছোট ভাইয়ের বিয়েয় আসা মায়ের চিঠি পেয়ে।

আজ্ঞে না। মা মরেছিলেন চাঁদাবাবুর আট মাস বয়সে। আর ছোট-বড় মাসতুতো-মামাতুতো কোনো রকম ভাই নেই তাঁর। শেষটা শুনুন—

চাঁদাবাবু দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললেন, কই গো, কোথায় সব? আমি এসেছি।

কে?

আমি, আমি গো! গলা শুনে চিনতে পার না, কেমন—

কথা অসমাপ্ত রইল। গর্জন উঠল ভিতর থেকে।

আবার এসেছ দু-হপ্তা না যেতে? খুলব না দরজা।

কি করব? ব্যস্ত কর কেন চিঠি লিখে? দাঁতের যন্ত্রণার কথা লিখলে মানুষ উতলা হয় না?

ভিতর থেকে মন্তব্য আসে, বাবা কত কষ্টে জুটিয়ে দিলেন! তা এমন ঘন ঘন বাড়ি আসা—চাকরি ক-দিন টিকবে?

ঠায় দাঁড়িয়ে জলে ভিজছি। নিউমোনিয়া ধরবে এক্ষুনি। দরজা খোলো লক্ষ্মীটি।

অনেক খোশামুদির পর বউ দরজা খুলল।

ইশ, কি কাণ্ড বলো তো! এ অবস্থায় কুকুর-শিয়ালে বেরোয় না। বেঘোরে মারা পড়বে তুমি কোন দিন।

একগাল হেসে গামছা দিয়ে গা মুছতে মুছতে চন্দ্রনাথ বলে, তোমার বাবা চাকরি করে দিলেন, যেমন-তেমন একটা বাসা জুটিয়ে দিতে বলো এবার। বেঘোরে মরব না, চাকরিও ঠিক থাকবে, নতুন গল্প বানানোর জন্য মাথা খুঁড়তে হবে না হপ্তায় হপ্তায়—

ছবি

চাকরি পেয়ে প্রথমটা খুব স্ফূর্তি হয়েছিল অবনীর। খাটুনি কিছুই নয়, কুড়ি-বাইশখানা বাড়ি আছে—তার ভাড়া আদায় করা। মাসের গোড়ার দিকে হপ্তাখানেকের কাজ মোটে—বাকি দিনগুলো শুয়ে বসে কাটানো।

কিন্তু স্ফূর্তি উবে গেল মাসখানেকের মধ্যে। প্রকাণ্ড বাড়ি, আটখানা ঘর পাশাপাশি, তার মধ্যে দু-জন মাত্র—সে আর গিন্নিঠাকরুন ক্ষীরোদা। ঠাকুর-চাকর পারতপক্ষে এদিকে ঘেঁষে না, তারা রান্নাঘরে থাকে। অবনীও পরমানন্দে রাজি আছে তাদের সঙ্গে সেখানে গিয়ে থাকতে, কিন্তু তার বেলা আদেশ মিলবে না। কড়া রাশভারি মানুষ ক্ষীরোদা, ছেলেপুলে নেই। ত্রিসংসারে কেউ যে আছে, অবস্থা দেখে মনে হয় না।

অতিকায় আট-আটটা ঘর হাঁ করে রয়েছে, অবনীকে গালের মধ্যে পুরে দিন-রাত্রি ধীরে ধীরে গলাধঃকরণ করছে—এমনি একটা আতঙ্ক অহরহ মন জুড়ে রয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, কাজ পেলে সে বেঁচে যেত—কাজের ভিড়ে ভুলে থাকতে পারত। ক্ষীরোদার হুকুম, কখন কি দরকার পড়ে—চব্বিশ ঘণ্টা তাকে হাজির থাকতে হবে বাড়িতে। খাবে-দাবে, কাজ না থাকলে বই-টই পড়বে, ইচ্ছা হলে চাই কি—গান-বাজনাও করতে পারবে—তাতে তাঁর আপত্তি নেই। গানে কিছু শখও আছে অবনীর। বাজনার জিনিস অবশ্য সিংহমুখো যে খাটখানায় সে শোয় সেইটে ছাড়া আর কিছু নেই। ঠেকা দিয়ে তাতেই চালানো যেত—কিন্তু কথা বলতে গেলেই ঘরের মধ্যে গমগম করে ওঠে, এর উপর গান গাইতে তার ভরসায় কুলিয়ে ওঠে না। আর বইয়ের মধ্যে এ-বাড়িতে আছে শুধু পঞ্জিকা। ক্ষীরোদা সারাক্ষণ তাঁর ঘরখানির মধ্যে থাকেন, কি করেন তিনিই জানেন। দুপুরবেলা স্নানের সময়টা বেরিয়ে আসেন একবার। আর বেরোন যখন কোনো কাজের দরকার পড়ে। ভাঁটার মতো চোখের মণি ঘুরিয়ে এমন করে তাকান যে অবনীর বুকের মধ্যে গুরগুর করে ওঠে। কথা বলেন—বাইরের কেউ শুনলে মনে করবে, ঝগড়া করছেন। গলার স্বরই ঐ রকম। ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব মোলায়েম স্বরে একদিন বললেন, একা-একা কষ্ট হচ্ছে—না? মাঝে মাঝে আমার ঘরে গিয়ে গল্পগুজব করলে তো পার।

বাবা রে—সামনে দাঁড়াতে অন্তরাত্মা শুকিয়ে ওঠে, গল্পগুজব এই মানুষের সঙ্গে !

একটা জিনিস অবনী পেয়ে গেল হঠাৎ। পেয়ে যেন বেঁচে গেল। একটি মেয়ের ছবি। ঐ আটটা ঘরেরই একটায় এককোণে টাঙানো ছিল। ছবিটা চুরি করে এনে সে বিছানার ভিতর রাখল। ফাঁক পেলেই বের করে দেখে। দেখে আশ মেটে না। মরুভূমির মতো বাড়িটা—তার মধ্যে একমুঠো যুঁই-ফুল।

একলাটি অন্ধকারে গা ছমছম করে, তাই ঘুম না আসা অবধি শিয়রে আলো জ্বেলে রাখে অবনী। এখন আর একলা মনে হয় না—পাশে ছবিখানা। ছবি নয়, ফুটফুটে এক তরুণী। লাবণ্য মুখের উপর ঢলঢল করছে। ঘুম-ভরা চোখে মনে হয়, জাগ্রত প্রাণচঞ্চল মেয়েটি শান্ত হয়ে পাশে শুয়ে আছে। একের মন যেন জড়িয়ে ধরে আছে অন্যকে। নিবিড় আলিঙ্গনে সহসা সে বুকে জড়িয়ে ধরে।

ছাড়ো গো, ছাড়ো—আহা, লাগে—

মটমট করে ওঠে—তখনই সংবিৎ হয়, মানুষ নয়--ফ্রেমে বাঁধানো ছবি যে ওটা !

সকালবেলা শান্ত মুহূর্তে অবনীর ভাবনা জাগে, এ কী নতুন উৎপাত শুরু হল আবার ! নির্জন এই প্রাচীন পুরীতে কবে মূর্তিমতী ছিল ঐ তরুণী ! খিলখিল করে হাসত, ধুপধাপ ছুটে বেড়াত সারা বাড়ি, গুনগুনিয়ে গান গাইত জ্যোৎস্না-রাত্রে। সেই গান-হাসি রাত্রি হলেই ভেসে বেড়ায় যেন ঘরের মধ্যে। ফ্রেমের ছবি থেকে বেরিয়ে এসে সারা রাত সে পাশটিতে শুয়ে নিঃশব্দ ভাষায় মধুগুঞ্জন করে। টং-টং করে ঘড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে যায়, রাত শেষ হয়ে আসে, কথার তবু যেন শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথের গল্পে যা পড়েছে, সেই রকম। গল্প সত্যি হয়ে ঘটছে তার জীবনে।

অনেক রাত্রে ক্ষীরোদা দুয়ার খুলে বারান্দা অতিক্রম করে চললেন অবনীর ঘরের দিকে। এসে জানলায় ঘা দিলেন।

ঘুমিয়েছ না কি ?

সাড়া না পেয়ে জোরে জোরে ঘা দিতে লাগলেন। অবনী ফুঁ দিয়ে তাড়াতাড়ি আলো নেবাল।

ক্ষীরোদা বললেন, আলো ছিল—দেখতে পেয়েছি। রাত কত এখন ?

সাড়ে দশটা হবে আজ্ঞে—

সাড়ে দশটা ছিল দু-ঘণ্টা আগে।

তাই না কি ? টের পাই নি তো—

কি করে পাবে ? কেরোসিনের খরচ তো তোমায় যোগাতে হয় না। এমন করে জানলা এঁটেছ, তবু আলো বেরুচ্ছিল। নবেল পড়া হচ্ছে ?

আজ্ঞে না। নবেল কোথা পাব ?

তা হলে ভগবদ্গীতা ? যা খুশি পড়তে পার—কিন্তু দিনমানে পড়বে। লজ্জা করে না পরের পয়সায় কেরোসিন পোড়াতে ?

অবনী চুপ করে থাকে। কিন্তু গ্রহ কাটে নি। ক্ষীরোদা বললেন, দুয়োর খোলো—

অন্ধকার ঘরের মাঝখানে তিনি এসে দাঁড়ালেন। অবনী ঘেমে উঠেছে। কি সর্বনাশ হয়, কি না জানি করে বসেন এই নির্জন নিশিরাত্রে এইবার '

হুকুম হল, আলো জ্বালো।

ছবিটা কাপড়ের মধ্যে ঢেকে অবনী আলো জ্বালল। বাঁচোয়া, যা ভেবেছিল সে সব নয়। খেরো-বাঁধা জমাখরচের খাতা ক্ষীরোদার হাতে। এত রাত অবধি হিসাব নিয়ে ছিলেন তা হলে তিনি ! কঠোর কণ্ঠে বললেন, যোগটা দেখো।

আজ্ঞে—

একশ সতেরো করেছ, একশ উনিশ হবে। দেখো—

থতমত খেয়ে অবনী বলে, তাই তো—ভুল হয়ে গেছে।

তুমি ইচ্ছে করে করেছ। জোচ্চুরি করে মেরে দিয়েছ আমার দুটো টাকা। ভেবেছিলে, ধরতে পারবে না। মিথ্যে বলে এখন ঢাকতে যাচ্ছ। উঁ ?

অবনীর ছাতাটা হাতে তুলে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে দাঁড়ালেন।

পিঠের ছাল তুলে নেব, আমায় চেন না। তোমার মতো পাঁচ-সাতটা এর আগে ঘায়েল হয়েছে এ-বাড়িতে।

অবনী তড়াক করে উঠে পালাতে যায়। কাপড়ের ভিতর থেকে ছবি মেজেয় পড়ল।

ক্ষীরোদা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, এখানে আমার ছবি ?

এ অবস্থার মধ্যেও অবনী একবার ছবির দিকে একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে।

দেয়ালে টাঙানো ছিল। ছবি চুরি করে এনেছ তুমি শয়তান।

রাগ সামলাতে না পেরে ক্ষীরোদা ছাতার বাঁট দিয়ে অবনীর পিঠে বসিয়ে দিলেন এক ঘা।

ছুটে পালাচ্ছে অবনী। ঠোক্কর লেগে ছবি বারান্দায় পড়ল, ঝনঝনিয়ে কাচ চুরমার হয়ে গেল। ক্ষীরোদা তাড়া করেছেন। পায়ের আঘাতে ছবি বারান্দা থেকে পড়ল উঠানের নর্দামায়।

বাতুলাশ্রম

ভাইঝির কিঞ্চিৎ মাথার গোলমাল। ভেবেচিন্তে বাতুলাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য প্যারিমোহন সুরের সঙ্গে দেখা করলাম। ভদ্রলোকের সঙ্গে অল্প-সল্প পরিচয় ছিল। তা ছাড়া আমি খবরের কাগজে লিখি—সেটা জানতেন তিনি। প্রয়োজনের কথা বলতে বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

দেখেন তো! এই আবার জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন? আশ্রম তো আপনাদেরই জন্যে। জায়গা না থাকলেও দিতে হবে জায়গা করে। দেখেন তো···কটা জায়গা চাই? আপনার বাড়িসুদ্ধ ঢুকিয়ে নিতে পারি যদি আদেশ করেন।

পরম আপ্যায়ন করলেন তিনি।

বললাম, নিজের চোখে দেখে আসতে চাই একবার। স্ত্রী বলছেন রাঁচির কথা। কিন্তু কাছাকাছি যদি হয়ে যায়—

রাঁচির প্রসঙ্গে প্যারিমোহন খাপ্পা হয়ে উঠলেন।

এই দেখেন। বিহারের কাছে কোন দুঃখে হাতজোড় করে জায়গা চাইতে যাব? কিসে কম যাচ্ছি বাঙালি আমরা?

হেসে বললাম, বাতুলের ব্যাপারে তো নই-ই।

কোনো ব্যাপারেই নই। আচ্ছা দেখে আসুনগে আশ্রম। তাজ্জব হয়ে যাবেন। আগে কিছু বলছি না।

আবার বললেন, দাঁড়ান। সুদর্শন ডাক্তারের নামে চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। তিনি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট—সমস্ত দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন।

চিঠিতে আমার গুণপনা ফলাও করে লিখলেন। এত গুণের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি জানতে পেরে চমক লাগল।

শহরের বাইরে আম-কাঁঠালের ছায়াচ্ছন্ন নিরালা জায়গাটা। উঁচু পাঁচিলে ঘেরা—পাগলেরা বেরিয়ে যেতে না পারে! গেটের পাশে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কোয়ার্টার।

শুনলাম, সুদর্শন ডাক্তার রোগি দেখছেন এ সময়টা। কেরানি ভদ্রলোক বলে দিলেন, সোজা চলে যান কাঁকরের রাস্তা বেয়ে। ডাক্তারবাবু অতি ভদ্রলোক—যা জিজ্ঞাস্য থাকে, ভালো করে জেনে নেবেন।

অতএব এগিয়ে চলেছি।

লম্বা-চওড়া ফরসা চেহারার প্রবীণ এক ব্যক্তি ব্যস্তসমস্ত হয়ে পার্শ্ববর্তী কুটির থেকে বেরিয়ে এলেন। চোখাচোখি হতে একগাল হেসে বললেন, পাগল দেখতে এসেছেন? আসুন।

পরম ভদ্র সত্যিই। সুদর্শন নাম—চেহারাতেই প্রকাশ পাচ্ছে। বাঙালির মধ্যে এমন সুপুরুষ কদাচিৎ চোখে পড়ে। কাজকর্ম ফেলে আমার সঙ্গে চললেন। চিঠি দেখাতে যাচ্ছিলাম—বললেন, থাক—থাক—কিছু দরকার নেই।

ঝিলের ধার দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে নিয়ে চলেছেন। এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালেন।

ঐ একটা। কি মজা করছে, দেখুন। দেখতে পাচ্ছেন না? বেঞ্চিতে বসে ঐ যে—

পিছনটায় ঝিল, সামনে কলাঝাড়—সহজে নজর পড়ে না। জায়গা বেছে নিয়েছে চমৎকার। বেঢপ-মোটা কুৎসিত-দর্শন একটা মেয়ের হাত জড়িয়ে ধরেছে—পাগলই নিঃসন্দেহ। ঐ আকৃতির মেয়ের কাছে প্রেম-নিবেদন করতে পারে না কেউ সুস্থ সজ্ঞান অবস্থায়।

দেখছেন?

পরেও ছিল দেখবার। মেয়েটা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে থাপ্পড় কষে দিল লোকটার গালে। থাপ্পড়ে রাগ মেটে নি—অতঃপর ঘুসি ঝাড়ছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে পাশের প্রবীণটি তিড়িং করে তুড়িলাফ দিলেন।

পাগলের পাগলামি দেখুন মশায়। হি-হি-হি! হো-হো-হো!

হাসি ক্রমশ বাড়ছে আর নৃত্যও উদ্দাম হচ্ছে তদনুপাতে। আমি অবাক। এতক্ষণের সংযত গাম্ভীর্য ছিন্ন পোশাকের মতো ভদ্রলোক ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

চপেটাঘাত-প্রাপ্ত লোকটা দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, রাসু দে এলো কি করে? কে আছিস, রাসু দে শিকল খুলে বেরিয়ে এসেছে।

ভৃত্যশ্রেণীর জন দুই ছুটে এসে আমার সঙ্গী ভদ্রলোককে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

লোকটি অতঃপর আমার দিকে কটমট চোখে চেয়ে বলল, কে আপনি? আশ্রমে ঢুকলেন কি করে? কেউ কিছু বলল না?

চিঠিটা দিলাম।

আমিই মশায়। আমার নাম সুদর্শন রায়।

সসম্ভ্রমে বলে, প্যারিবাবুর বন্ধু আপনি? তা আসুন আমার সঙ্গে।

কিন্তু যাওয়া হল না। পরীর মতো এক তরুণী বধূ এসে উপস্থিত সেই মুহূর্তে।

অভিমানাহত কণ্ঠে বধূ বলে, পাঁচটা বাজল। সিনেমার টিকিট করে এনেছে। তুমি সমস্ত ভুলে বসে আছ।

সুদর্শন বলল, কি করি বলো সবিতা। কাজের চাপ। আবার এই ভদ্রলোক আশ্রম দেখতে এসেছেন। প্যারিবাবুর বন্ধু।...দেখবার কি-ই বা আছে—পাগল-টাগল দেখিয়ে দিই দু-পাঁচটা।

দূর হতে দেখতে পাচ্ছি, সুদর্শন একটা হাত দিয়েছে সবিতার কাঁধে। মৃদুকণ্ঠে বলতে বলতে যাচ্ছে দুজনে, ক্ষণে ক্ষণে হেসে উঠছে। পৃথিবীতে এমন সুখী দম্পতি বোধকরি আর দ্বিতীয় নেই।

ঘড়ি-চুরি

ঘড়ি হারিয়েছে ডাক্তার প্রফুল্ল সরকারের। দামী টেঁক-ঘড়ি। ডাক্তার সরকার সম্প্রতি এখানকার সরকারি ডাক্তারখানায় বদলি হয়ে এসেছে। নরোত্তম তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছেন।

নরোত্তম অত্যন্ত মিশুক মহাশয় ব্যক্তি। বুড়া বয়সে কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে ইদানীং পতঞ্জলি-দর্শন নিয়ে মেতে আছেন। এখানকার আদিতম বাসিন্দা—সেজন্য একধরনের গর্ব আছে মনে মনে। যে কোনো বিশিষ্ট লোক এ শহরে আসেন, নরোত্তম তাঁকে বাড়িতে ডেকে আপ্যায়ন করে থাকেন। এটা তাঁর চিরকালের রীতি

প্রফুল্ল ছাড়াও নিমন্ত্রিত হয়েছেন ছোট-দারোগা শৈলবিহারী, পাটবাবু অজয় এবং পরমেশ। পরমেশের পরিচয় এক কথায় দেওয়া চলে না। পূর্ববঙ্গে কোথাকার জমিদার তারা, রাজা উপাধি ছিল নাকি একসময়ে পূর্বপুরুষদের। সম্প্রতি দেশ স্বাধীন হওয়ার দরুন উদ্বাস্তু হয়ে এইখানে ডাকবাংলোয় এসে উঠেছে—ব্যবসাপত্রের সুবিধা হয় কিনা খোঁজখবর নিচ্ছে। সে সুবিধা কোনোদিনই হবার সম্ভাবনা নেই—মিহি-গলা অতিশয় ক্ষীণ-প্রাণ মানুষটি, পোশাক ও চালচলনে বনেদি গরিমা ঠিকরে বেরোয়। এ হেন পরমেশ ভুসিমাল কিংবা কাপড়ের মহাজন হয়ে বসেছে, ভাবতে পারা যায় না।

সর্বাগ্রে অজয় এবং অনতিপরে প্রফুল্ল ও শৈলবিহারী এসে পড়ল। আটটা বেজেছে, সবে মাংস চেপেছে তখন। রান্নার অনেক বাকি। নরোত্তম অপ্রতিভ হলেন—তাসখেলায় বসিয়ে দিলেন সময় কাটাবার জন্য। চতুর্থ খেলুড়ের অভাবে নরোত্তম নিজেই বসলেন তাঁদের সঙ্গে। কিন্তু তাঁকে দিয়ে এসব হয় না, দার্শনিক লোক—হরতন ডাকতে রুইতন ডেকে বসেন, সাহেব-গোলামের চেহারার তফাত ধরতে পারেন না অনেক সময়।

তার পরে পরমেশ এল। নরোত্তম উঠে পড়লেন—পরমেশের হাতে তাস দিয়ে বেঁচে গেলেন তিনি। রান্নাঘরে ঠাকুরকে তাগাদা দিয়ে এলেন একবার। ক-টা বাজল দেখতে গিয়ে নজর পড়ল, টাইমপিসটা বন্ধ হয়ে আছে দম দেওয়ার অভাবে। মিলিয়ে নেবার জন্য এলেন এঁদের কাছে।

খেলা ইতিমধ্যে বড্ড জমেছে। প্রফুল্ল পকেট থেকে ঘড়ি বের করে টেবিলে রাখলেন। মিলিয়ে দেখে নিয়ে নরোত্তম চলে গেলেন।

তাসের তু-বাজি উঠে গেছে, অনেক রাত হয়েছে, গৃহকর্তার সাড়া নেই এখনো। পোলাও চেপেছে, তার সুগন্ধ আসছে নাকে। কিন্তু প্রফুল্ল ডাক্তারের পক্ষে আর পনেরো-বিশ মিনিটের বেশি কোনোক্রমে থাকা সম্ভব নয়। পেনিসিলিন-চিকিৎসা হচ্ছে একটা রোগির, ইনজেকশনের সময় হয়ে এল। সময়টা সঠিক জানবার জন্য পকেট হাতড়ে দেখেন, ঘড়ি নেই। তুলতে যদি ভুলে গিয়ে থাকেন—টেবিল খুঁজলেন, টেবিলের তলায় ও আশে-পাশে উঁকিঝুঁকি দিলেন—কোনোখানে নেই। গেল কোথায় তা হলে? সোনার ঘড়ি—এ-বাজারে সাত-আট শ টাকা দাম তো বটেই—

বৃত্তান্ত শুনে নরোত্তম হন্তদন্ত হয়ে এলেন। কী লজ্জা, কী লজ্জা! ভদ্র-লোককে বাড়িতে আহ্বান করে এই ঘড়ি-চুরির কারণ হলেন। কি ভাবছেন উনি মনে মনে?

জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো চাকর-বাকর কি বাইরের কেউ এসেছিল, বলতে পারেন?

না—

আপনারা খেলছিলেন তদ্গত হয়ে। এমন হতে পারে, এসেছিল—দেখতে পান নি।

শৈলবিহারী রীতিমত মুগুর ভাঁজে, কসরত করে। কথাবার্তা তার পালোয়ানি ধাঁচের। বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ—খেলছিলাম। ধ্যান করছিলাম না চোখ বুজে। কেউ এলে নির্ঘাত নজরে পড়ত।

অজয় বলে, নরোত্তমবাবু, আপনি সেই যে ঘড়ি মিলিয়ে চলে গেলেন, আর কেউ আসে নি—এসম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ। তা হলে এখন আমাদের উচিত, প্রত্যেকের সঙ্গে কি আছে না আছে সর্বসমক্ষে দেখিয়ে দেওয়া। তোমার তো সার্চ করা অভ্যাস আছে শৈলদা, আমায় দেখে নাও।

বলে সে উঠে দাঁড়াল। এবং শৈলবিহারীও বিনা দ্বিধায় তার পকেট উলটে জামা খুলে কোমর টিপে যথারীতি তল্লাস করছে।

নরোত্তম হাঁ-হাঁ করে ওঠেন।

আঃ, কি হয়েছে তোমাদের? তোমরা কেউ চুরি করেছ, এ কি স্বপ্নেও ভাবা যায়?

শৈলবিহারী বলে, কিন্তু ঘড়ির পাখনা গজায় নি, উড়ে যেতে পারে না—

অশেষবিধ পরীক্ষান্তে অবশেষে শৈল রায় দিল, ঠিক আছে। এবার আমায় দেখে নাও তোমরা কেউ।

পরমেশের মুখ কালো। উঠে দাঁড়িয়েছে সে।

আ-হা, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন পরমেশবাবু? আমার হয়ে যাক আগে। তারপর আপনার—

পরমেশ ততক্ষণে দরজা অবধি চলে গিয়েছে। অস্পষ্ট কণ্ঠে সে বলল, চললাম আমি—রাত্রি হয়ে গেছে·· মনে ছিল না—এখুনি ভয়ানক একটা কাজে—

ভয়ানক কাজের সম্বন্ধে পরিষ্কার কিছু বোঝা গেল না, কথা শেষ না করেই সে রাস্তায় পড়ল। হনহন করে অতি-দ্রুত চলল।

দাঁড়ান পরমেশবাবু, দাঁড়িয়ে যান। আমরা সবাই যখন দেখাচ্ছি, আপনারও দেখিয়ে যাওয়া উচিত।

এসব পরমেশের কানেই গেল না। দস্তুরমতো দৌড়তে আরম্ভ করেছে।

আর দেখতে হবে না শৈলদা। ধরো। ওরই কাজ। রাজপুত্তুর সেজে বুজরুকি করতে এসেছে।

অজয় আর শৈল ছুটেছে। পরমেশও। কিন্তু ক্ষীণশক্তি পরমেশ কতক্ষণ পারবে শৈলবিহারীর সঙ্গে! গলি পার না হতেই শৈল তার হাত এঁটে ধরল।

আসুন—দেখিয়ে যেতে হবে আপনাকে—

টানতে টানতে তাকে আবার নরোত্তমের বৈঠকখানায় নিয়ে এল। পরমেশ কাঁদো-কাঁদো হয়ে ডাক্তারকে সালিশ মানে।

দেখুন—অন্যায়টা দেখুন। ভুল হয়েছে এঁদের সঙ্গে মেলামেশা করা। ভদ্রলোকের মান-সম্ভ্রম বোঝেন না।

পরমেশ প্রাণপণে কোটের দু-প্রান্ত এঁটে ধরেছে। খুলতে দেবে না কিছুতে। অতএব কিছুমাত্র সংশয় নেই, কোটের নিচে সিল্কের শার্টের পকেটে সেই ঘড়ি। শৈলবিহারীর বিষম রাগ হয়েছে—সজোরে সে চেপে ধরল পরমেশের নরম তুলতুলে হাত দুটো। যেন বজ্রকঠিন সাঁড়াশি দিয়ে তার হাত চেপে ধরেছে—এমনি মনে হল পরমেশের। কব্জি মটমট করে। চোখে তার জল বেরিয়ে এল।

কিন্তু করুণা নেই। ভদ্রবেশী চোরদের এমনি শিক্ষা দিতে হয়। শৈল

হাত ধরে রাখল, অজয় কোটের বোতাম খুলতে লাগল। কোটের নিচে সদ্য পাট-ভাঙা নিভাঁজ ঐ শার্টের বুক-পকেট এবং তলার পকেট দুটো খুঁজে দেখলে—

ও হরি! পকেট কোথায়—শার্টই নয় পুরোপুরি! কলার ও হাতার যতটা বাইরে বেরিয়ে আছে, সেইটুকু পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। বাকি অংশ প্রায় নেই—যা আছে শতচ্ছিন্ন, সেলাই-করা।

এই রাজপুত্র পরমেশ!

আর এদিকে এরা যখন পরমেশকে তাড়া করেছে, হঠাৎ কি মনে পড়ে নরোত্তম উপরে ছুটে গেলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নামছেন এই সময়।

এই যে ঘড়ি। আমি নিয়েছিলাম। ভুলো-মন—সময় ঠিক করে টাইম-পিসের বদলে ওঁর ঘড়িটাই নিয়ে উপরে রেখেছিলাম। টাইমপিস ঐ যে—ওখানে পড়ে টকটক করছে।…এঃ-হে-হে—পরমেশের জামার এ দশা করল কে?

শৈলবিহারীর হাত ছাড়িয়ে পরমেশ দু-হাতে মুখ ঢেকে ছুটে বেরুল। পরদিন শোনা গেল, সে শহর ছেড়ে চলে গেছে।

পদ্ম

(১)

সেই সাড়ে দশটার সময় নাকে-মুখে চাট্টি ভাত গুঁজে বেরিয়েছিল। গ্রামারের ক্লাস পর পর পাঁচ ঘণ্টা। ছুটির পর এখন পদ্ম বাসায় ফিরছে। মুখ শুকনো, টলতে টলতে আসছে।

জুয়েলারির দোকানের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। পুজোর বাজার। কী চমৎকার সাজিয়েছে ছবি আর কাগজের ফুল-পাতা দিয়ে! দৃষ্টি ফেরানো যায় না। শো-কেসের কাছে এল। রোজ সে এই পথে ফেরে, রোজই দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে। কাচের ওপারে ঝিকমিক করে কত কি গয়না! একটু-খানি দাঁড়িয়ে দেখে নিশ্বাস ফেলে চলে যায়।

আজ একটা নতুন জিনিস দেখল—একটা আংটি। হালকা জিনিস—কিন্তু প্যাটার্নটি অভিনব। ডাঁটাসমেত একটি পদ্মফুল বৃত্তাকার হয়ে যেন আংটি হয়েছে। নিখুঁত মিনার কাজ করে ফুল ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সোনার উপর। সত্যি, চমৎকার জিনিসটা। তার নাম পদ্ম—নামের সঙ্গেও মানান হবে। ইস্কুল থেকে আজকেই পূজা-বোনাস দিয়েছে পঞ্চাশ টাকা—ভ্যানিটি-ব্যাগে পুরোপুরি পাঁচখানা নোট। একটু ইতস্তত করে পদ্ম দোকানের ভিতর ঢুকে পড়ল।

আংটি শো-কেস থেকে বের করাল। হাতে নিয়ে মশগুল হয়ে গেল। আর ফেরত দিতে ইচ্ছে করে না।

দাম শুনে পদ্ম স্তম্ভিত হয়ে যায়। পঁচাত্তর!

এই তো জিনিস! সোনা কতটুকু আছে, কিসে অত দাম?

সোনার দাম নয় ম্যাডাম, জয়পুরি কাজ দেখতে পাচ্ছেন—তার দাম। আংটি তো কত পরে থাকেন, এটাও পরে দেখুন না। আঙুলে কেমন মানায় দেখুন।

পদ্ম বলে, অত টাকা নেই আমার কাছে এখন। রেখে দিন, কাল নিয়ে যাব।

থাকে তো নিশ্চয় পাবেন। কিন্তু কালকের দিন অবধি পড়ে থাকবে বলে মনে তো হয় না। একেবারে টাটকা ডিজাইনের কিনা! পারেন তো আজকের মধ্যেই নিয়ে যাবেন।

(২)

ঝকঝকে প্রকাণ্ড এক মোটর ব্রেক কষে থেমে গেল ফুটপাথের ধারে। রুবি মুখ বাড়াল।

পদ্ম না? আজকে মাত্র কলকাতায় এসেছি, আজই দেখা হয়ে গেল তোর সঙ্গে। আয়—

সাগ্রহে রুবি দরজা খুলে দিল।

পদ্ম বলে, না ভাই, আজ নয়। উঠেছিস তোর বড়মামার বাড়ি তো? যাব একদিন।

রুবি গলা খাটো করে বলে, যাস ভাই, নিশ্চয় যাস। একগলা কথা জমে আছে। গেল অঘ্রানে এক রোমান্টিক ব্যাপার ঘটে গেছে। সমস্ত বলব। কবে যাচ্ছিস?

পরশু-তরশু যাব একদিন। তারপর পদ্ম এমন ভাব দেখায়, হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল কথাটা। বলে, পঁচিশটা টাকা আছে ভাই রুবি? এক্ষুনি দরকার।

দশ টাকার নিচে খুচরা নোট না থাকায় রুবি তিরিশ টাকা দিল।

পদ্ম বলে, মাসের আর আটদিন বাকি আছে। পয়লা মাইনে পেয়েই টাকাটা দিয়ে আসব।

রুবি বলে, দিস কিন্তু—ভুলে যাস নে। এ ক-দিন ঘুমুতে পারব না ভাই, টাকা ফেরত দিবি কি না দিবি সেই ভাবনায়।

হাতে হাত ধরা ছিল, রাগের ভঙ্গিতে ঝাঁকি দিয়ে রুবি হাত সরিয়ে নিল। বলে, তিন বছরে তুই অনেক বদলে গেছিস পদ্ম।

গাড়ি চলে গেল। পদ্মও ভাবছে, তিন বছরে অনেক বদলেছে রুবি। মোটা হয়েছে, আর রঙ যেন ফেটে পড়ছে। হবে না কেন, ভালো খাচ্ছে, ভালো পরছে, বাপের সঙ্গে দিল্লি-সিমলা করে বেড়াচ্ছে। বিয়ে হয়ে গেছে নাকি? যখন হাতে হাত ধরেছিল, চুড়ির মধ্যে দেখল যেন লোহা।

(৩)

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। সমর এসেছে। সে পদ্ম এখন আর নয়। কাজল-রেখায় চোখ দুটি দীর্ঘায়ত, প্রসাধন-মার্জিত মুখখানা উজ্জ্বল আলোয় ঝিকমিক করছে। হীরার মতো দাঁত—হাসছে, যেন আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে।

একটা জিনিস কিনেছি আজ—

কি?

বলব না তো। এই আমার মুঠোয় আছে। ক্ষমতা থাকে কেড়ে নাও কেমন পার।

হুটোপাটি শুরু হয়। সমর দৌড়ে আসে। পদ্মও দৌড়চ্ছে। আঁচল মেজেয় লুটায় দৌড়তে গিয়ে।

হঠাৎ সমর থমকে দাঁড়াল।

কি হল? হেরে গেলে, স্বীকার করো।

দুমদাম মেজেয় আওয়াজ হচ্ছে বড্ড। কেউ যদি এসে পড়ে!

হেরে গিয়েছ তা হলে, কেমন? পদ্মর চোখে বিদ্যুৎ, মিষ্টি-মিষ্টি হাসি ঠোঁটে মাখানো। বলে, আচ্ছা—কাছে এসো। দেখাচ্ছি। কিন্তু—

লীলায়িত ভঙ্গিমায় পদ্ম আবার কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়াল। বলে, না—দাঁড়াও তুমি। আমিই গিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। হাত দুখানা উঁচু করো।

ডাকাতে রিভলবার ধরে হাত তোলায় যে রকম?

তা-ই—

বিনা প্রতিবাদে সমর দু-হাত মাথার দু-পাশে তুলে দাঁড়াল।

পদ্ম বলে, আর কথা দাও, হাত মোটে নামাবে না। নইলে কিন্তু যাচ্ছি না কাছাকাছি। গিয়ে আবার কোন বিপদে পড়ব!

সমর বলে, আচ্ছা, দিলাম কথা।

সাদা ধবধবে সিল্কের কামিজ সমরের গায়ে। পকেটের ভিতর আংটিটা ফেলে দিয়ে পদ্ম সরে এসে দাঁড়াল।

সমর বের করে দেখে বলল, বাঃ, খাসা! কিন্তু আংটি দিচ্ছ—পরিয়ে না দিলে নেব না তো!

পদ্ম বলে, মানে বোঝ আংটি পরিয়ে দেবার?

এনেছ যখন আমার জন্যে, পরিয়ে দিতেই হবে। নয় তো এই রেখে দিয়ে চললাম।

সমরের অনামিকায় আংটি পরিয়ে মুগ্ধ চোখে পদ্ম দেখতে লাগল। দেখে আর মিটিমিটি হাসে।

সমর বলে, দান করলে দক্ষিণা দিতে হয়।

যাও, বড্ড ইয়ে তুমি—

বিনা দক্ষিণায় দান অসিদ্ধ। শাস্ত্রের কথা। বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞাসা করে দেখো ঠাকুরমশায়কে।

পদ্ম আদেশ করল, চোখ বোঁজো তুমি। বুঁজেছ—দেখতে পাচ্ছ না তো?

হঠাৎ পদ্ম ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ে। তারপর এক পলকে পাশের দরজা দিয়ে অদৃশ্য।

সমর বলে, এ কি—বুলেট ছুঁড়লে পদ্ম, ছুঁড়েই ভীরুর মতো পলায়ন! সম্মুখ-সমরে এসো।

(৪)

মাইনে পেয়ে পদ্ম ধার শোধ দিতে গেছে। রুবি জড়িয়ে ধরল। বলে, দেখাতে পারলাম না বরকে ভাই। সন্ধ্যার পর এসেছিল, সকালবেলা এই

খানিক আগে চলে গেছে। শ্বশুরবাড়িও তো নয়, মামা-শ্বশুরবাড়ি—তাই মোটে আসতে চায় না। এলেও যতটুকু সময় থাকে, ছটফট করে—যেন জল-বিছুটি মারে ওকে। বাড়িও মিলছে না, ছোটখাট একটা বাড়ি পেলে উঠে চলে যাই—ঘর-গৃহস্থালি পাতি গিয়ে সেখানে।

তিনখানা নোট পদ্ম টিপয়ের উপর বই চাপা দিয়ে রাখল।

রুবি বলছিল, সাত দিনের মধ্যে বিয়ে-থাওয়া হয়ে গেল, একেবারে নবেলি ব্যাপার। কাউকে তাই খবর দিতে পারি নি। দিলেও কি আর যেতে পারতিস দিল্লি অবধি ?

হঠাৎ যেন সাপ দেখে পদ্ম শিউরে উঠল।

খাসা আংটি তো! দেখি—

রুবি আঙুল থেকে খুলে দিল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে, আমার বরের। চমৎকার রুচি ওর। আর আমার স্বভাব তো জানিস—ভালো জিনিস দেখলেই মন নেচে ওঠে, দখল না করা অবধি সোয়াস্তি পাই নে। মুখ ফুটে চাইলাম আংটিটা, তা ভাই কিছুতে দিল না, দুষ্টুমি করে হাত মুঠো করে রইল। মারামারি হল, ওর সঙ্গে কি করে পারব ভাই—জব্দ হলাম আমিই।

সেই জব্দ হবার স্মৃতি মনে পড়েই বুঝি মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল রুবি। বলে, আমিও নাছোড়বান্দা। ভোরবেলা ঘুমিয়ে ছিল, সেই সময় চুপিচুপি খুলে নিয়েছি। এমন মানুষ—যাওয়ার সময়টাও খেয়াল হল না।

পদ্মর মুখ সাদা হয়ে গেছে। ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, তোর বরের নামটা কি ভাই রুবি ?

ধ্যেত—বরের নাম বুঝি কেউ করে! পদ্মর কাছে এসে কানে কানে বলল। হেসে উঠল খিলখিল করে।

(৫)

সমরের হাত তুলে ধরে পদ্ম বলে, আংটি পরিয়ে দিয়েছিলাম, কোথায় তা ? খুলে রেখে এসেছ কেন ?

সমরের মুখ শুকাল।

তাই তো, কোথায় যে গেল! চুরি হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে। মন বড্ড খারাপ হয়ে আছে সেজন্য। বিশ্বাস করো, আমার এতটুকু অবহেলা ছিল না। তবু যে কেমন করে—

পদ্ম হাসতে লাগল। বয়ে গেছে, ভারি তো দাম!

সমর বলে, জিনিসটার দাম না হোক, তুমি যে দিয়েছিলে এত আদর করে—

কিছু না, কিছু না—

শান্ত মুখে পদ্ম আংটি বের করে আনল। বলে, রুবিকে দিয়ে দেবেন। আঙুলে পরে এক বন্ধুর কাছে যাব, সেজন্য চেয়ে নিয়ে এসেছিলাম। দরকার হল না, সে বন্ধু মরে গেছে।

পোস্টমাস্টার

(১)

অনেক লেখালেখি ও তদ্বির-তাগাদার পর নতুন পোস্টাফিস হল। বনমালী বিষম খুশি। বলেন, সরকারি আফিস—কতখানি ইজ্জত বাড়ল গাঁয়ের! ধরো না কেন—খবরের কাগজ যার নামেই আসুক, মোড়ক খুলে পড়ে নেওয়া যাবে; চিঠিপত্র বাসি হয়ে পচবে না হারান পিওনের ব্যাগে। আমার চণ্ডীকোঠা ছেড়ে দিচ্ছি, সেখানে আফিস হোক।

তাই হল।

এক ছোকরা—বনমালীরই স্বজাতি, কাঁথি না কান্দি কোথায় বাড়ি—এসেছে পোস্টমাস্টার হয়ে। বনমালী প্রস্তাব করলেন, একটি মানুষ—কেন মিছে রাঁধাবাড়ার হাঙ্গামা করবে? আমার বাড়ির উনুনে দিনরাত রাবণের চিতে জ্বলছেই, দু-সন্ধ্যায় বাহান্নখানা পাতা পড়ে। তার উপর একজন বাড়তি হলে খোঁজে আসবে না। তাই এসো বাবা, বড্ড খুশি হব।

সুধাংশু হেসে বলে, বেশ তো—

কিন্তু মোটঘাট এসে পৌঁছলে দেখা গেল, তুলে ফেলেছে সতীশ দত্তর দোতলায়। সতীশ দত্ত কলকাতায় থাকেন, তাঁর কি রকম আত্মীয়ের মধ্যে পড়ে নাকি সুধাংশু। বাড়ি তালা-বন্ধ থাকে—তালার চাবি পাঠিয়ে দিয়েছেন, আর বিষ্টু বলে একটা লোকও ঠিক করে পাঠিয়েছেন সতীশ।

মাইনে পঞ্চান্ন টাকা, কিন্তু সুধাংশু বেড়ায় যেন এক লাটসাহেব। ধোপ-দস্ত কাপড়-জামা রোজ সকালে ভাঁজ ভেঙে আফিসে পরে আসে, মাছ কিনতে

গিয়ে জেলের ডালার উপর ঝনাত করে পুরো টাকাটা ফেলে দেয়। লক্ষপতির ছেলে, বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে—এমনি নানা রটনা হতে লাগল সুধাংশুর সম্বন্ধে।

(২)

মাস দুই পরে বিকালবেলা সুধাংশু ঘাড় নিচু করে কাজ করছে, চুড়ির শব্দে মুখ তুলে দেখে—বনমালীর মেয়ে শোভা।

কি?

থাম দিন, পোস্টকার্ড দিন···উঁহু, পয়সা আনতে ভুলে গেছি। তা হলে মনি-অর্ডারের ফরমই দিন খানচারেক। ওর তো দাম লাগে না।

সুধাংশু বলে, দরজার উপরটায় চেয়ে দেখ নি বুঝি! ঐ যে—

নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছেন? ইংরেজিতে লেখা—মানে তো বুঝি নে—

বুঝিয়ে দিচ্ছি। সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। এটা আড্ডাখানা নয়।

শোভা বলল, তিন-পুরুষের চণ্ডীকোঠা আমাদের—

কিন্তু এখন সরকারি আফিস। আর সরকারি মানুষ আমি এখন।

তারপর হেসে উঠে সুধাংশু বলল, যাবার সময় তোমাদের বাড়ি হয়ে যাব। ভালো করে পান সেজে রাখগে মজা-সুপারি দিয়ে। তখন সরকারি মানুষ থাকব না।

(৩)

মাস চারেক কাটল। আষাঢ় মাস। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে আজ ক-দিন। কোনোদিকে কেউ নেই। কাজ ছিল না, টেবিলে চিঠির গাদার পাশে পা তুলে অফিসের ছুরি দিয়ে সুধাংশু নখের উপরটা আঁচড়াচ্ছিল। ছুটতে ছুটতে শোভা বারান্দায় এসে উঠল।

এই চিঠিখানা, মাস্টারবাবু, ডাক-বাক্সে না ফেলে আপনার হাতে দিতে বললেন বাবা।

খামের চিঠি, সুধাংশু ঠিকানা পড়ল। মুচকি হেসে বলে, ওঃ, ঝাঁপায় যাবে চিঠি, জরুরি চিঠি!

ভালো করে শোভার দিকে চেয়ে সে বিষম ব্যস্ত হল। ইশ, ভিজে জবজব হয়ে গেছ। কাপড় ছাড়গে যাও, অসুখ করবে।

শোভা বলে, আপনার জন্যেই তো! আপনার বিষ্টু এসেছিল, কাঠ অভাবে রান্না করতে পারছে না। চালাঘরে আমাদের চাল অবধি কাঠ বোঝাই। বাবার ভয়ে হাত দেবার জো নেই। কানাচে কচুবনে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কত কষ্টে চুরি করে ক-খানা বের করে নিয়ে এলাম।

সুধাংশু বলে, আমিও দেখেছি—কাঠের পাহাড়। কি হবে অত কাঠ?

আমার শ্রাদ্ধে যজ্ঞির রান্না রাঁধতে লাগবে। চিঠিপত্র হরদম আসছে যাচ্ছে—বুঝতে পারছেন না?

কেমন এক ধরনের হাসি হাসছিল শোভা। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখে সুধাংশু অবাক হয়ে গেল।

রোজ রোজ এত চিঠি যায় নাকি মাস্টারবাবু?

গর্বিতকণ্ঠে সুধাংশু বলে, এই ক-মাসে কত উন্নতি হয়েছে, তা হলে বোঝ।

তবে আর কাঠ-কাঠ করে কেন মরছে বিষ্টুচরণ? আজে-বাজে চিঠি কত যায় আসে, বাদলার দিনে তাতেই তো রান্না চলতে পারে।

হেসে ফেলে সুধাংশু বলে, কিন্তু কোনটা বাজে কোনটা কাজের বুঝব কি করে?

পড়ে দেখতে হয়, বুদ্ধি করে বুঝে নিতে হয়! লেখাপড়া শিখেছেন তবে কি করতে?

বলতে বলতে শোভা নেমে পড়ল। জোরে বৃষ্টি এল এই সময়টা। তবু সে থামল না, একদৌড়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। এলোচুলে জলের ধারা বেয়ে পড়ছে।

পরদিন সুধাংশু ঘাটে স্নান করতে যাচ্ছে, শোভা জলের কলসি নিয়ে ফিরছে, পলকের জন্য দেখা হল। সুধাংশু বলে, খুব বুদ্ধিটা বাতলে এসেছিলে ভাগ্যিস! বাজে চিঠি বাছতে শুরু করে দিয়েছি কাল থেকেই!

(৪)

ঝাঁপার ব্যোমকেশ মিত্তিরের ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। যা তাঁরা দাবি করেছেন, বনমালী মোটামুটি তাতেই রাজি। সেই মর্মে চিঠি লিখে দিয়েছেন। তারপর থেকে প্রতিদিনই আশা করছেন, পাত্রপক্ষ এসে পাকা দেখে যাবেন শোভাকে। কিন্তু না আসেন তাঁরা, না আসে চিঠির জবাব। বনমালীর কন্যাদায়—নিজেই শেষে একদিন ঝাঁপায় চলে গেলেন।

ব্যোমকেশ বললেন, তারপর ? কি মনে করে অ্যাদ্দিন পরে হঠাৎ ?

বনমালী অবাক হলেন। সে কি কথা !

ছেলের বিয়ে সাব্যস্ত করে ফেলেছি মশায়, আপনাদেরই পাশের গ্রামে—দহকুলোর রাহুতদের মেয়ে।

সে কি কথা ! আপনি যা চেয়েছেন, তাতেই তো রাজি হয়ে গেলাম—।

সেটা কি মনে মনে ? একখানা চিঠি অবধি দিলেন না। আমি উলটে দুখানা লিখলাম, জবাব দিলেন না। বেশ করলেন, উত্তম কাজ করলেন। ছেলে আমার ফেলনা নয়, দেখে নিন এবার।

ষড়যন্ত্র—চিঠি তা হলে সব মারা যাচ্ছে বেয়াই—

বনমালী ব্যাকুল হয়ে ব্যোমকেশের হাত জড়িয়ে ধরলেন। দহকুলোর সম্বন্ধ ভেঙে দিন। দিতেই হবে। আগে যখন আমার সঙ্গে কথা—

দেখি—বলে ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়লেন।

(৫)

রাগে ফুলতে ফুলতে বনমালী ফিরে এলেন। চণ্ডীকোঠার সামনে এসে খুব একচোট বচসা হল সুধাংশুর সঙ্গে।

ঝাঁপার চিঠিপত্র যায় সব কোথায় ?

জানি না।

জান তুমি সমস্ত। কালসাপ এনে বসিয়েছি। গ্রামসুদ্ধ মিলে দরখাস্ত দিচ্ছি তোমার নামে। চাকরি ছাড়িয়ে ঘরের ছেলে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ।

মুখ পাংশু হয়ে গেছে সুধাংশুর। বলে, বিদেশি মানুষ বলে যা-তা বলছেন আমায়। কেন, কি করেছি আমি ? কি প্রমাণ পেয়েছেন বলুন।

বাড়ির মধ্যে ঢুকেই ঝগড়া আর-এক দফা। গিন্নি রুখে এসে পড়লেন। কি লাগিয়েছিলে পোস্টমাস্টারের সঙ্গে ? বলতে গেলে আমাদেরই আশ্রয়ে রয়েছে—খামোকা তুমি ভদ্রলোকের ছেলেকে অপমান করে এলে ?

বনমালী ঘাবড়ে গেলেন।

কিন্তু ঝাঁপার চিঠিপত্রগুলোর কি পাখনা বেরোয়, উড়ে পালিয়ে যায় পোস্টাফিস থেকে ? শোভা নিজে হাতে করে ডাকে দিয়ে এসেছে—

শোভা তো! তবেই হয়েছে। নিজের মেয়ের কাছে ভালো করে তা হলে জিজ্ঞাসা করে দেখো আগে।

শোভা বাড়ি ছিল না, ডাকতে পাঠালেন।

বিস্মিত বনমালী স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, ব্যাপারটা কি? খুলে বলো তো।

গিন্নি চুপিচুপি বললেন, ঝাঁপায় বিয়ের নামে কেমন ঝিম-ধরা হয়ে যায় তোমার আহ্লাদি মেয়ে। ওখানে বিয়ে হয়, ওর মোটে ইচ্ছে নয়।

শোভা এসে দাঁড়াতে বনমালী জিজ্ঞাসা করলেন, চিঠিটা সেদিন ডাকে দিয়েছিলি তুই?

হুঁ—

গিন্নি বললেন, ঠিক করে বল মা। ভদ্রলোকের ছেলের নামে দরখাস্ত করতে যাচ্ছেন এঁরা। তার চাকরি যাবে। মনে আছে তো সেই চিঠির কথা?

হুঁ—

কি মনে আছে?

শোভা বলে, চিঠিটা ভিজে গিয়েছিল। উনুনের ধারে শুকোতে দিয়েছিলাম। তারপর—

বনমালী অধীর হয়ে বললেন, শুকোলে তারপর ডাকে দিয়ে এসেছিলি কি না, মনে করে বল।

না বাবা, উনুনের ভিতর পড়ে গিয়েছিল।

আপনা-আপনি? বনমালী মিটিমিটি হাসতে লাগলেন এবার। না কেউ ফেলে দিয়েছিল উনুনের মধ্যে? সত্যি কথাটা খুলে বল দিকি লক্ষ্মী মা আমার।

গিন্নি বললেন, সন্দেহ তোমার এখনো যাচ্ছে না? আমি বলছি, সে রকম ছেলে নয় আমাদের সুধাংশু।

(৬)

সুধাংশু ক-দিন পরে এসে বলল, চিঠি-চিঠি করছিলেন, এই নিন ঝাঁপার চিঠি। ডাকে এসে পৌঁছলে ঘরে আসে কিনা এই দেখুন। নিজে নিয়ে এসেছি। ডাকেই যদি না দেওয়া হয়, কিংবা পিওনের ব্যাগ থেকে যদি খোয়া যায়, সকল জবাবদিহি যেন আমার!

শোভার মুখ পাংশু হয়ে গেছে। সংক্ষিপ্ত চিঠি—

> পরম পোষ্টবরেষু, কথা হইয়াছিল—আপনি নগদ পণ পাঁচ শত টাকা মাত্র দিবেন। কিন্তু দহকুলার রায় মহাশয় হাজার অবধি দিতে প্রস্তুত। অতএব আপনি যদি দেড় হাজার অন্তত পক্ষে বারো শত পর্যন্ত উঠিতে পারেন—

পোস্টকার্ড নিয়ে বনমালী জবাব লিখলেন—

> পরম পোষ্টবরেষু, আপনার পুত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করা আহাম্মুকি হইয়াছিল। এখানকার পোস্টমাস্টার ছেলেটি লক্ষপতির সন্তান, তাহার স্বভাব-চরিত্রও অতি চমৎকার। পাত্র হিসাবে আপনার পুত্র তাহার পায়ের কাছে দাঁড়াইবার যোগ্য নহে। ঐখানেই আমাদের শুভকর্ম করিবার আন্তরিক ইচ্ছা। আশা করিতেছি, শ্রীমান দু-একদিনের মধ্যে আমাদের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করিবে। তাহা হইলে আপত্তির কিছুমাত্র কারণ থাকিবে না—

(৭)

উঠানে খণ্ড-প্রলয়। ব্যোমকেশ নিজে এসে পড়েছেন, সঙ্গে দুটো দরোয়ান। বলেন, দহকুলো থেকে ফিরছি মশায় লগ্নপত্র পাকা করে। কৈফিয়ত চাইতে এসেছি, কথাবার্তা ভেঙে গেল—তা বলে কি অধিকার আছে নাহক এমন অপমান করে চিঠি লেখবার ?

চেঁচামেচিতে পাড়ার লোকজন এসে পড়েছে। সকলের মাঝখানে বনমালীর সেই চিঠি ফেলে দিয়ে ব্যোমকেশ বলতে লাগলেন, বলুন আপনারা—ভদ্রলোক হয়ে ভদ্রলোককে কেউ লেখে এইরকম চিঠি ?

প্রবীণেরা বলতে লাগলেন, না বনমালী, অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছে। মাপ চাও তুমি মিত্তির মশায়ের কাছে।

মাপ চাইতে হল বনমালীর। সকলে মধ্যবর্তী হয়ে গোলমাল মিটিয়ে দিয়ে চলে গেল। সবাই চলে গেছে, সুধাংশু কেবল আছে। বনমালী গর্জন করে উঠলেন, তোমার জন্যই তো—

সভয়ে সুধাংশু বলল, আবার আমি কি করলাম ?

ঐ চিঠি চলে তো গেল দিব্যি তোমার হাত দিয়ে! মেয়ের বিয়ের দায়ে আমার না হয় মাথা খারাপ হয়েছিল, তোমার তো হয় নি!

তা হলে বুঝতে পারছেন, কোনো চিঠি কখনো আমি পড়ি নে—নষ্ট করা তো পরের কথা। মিথ্যে দোষারোপ করেছিলেন আমার উপর।

কেন পড় না, সেই তো দোষ। এত চেষ্টা-চরিত্র করে গাঁয়ের মধ্যে আমাদের নিজেদের ডাকঘর হল, পাকা ঘরখানা ছেড়ে দিলাম, আর সেই ডাকে কি যাচ্ছে না যাচ্ছে—একটাবার দেখেও দিতে পার না? কলিকাল এমনি বটে!

অপরাধীর মতো সুধাংশু চুপ করে থাকে।

বনমালী তখন নরম হয়ে বললেন, তা বেশ—আগে না দেখে থাক, দেখলে তো এখন চিঠি! আর এ নিয়ে কি কাণ্ডটি হয়ে গেল, তা-ও দেখলে। বলো, কি বলবার আছে এবার—

সুধাংশু বলে, সত্যি বলছি, শোভার বিয়ের সম্পর্কে—

একগাল হেসে বনমালী বললেন, হ্যাঁ—বিয়ের সম্পর্কেই তো! তা এত লজ্জা কেন আজকালকার ছেলের? বলো বাবা, খুলে বলো। শোভার বিয়ে দিতে হবে তোমার সঙ্গে? বেশ, বেশ—তাই হবে। আহা, বলছি তো—মত আছে আমাদের! তোমার বাবাকে চিঠি লিখে দাও—

ভুবনমোহন

কুঁজো, মিশকালো রঙ, দৈত্যের মতো চেহারা। নাম ভুবনমোহন।

মরার কথা বললে সে আগুন হয়ে ওঠে।

আমি কেন মরতে যাব হ্যাঁ? যাদের দশটা-পাঁচটা আছে তারা মরুক, চোখের জলের পাথার বয়ে যাবে। দেখতে ভালো, শুনতেও মজা।

আগে নাকি ভাই ছিল, ভাইপো-ভাইঝিরা ছিল—বাড়িতে কোলাহল, হুটোপুটি। কেউ নেই এখন। বড় ভিটেয় শশার মাচা। সাবেক কালে যেখানে রান্নাঘর ছিল, সেখানটায় তালপাতার কুঁজি বেঁধে নিয়েছে। একা মানুষ, এই ঢের। লোকে বলে, ঘটিতে করে কিছু টাকা নাকি পোঁতা আছে ঐ ঘরের মেজেয় তার মাদুরের তলায়। বাড়ির সীমানা ছেড়ে তাই সে নড়ে না। এখানে কোদাল পাড়ছে ঠুকঠুক করে, ওখানে ঘাস তুলছে—এই করে সারা দিনমান কাটায়। সন্ধ্যার পর টেমি জেলে দাওয়ায় বসে ভুড়ুক-ভুড়ুক করে তামাক টানে, একছিলিম শেষ হলে কলকে ঢেলে ফেলে নতুন করে আবার সেজে নেয়।

অলকা বলে মেয়েটা—এক চোখ কানা। কষ্টে পড়েছে, ধান ভেনে কুটনো কুটে দশ বাড়ি চেয়েচিন্তে খেত। এখন গৃহস্থেরই দিন চলে না। চুপিচুপি কখন এসে ভুবনের মাচার সবচেয়ে বড় শশাটা ছিঁড়ে ফেলেছে, ভুবন সেটা বীজ রেখেছিল। রাগের বশে সে বিষম এক থাপ্পড় কষিয়ে দিল মেয়েটার গালে।

অলকা কেঁদে উঠল। ভুবন গুম হয়ে দাঁড়িয়ে। অলকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, ভুবন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। শেষে বলল, মারব না? ভাত জোটে নি—মিথ্যে বলবার জায়গা পাস না? ভাতের বদলে শশা খেয়ে কেউ বাঁচে কখনো?

অলকা বলে, চাল ধারে দেয় না। দোকানি দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিল।

তাই এসে বললি নে কেন রে হারামজাদি? চল—বলে দিচ্ছি, দিয়ে দেবে সেরখানেক চাল।

তারপর থেকে দরকার হলেই অলকা দোকানে আসে, চাল নিয়ে যায়।

একদিন সে দোকানিকে বলল, কত দেনা হয়েছে, হিসাব দাও দিকি। মনিঅর্ডারে কিছু টাকা এসেছে। আজকে কিছু দিয়ে যাই, দু-দশ দিনের মধ্যে বাকি সমস্ত শোধ দিয়ে যাব।

দেনা এক পয়সাও নেই—

সে কি?

ভুবনমোহন সমস্ত শোধ করে যায়।

ভুবনের কাছে গিয়ে অলকা বলে, তোমার এই কাজ? হাতে একটা পয়সা ছিল না, চাল যুগিয়ে সেই সময় বাঁচিয়ে রেখেছ। পরশু তোমার নেমন্তন্ন—খাবে আমার ওখানে।

হাত ধরে বলে, যাবে তো?

নেমন্তন্ন-আমন্তন্ন—খুব বড়লোক হয়ে গেছিস নাকি?

হয়েছি—হয়েছিই তো! সাধ-আহ্লাদ কিছু থাকতে নেই বুঝি আমার! রেঁধে-বেড়ে বসে থাকব তোমার জন্যে—না যাও তো দেখো কি করি।

ভুবনমোহন ধবধবে কাপড় পরেছে, কাঁধে উড়ানি চাপিয়েছে। সাজসজ্জা করে নিমন্ত্রণ খেতে এল।

অলকারও বাহার খুব। মাথা ঘসেছে ক্ষার দিয়ে। কে দিয়েছিল আধ-

ছেঁড়া ছাপা-শাড়ি—শাড়িটা ফেরতা দিয়ে পড়েছে। আনন্দ উপছে পড়ছে তার চোখে-মুখে।

ভুবনমোহনকে দেখে বলল, এসে গেছ? আর এদিকে এক মুশকিল হয়েছে—আমার মামাতো ভায়ের শালা ঐ এসেছে। লড়ায়ে গেছল, চার বছর বাদে আজকে এল।

কাছে এসে চুপিচুপি বলে, ও-ই টাকা পাঠিয়েছিল মনিঅর্ডার করে। মাথা খারাপ—বলে কি জান?

হেসে এক চোখে ছেলেটাকে আর-একবার দেখে নিয়ে বলে, বিয়ে করে বর্মায় নিয়ে যেতে চাচ্ছে আমায়। বরাবর দেখেছি—যা জেদ ধরে, তাই করে তবে ও ছাড়ে। আস্ত পাগল!

ভুবনমোহন ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে আছে সেই আগন্তুকের দিকে।

অলকা বলল, আর মুশকিল হয়েছে। তোমার জন্যে রাঁধাবাড়া করেছিলাম—আট দশ ভাগে হয়েছিল—এসে খিধের চোটে গবাগব সমস্ত খেয়ে নিল। তা বোসো, ভাতে-ভাত চাপিয়ে দিচ্ছি—এক্ষুনি হয়ে যাবে।

ভুবনমোহন বলে, খেতে আসি নি—পাওনার হিসাবটা দিতে এসেছি। বিয়ে করে বর্মা যাবার আগে আমার পাওনা যেন মিটিয়ে যায়।

বাড়ি ফিরে দেখল, কে এসে ইতিমধ্যে মেজে খুঁড়ে তার সেই টাকার ঘটি নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

চাবুক

নতুন বর্ষা পেয়ে মেঘের মতো রঙ হয়েছে ধানবনের। দামিনী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। খেতের এক পাশে ধানবন খুব আন্দোলিত হচ্ছে। কোথাও কিছু নয়—যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে ঐ জায়গাটায়।

যা ভেবেছ, ঠিক তাই। আ'লের উপর বসে বলাই ভুড়ুত-ভুড়ুত করে

হুঁকো টানছে। মল বাজিয়ে দামিনী গিয়ে দাঁড়াল—তা বলাই মুখ তুলে দেখলই না একটিবার।

ঘোড়া কেন আমাদের খেতে ?

ঘোড়া জানে। ঘোড়াকে জিজ্ঞাসা করে আয় গিয়ে।

পাক দিয়ে পিছন ফিরে দামিনী বাড়িমুখো চলল।

চোখ পাকিয়ে বলাই বলে, এই—বাপকে বলে দিবি তো চাবকে পিঠের চামড়া তুলব।

চাবুক তুলতে গিয়ে দেখে দামিনী কোন ফাঁকে সেটা তুলে নিয়েছে। নরম বেতের চাবুক—মাথার দিকটায় শখ করে চামড়া দিয়ে বাঁধানো।

দিয়ে যা বলছি। আস্ত রাখব না কিন্তু। কামরাঙা খেতে যাবি তো পাড়ায় !

দামিনী দৌড় দিল।

মাদার বাড়ি ছিল না, হাটে গিয়েছিল। অতএব আপাতত বলতে হল না বলে দামিনী সোয়াস্তি পেল। বলল রাত্রে হাটের পর। তারপর কাঁদো-কাঁদো হয়ে বাপকে সামাল করে, কিছু বোলো না কিন্তু ওকে। বড্ড গোঁয়ার —খুন করে ফেলবে।

মাদার গরম হয়ে উঠেছিল, মেয়ের ভাব দেখে চুপ করে গেল। আচ্ছা আচ্ছা—শুতে যা তুই—

এর দিন চারেক পরে মাদার আর কৈলাস পাশাপাশি খেতে ধান নিড়াচ্ছে। মাদারের মন ভালো ছিল না। ধানের চারা ঐ রকম খাইয়ে খাইয়ে যায়—সযত্নে সে গোড়ায় মাটি চেপে দিচ্ছিল।

কৈলাস বলল, মেয়ের বিয়ে দাও মাদার। বিয়ের যুগ্যি হলে দেরি করতে নেই, চুকিয়ে দেওয়াই ভালো।

ভ্রূকুটি করে মাদার বলে, বুঝেছি কৈলাস, নইলে তোমাদের জুত হবে কিসে ? আমি চোখে ভালো দেখি নে, মেয়েটাকে সরাতে পারলে তোমার ঐ বজ্জাত বলাইটা আয়েস করে ধানগাছ কেটে কেটে ঘোড়ার মুখে দিতে পারবে !

কি কথার কি জবাব ! চটে গিয়ে কৈলাস বলে, মেয়ে তবে বীজ রাখবে নাকি—লাউমাচায় এক-একটা লাউ যেমন রেখে দেয় ? তাই হোক—ঘর-

গৃহস্থালির দরকার কি—মেয়ে চিরকাল তোমার ধান-খেতের খবরদারি করে বেড়াক।

মাদার জবাব দিল না। পাশাপাশি বেলা দুপুর পর্যন্ত খেত নিড়াল। একটিবার আর মুখ ফেরাল না ওদিকে।

বছর তিনেক পরে বিয়ের কথা আবার উঠল। বেশ ঘোরালো ভাবে উঠল এবার। কৈলাস তখন গত হয়েছে। মাদারকে জ্বরে ধরেছে, শয্যাশায়ী করে ফেলেছে তাকে। মেয়ে থুবড়ো—চলনে-বলনে দেমাক যেন ভেঙে ভেঙে পড়ে তার। কিন্তু কন্যাদায় সম্পর্কে কিছুমাত্র উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে না মাদারের। একদিন যজ্ঞেশ্বর মোড়ল নামক ও-পাড়ার মাতব্বর গোছের একজন এল তাদের দেখতে।

বলি, সমাজ একটা আছে কি না আছে—বলো তুমি মাদার? দশজনে যা সমস্ত বলে বেড়াচ্ছে, কানে ভালো লাগছে?

মাদার বলে, বাদার মধ্যে একলা এসে ঘর বেঁধেছি, উঁচু করে পাঁচিল দিয়েছি—কানে যাতে কিছু না যায়। তোমরা এসো না, কানে আসবে না তা হলে।

এমন মানুষ—এক-পা শ্মশানঘাটায়, এ অবস্থায়ও স্বভাব যদি কিছুমাত্র বদলে থাকে!

নাছোড়বান্দা যজ্ঞেশ্বর তবু বলে, শোনো—উৎকৃষ্ট সম্বন্ধ, কৈলাস মোড়লের ছেলে। ঘাড় নেড়ো না, শোনোই না ভালো করে—

কি শুনব আবার? মাদার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। চোর এক নম্বর—ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে আমার খেতের ধান খাইয়ে যেত।

ঘাড় নেড়ে যজ্ঞেশ্বর বলে, না গো দাদা, বলাই নয়—আমি কানাইয়ের কথা বলছি। বলাইকে তো আলাদা করে দিয়েছে। শোন নি?

মাদার ভারি খুশি হল, হাসিতে তার মুখ ভরে গেল।

দিয়েছে নাকি? যা বজ্জাত—বাড়ির ত্রিসীমানায় ওকে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়।

যজ্ঞেশ্বর বলে, তাই করেছে। সে গিয়ে খাল-পারে ঘর বেঁধেছে। তা বলো তুমি—ভাইয়ের জন্য ক-দিন আর লোকের গালমন্দ খেয়ে বেড়াবে? বাপের জমিজমা সমস্ত এখন কানাইয়ের। বাকি খাজনার দায়ে নিলাম হচ্ছিল, কানাই কিনে নিয়েছে।

কানাইর নামে মাদার নরম হল। ওরকম ছেলে তাদের সমাজে নেই—এ তল্লাটের ভিতর তো নেই-ই। বাংলা লেখাপড়া শুধু নয়, ইংরেজিতেও নাম সই করতে পারে। রেজেস্ট্রি-অফিসে দলিলপত্র লেখে—গোটা গোটা মুক্তার মতো হরফ অবলীলাক্রমে সাজিয়ে যায়—আটকায় না, ভাবতে হয় না এক মুহূর্ত।

কানাই বুঝি পাঠাল তোমাকে ?

আমতা-আমতা করে যজ্ঞেশ্বর শেষটা স্বীকার করল।

এক রকম তা-ই বলতে পার। অমন পাত্র পাবে কোথায় ? চার কুড়ি সাড়ে চার কুড়ি অবধি পণও দেবে বলেছে কানাই।

মাদার ভাবতে লাগল।

যজ্ঞেশ্বর বলে, বুঝে দেখো, ভালো করে চিকিচ্ছে হতে পারবে, ভালোমন্দ পথ্যি পাবে। কানাই জামাই হলে ভক্তি করে কত কি এনে দেবে দেখো।

ঘাড় নেড়ে মাদার বলল, তাই হবে। কিন্তু অষুধপথ্যির জন্য নয়। ভালো ছেলে সত্যি কানাই। আমি সেরেসুরে উঠি—বাজি-বাজনা করে আমোদ-স্ফূর্তি করে দু-হাত ওদের এক করে দেব।

মাদার আর সেরে উঠল না, সেই অসুখে মারা গেল। শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে যাবার মাস ছয়েক পরে একদিন কানাই নিজে এসে উপস্থিত।

দেখতে এলাম গো তোমাদের।

এ অঞ্চলে ইতিমধ্যে আরও খাতির বেড়েছে কানাইর। যেখানে যায় জলচৌকি এগিয়ে আসে, মেয়েরা ঘরের ভিতর থেকে পান সেজে ডিবেয় করে পাঠিয়ে দেয়।

এ হেন কানাই উঠানে দাঁড়িয়ে। ফরসা-কাপড়-পরা দামিনী চিনাটোলার মেলা দেখে চষা-খেত ভেঙে বাড়ি এসে উঠল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে গেল কানাই উঠানে দাঁড়িয়ে। ভালো-মন্দ একটা কথা বলল না—সোজা শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বগলা বলে দূরসম্পর্কীয় এক পিসি ঘরের কাজকর্ম দেখে। মাজা-বাসনের বোঝা নিয়ে সে আসছিল। এসে দেখে অবাক্—চোখে দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না।

দাঁড়িয়ে কেন, উঠে বোসো বাবা—

কানাই বলে, তবু ভালো পিসিঠাকরুন, তুমি দেখতে পেলে এতক্ষণে। আধ ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। ফরফর করে একজন তো ঘরে গিয়ে উঠল, মুখের কথাটা বলল না।

ও মেয়ে ঐরকম। রাগ কোরো না বাবা, বোসো—

রাগের কথা তো বটেই! কিন্তু এই মাস কয়েকের ভিতর চেহারা যা খুলেছে দামিনীর, ফরসা কাপড়ের আঁচল উড়িয়ে পাখা-মেলানো পরীর মতো যেমন করে সে সামনে দিয়ে চলে গেল, রাগ তাতে গলে জল হয়ে যায়। গলা বাড়িয়ে অন্তরঙ্গ স্বরে কানাই প্রশ্ন করে, দামিনীর বিয়ে দেবে না? মাথার উপর কেউ নেই—দেরি করা মোটেই কিন্তু উচিত হচ্ছে না।

বগলা নিম্ন কণ্ঠে বলে, কার কথা কে শোনে বাবা? ঐ যে বললাম—বিষম খামখেয়ালি। তা তোমায় সবাই মানে গণে, তুমি একটিবার বলে দেখো না। দাদার তো ইচ্ছেই ছিল তোমার হাতে সমর্পণ করবার।

প্রশান্ত কণ্ঠে কানাই ডাকল, দামিনী, শোনো দিকি একটু—

ঘরের ভিতর থেকে দামিনী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, কি?

এসো না এদিকে—

যা বলবার ওখান থেকে বলো। কান আছে, শুনতে পাচ্ছি।

দেখো, অ্যাদ্দিন মাদার-খুড়ো বর্তমান ছিলেন। এখন একেবারে একলা। এই বাদার মাঝখানে—সঙ্গী-সাথী কেউ নেই—

একলা হব কেন? আছে তো সঙ্গী-সাথী—

বগলা পিসি? ওঁর থাকা না থাকা সমান। বুড়ো মানুষ—সন্ধ্যে হলেই কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়েন।

খিলখিল করে হেসে ওঠে দামিনী। বলে, আরো আছে, আরো—

স্তম্ভিত হয়ে যায় কানাই। এমনি একটা সন্দেহ মনে আসে বটে! কার বলে সবাইকে সে এমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বেড়ায়? কানাঘুসো এই ধরনের দু-একটা কথাও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বেহায়া মেয়ে আজকে স্পষ্ট একেবারে মুখের উপর বলে দিল, পিসি ছাড়াও অন্য সঙ্গী রয়েছে তার। কানাইর সর্বশরীর জ্বলে উঠল। বলে, সে তো জানে সবাই। তোমার নিন্দেয় গ্রামের মধ্যে ঢি-ঢি পড়ে গেছে।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে দামিনী বলে, কে নিন্দে করে?

কে নয় বলো?

একজন যে তুমি, তা জানি। হঠাৎ মারমুখি হয়ে দামিনী উঠানে ছুটে এল।

বেরোও—

আমায় বলছ ?

হ্যাঁ। গ্রামে রটিয়ে বেড়াচ্ছ, আবার আমাদের উঠানে বসেও রটাবে ? বেরিয়ে যাও এক্ষুনি। থুঃ থুঃ—

পাড়ায় হৈ-হৈ পড়ে গেল। কানাইর অপমান! অনেকে জমায়েত হয়েছে কানাইর চণ্ডীমণ্ডপে। যজ্ঞেশ্বর বলে, ও মেয়ে তোমার বাগ্‌দত্তা কানাই। অমন বয়ে যেতে দেওয়া হবে না—আমাদের সমাজের অপমান। নিয়ে এসো হারামজাদীকে। সহজে না আসে, লোকজন পাঠিয়ে জোর করে ধরে আনো। এনে বিয়ে করে ফেলো। তখন কি করে দেখি। আমরা সব একজোট আছি, গ্রামসুদ্ধ তোমার পক্ষে।

বলাইও ছুটে এসেছে। বুকে থাবা মেরে সে বলে, লোকজন কিসে লাগবে একটা পুঁটকে মেয়ে নিয়ে আসতে ? পুরুতের যোগাড় দেখো, বিয়ে আজকেই। আমি এনে দেব মেয়ে। বিয়ে হয়ে গেলে তখন উঠতে ঝাঁটা বসতে ঝাঁটা। তাহলে সায়েস্তা হবে। এতবড় সাহস—আমার ভাইয়ের গায়ে থুতু দেয় !

এদের হাঁকডাকের খবর বাদার মধ্যে দামিনীর কানেও অল্পবিস্তর পৌঁছেছে। বগলা ভয়ে আধ-মরা—দামিনীর অবস্থা ঠিক ধরা যাচ্ছে না। সারা বিকাল বসে বসে সে মশাল বেঁধে নারিকেলতেলে ভিজিয়েছে। সন্ধ্যা হতে না হতে পাঁচিলের দরজা বন্ধ করে মশাল জ্বালিয়ে কলাগাছে ফুঁড়ে ফুঁড়ে দিল। ভিতরে সর্বত্র আলোকিত। বগলা দুর্গানাম জপ করছে।

শুধু মুখের আস্ফালন নয় বলাইর। দরজা বন্ধ দেখে একটা কাঁঠালগাছ বেয়ে উঠে অনেক কৌশলে পাঁচিলের উপর এসে দাঁড়িয়েছে, সেই সময় এদের নজরে পড়ল। যেন কালো পাষাণে গড়া নিটোল সমুন্নত মূর্তি—পাষাণের মতোই স্পন্দনহীন। মশালের আলো প্রতিফলিত হয়ে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে এই নিশিরাত্রে। বগলা আর্ত চিৎকার করে ওঠে। চাবুক হাতে ছুটে বেরিয়ে এল দামিনী। সেই চাবুক—বলাইর কাছ থেকে যা নিয়ে একদিন দৌড়

এক মুহূর্ত। বলাই লাফিয়ে পড়ে দামিনীর হাত এঁটে ধরল। হাতে

চাবুক ধরা আছে, তুলবার উপায় হল না। এমন কড়া হাতে বলাই ধরেছে যে কবজির হাড় বুঝি চুরমার হয়ে যায়! হুড়কো খুলে দড়াম করে পাঁচিলের দরজা খুলে ফেলল। কি ভেবে গোরুর দড়ি দিয়ে হাত দুখানা বেঁধে ফেলল দামিনীর। ঘোড়া ছিল বাইরে, ছোট পাখিটির মতো অবহেলায় তাকে তুলে নিয়ে বলাই ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়।

চলেছে, চলেছে। নিয়ে তুলল পৈতৃক বাড়ি—বলাইকে যেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আছড়ে ফেলে দিল ঘরের মধ্যে এক তক্তাপোশ ছিল তার উপর। যেমন লোকে কাপড়ের গাঁটরি কাঁধে করে এনে বোঝা ছুঁড়ে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে! ফেলে দিয়ে দাওয়ায় ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল একটা জল-চৌকির উপর। বলে, হুঁকো দাও—

আর জন পাঁচ-ছয় সেখানে। হাতে হাতে হুঁকো চলছিল। বলাইর অস্বাভাবিক রুক্ষ স্বরে, সকলে তার দিকে তাকায়। টেমির ক্ষীণ আলোয় মুখ-ভাব ঠাহর হল না। আপন মনে হুঁকো টানছে বলাই তখন।

কানাই এসে চমকে উঠল। আহা-হা, নড়ে-চড়ে না—মরে গেছে নাকি? একেবারে মেরে এনেছিস?

দামিনী কেঁদে বলল, কেমন করে বেঁধে এনেছে দেখো। হাত কেটে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

সকল অপমান ভুলে কানাইর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। বলে, ওটা পশু। ধরে আনতে বললে বেঁধে নিয়ে আসে।

বাঁধন খুলতে খুলতে বলাইকে লক্ষ্য করে বলে, কি করেছিস দেখ দিকি?

বলাই বলে, অত বেঁধেও চাবুকটা তবু ছাড়ানো যায় নি। ঠিক মুঠো করে নিয়ে এসেছে।

বন্ধনমুক্ত দামিনী তখন উঠে বসেছে। এক ঝলক দৃষ্টি দিল বাইরে বলাইর দিকে, দৃষ্টির আগুনে ঝলসে দিতে চায় যেন। ভালো লাগছে না বলাইর, মোটেই ভালো লাগছে না। অকারণে প্রশ্ন করে, বিয়ে আজকেই তা হলে?

ডাকাত মেয়ে হাত খোলা পেয়ে—আক্রোশ তো বলাইর উপর—কিন্তু সপাসপ চাবুক মারছে কানাইকে। এত যত্নে বাঁধন খুলে দিল, আর এই প্রতিদান! বুকে পিঠে রক্ত ফুটে ফুটে উঠল। উন্মাদিনীর মতো দামিনী মারছে—বিহুনি খুলে গেছে, মুখের উপর চুল এসে পড়েছে কতকগুলো—কেশর-ফোলানো সিংহীর মতো দেখাচ্ছে তাকে। বলে, সঙ্গী-সাথীর কথা

বলেছিলাম সেদিন—এই যে, আমার চাবুক, তোমার ঐ গুণ্ডা ভাইটা দিয়েছিল আমায়।

লোকগুলো প্রথমটা হতভম্ব হয়ে ছিল, তারপর যে যা পেল হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল। দামিনীরও সংবিৎ ফিরেছে এতক্ষণে, ভয়ার্ত হয়ে বলাইর পিছনে ছুটে এল। এসে গুঁটিসুটি পিঠের আড়ালে দাঁড়িয়েছে।

প্রাণকেষ্ট ঢালি হাঁক দেয়, সরে যা বলাই। এত বাড় বেড়েছে! পিটিয়ে মেরে ফেলে ওকে খালের জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি।

বলাই সরে দাঁড়াল, কিন্তু বাহুবেষ্টন করে ঝুলে আছে দামিনী।

ঝটকা মার, ঝেড়ে ফেলে দে—

বজ্র-আঁটুনিতে চেপে ধরেছে, ঝেড়ে ফেলবে কার সাধ্য! পাহাড়ে মেয়ে—কিন্তু এমন নরম গা-হাত-পা যেন কে একখানা নরম তুলোর গদি বিছিয়ে দিয়েছে বলাইর পিঠে।

তোরই কারসাজি তবে? ডুবে ডুবে জল খাস।

প্রাণকেষ্ট লাঠি তুলল বলাইর মাথা লক্ষ্য করে। বাঁ-হাত দিয়ে ঠেকাতে গেল, বাঁ-হাতে পড়ল লাঠি। ছুটে গিয়ে আবার বলাই ঘোড়ায় চাপল।

অনেক দূর—প্রায় ক্রোশ খানেক এসে থামল তারা। কৃষ্ণাদশমীর চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নায় অদূরে দামিনীর বাড়ির নারিকেলপাতা ঝিলমিল করছে।

নামো—খেতটুকু হেঁটে চলে যাও। উঃ, কি ধকলটা গেল! বাড়ি গিয়ে এবার ঘুমোব।

দামিনী জবাব দেয় না। নামবার কোনো লক্ষণ নেই।

ভালো জ্বালা! তবে কি বাড়ির দুয়োরে নিয়ে তুলে দিতে হবে?

দামিনী বলে, তোমার বাড়ি চলো যাই। এ বাড়ি একা থাকব না, ভয় করে। আজকে তুমি এসেছিলে, কোনো দিন হয়তো আবার কে এসে পড়বে।

জননী জন্মভূমিশ্চ

চির-নির্যাতিত লোকনাথ।

ইংরেজ বিদায় হয়েছে। এইবার মনে হচ্ছে, বাকি দিনগুলো তাঁর শান্তিতে কাটবে।

সভা করছেন তিনি। লোকারণ্য। তিলধারণের স্থান নেই।

শ্রবণা আর শুক্লা ইস্কুলে পড়িয়ে ফিরছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূর থেকে শুনল একটুখানি। মোহময় বক্তৃতা—না বসে পারা যায় না।

ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না—অনেক দূরে তিনি। তার উপর মাইকে মুখ আড়াল করেছে। কিন্তু সুধা ক্ষরিত হচ্ছে যেন লাউড-স্পীকার দিয়ে।

> 'বন্দে মাতরম্—জননী ও জন্মভূমি একই দৃষ্টিতে দেখি আমরা। অসহ্য দুঃখ-দহনের পর অবশেষে মাতৃমুক্তি সম্ভব হল। বন্ধুগণ, মাকে আমরা আবার ষড়ৈশ্বর্যময়ী করে তুলব রচনাত্মক কর্মের মধ্য দিয়ে—'

জীবনভোর অনন্ত দুঃখ পেয়েছেন—দুঃখ-দহন কথাটা ওঁরই মুখে মানায়, সত্যি।

প্রথম জীবনে বিলাতি সওদাগর-অফিসে চাকরি করতেন। গোলামি ধাতস্থ হল না, বচসা বাধল বড়-সাহেবের সঙ্গে। তহবিল-তছরুপের দায়ে ফেলে জেলে পুরবার আয়োজন করল তারা। ষড়যন্ত্র ফেঁসে গেল শেষ অবধি। 'বন্দে মাতরম্'—বলে হাসতে হাসতে কাঠগড়া থেকে লোকনাথ নেমে এলেন!

লবণ আইন-ভঙ্গ নিয়ে যখন ডামাডোল, সেই সময় ডাকাতি-কেসে ফেলে দ্বিতীয় বার লোকনাথকে জব্দ করবার চেষ্টা হয়। সাহেব জজ ঠেসেও দিয়েছিল তিন বছর। হাইকোর্টের আপিলে খালাস পেয়ে গেলেন। বিপুল জনতা ফুলের মালা পরিয়ে মুহুর্মুহু 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি সহ শোভাযাত্রা করে লোকনাথকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল।

নির্যাতিত লোকনাথকে করপোরেশনে পাঠাবার প্রস্তাব হল। দু দুবার জেল পিছলে বেরিয়ে এসেছেন—করপোরেশনের পক্ষে অতিশয় উপযুক্ত ব্যক্তি, সন্দেহ নেই। রাজি ছিলেন তিনিও। পার্কে পার্কে সভা-সমিতি শুরু হয়েছে—একদিন ইট খেয়েও গেছে বিপক্ষদলীয় লোক সভা করতে এসে। এমনি সময় লোকনাথের স্ত্রী-বিয়োগ হল। ইষ্টকাহতের দল রটনা করতে লাগল, প্রচণ্ড

একটি চড়ে লোকনাথই সাবাড় করেছেন ভদ্রমহিলাকে। ইংরেজ বরাবর তাঁর শত্রু—এক দঙ্গল দেশি লোক দলে পেয়ে এবারে জুত হল তাদের। ডাক্তার সাক্ষি দিলেন, হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়ে মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু সরকারি তরফের চারজন প্রত্যক্ষদর্শী হলফ করে উলটো কথা বলে গেল। জলের মতো টাকা ঢাললে চার কেন—চার শ প্রত্যক্ষদ্রষ্টাও হাজির করা যায়। ফলে ডাক্তারের ডিগ্রি বাতিল হবার অবস্থা। বার বার—তিন বারের চেষ্টায় সিদ্ধকাম হল চক্রিদল। লোকনাথের আট বছর জেল হল।

আট বছর পরে বেরিয়ে এসেছেন স্বাধীন ভারতে। এ পোড়া দেশের মানুষ ভোলা-মহেশ্বর—দু-দিনে সমস্ত বেমালুম ভুলে যায়। ইদানীং খবরের কাগজে ছবি ও জীবন-চরিত বেরোবার পর আবার সকলের চাড় হয়েছে। করপোরেশনে যাচ্ছিলেন—এবারকার যা অবস্থা, রাইটার্স বিল্ডিং-এ মন্ত্রীর গদিতে চেপে না পড়েন! আট বছর একটানা জেল খেটে-আসা মানুষ—যাঁরা মন্ত্রী হয়ে আছেন, তাঁদের যোগ্যতা কোন হিসাবে বেশি লোকনাথের চেয়ে?

শুক্লা ও শ্রবণা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল চিরলাঞ্ছিত লোকনাথের জীবন-কথা। সভার এক উদ্যোক্তার কাছ থেকে তাঁর ঠিকানা যোগাড় করে নিল।

কষ্টিপাথরের মতো কালো লম্বা-চওড়া বিশাল পুরুষ লোকনাথ আধভাঙা বাড়ির দালানে খড়ম পায়ে খটখট শব্দে পায়চারি করছেন। অনেক উঁচু ছাত, প্রকাণ্ড এক-একটা কড়ি। এক প্রান্তে ঝোলানো লণ্ঠন থেকে গলগল ধোঁয়া উঠছে। লোকনাথের চলন্ত ছায়া অতি দীর্ঘ হয়ে দেয়ালে পড়েছে। দেখে মনে হয়, বিপুলকায় দৈত্য আক্রোশে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন নিঃশব্দ দৈত্যপুরীর ভিতর।

চা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন জরাজীর্ণ এক বৃদ্ধা। সাধারণ কাপে নয়—সে কাপ মানাতও না লোকনাথের আজানু-বিস্তার হাতে। এনামেলের বড় এক বাটি ভরতি চা।

এক পাক গিয়ে ঘুরে আসতে লোকনাথের নজর পড়ল। নিচু হয়ে বৃদ্ধার হাত থেকে চা নিলেন। সুড়ুত করে বৃদ্ধা অদৃশ্য হলেন অন্ধকার অলিন্দে।

এক চুমুক খেয়ে হাঁক দিলেন, এই—

তন্মুহূর্তেই সাড়া না পেয়ে পুনরপি গর্জন করে উঠলেন, এইও—

যেন সুন্দরবনের জঙ্গলে রয়্যাল-বেঙ্গল টাইগার গর্জাচ্ছে। আতঙ্ক-বিবর্ণ বৃদ্ধা কাছে এলেন।

ক চামচে চিনি দিয়েছ?

ছয়—

আট চামচে দিতে বলি নি?

হয় বৃদ্ধা ভুলে গেছেন, কিংবা ইনিই হয়তো বলতে ভুলেছেন।

বাঘের থাবার মতো প্রসারিত বাঁ-হাতে বৃদ্ধার সরু কণ্ঠদেশ মুঠো করে ধরলেন। ডান হাতে চায়ের বাটি ছিল রক্ষা। চায়ে আর-এক লম্বা চুমুক দিয়ে অতঃপর বাটি উঁচিয়ে বললেন, বউ মেরে নেতা হয়েছি, তোমায় মেরে নির্ঘাত শহিদ হব এবার।

বৃদ্ধা থরথর কাঁপছেন।

মনে থাকবে তো?

অস্পষ্ট স্বরে বৃদ্ধা কি বললেন। ধাক্কা দিয়ে লোকনাথ বাঁ-হাত তুলে নিলেন কণ্ঠদেশ থেকে। কোনো গতিকে টাল সামলে সরে পড়লেন বৃদ্ধা।

শ্রবণা ও শুক্লা স্তম্ভিত হয়ে থামের পাশে দাঁড়িয়েছিল। লোকনাথ এতক্ষণে তাকালেন তাদের দিকে। শুক্লার বুকের ভিতর কাঁপছে। শ্রবণা ঘেমে উঠেছে।

বাইরের লোক—বিশেষত অচেনা দুটি মেয়ের কাছে যথাসম্ভব স্বর মোলায়েম করে লোকনাথ বললেন, কি চাই তোমাদের?

থতমত খেয়ে শুক্লা বলে, বাড়ির মেয়েরা কোথায়?

স্ত্রী স্বর্গে গেছেন। মা-জননী আছেন। এই তো এখানেই ছিলেন তিনি। ওমা, মাগো, কারা এসে খুঁজছে তোমাকে—

শ্রবণার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, হাতে কি তোমার?

ফুলের মালা কাগজে জড়ানো ছিল। শ্রবণা সভয়ে কাপড় ঢাকা দিয়ে বলে, বাতাসা কিনে নিয়ে যাচ্ছি কালীবাড়ি ভোগ দেব বলে।

মা যেতে পারবেন না। এই সবে চা দিয়ে গেলেন। আটটার মধ্যে না খেলে আমার অম্বল হয়—মায়ের প্রাণ, নিজে তাই তাড়াতাড়ি রান্না চাপিয়েছেন।

আচ্ছা, আচ্ছা। একাই যাব আমরা।

রাস্তায় এসে তারা নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

কৃষ্ণা

গাড়ি ছুটেছে। একলা কৃষ্ণা আর বাপের বাড়ির বহু পুরানো ড্রাইভার। গ্রাম দেখতে বেরিয়েছে সে। শহরে জন্ম, শহরে মানুষ। বিমলের আদিবাস পাড়াগাঁয়ে হলেও ইদানীং সে শহরে কায়েমি হয়েছে, তারও কোনোদিন পাড়াগাঁয়ে বসবাসের প্রয়োজন হবে না। পৈতৃক ঘরবাড়ি গাছপালা ও ধানজমি সম্পর্কে এখনো কিছু মোহ আছে, কিন্তু কৃষ্ণা প্রশ্রয় দেয় বলেই টিকে আছে সেটা। শনিবারে শনিবারে দেশে যাওয়া এক ধমকে কৃষ্ণা বন্ধ করে দিতে পারে। শনিবার সন্ধ্যার গাড়িতে চলে যায়, সোমবার ন-টা বাজতে বাজতে বাসায় ফেরে। সপ্তাহান্তিক অনুপস্থিতিটুকু ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মিত। কৃষ্ণা কখনো যায় নি তার সঙ্গে। পাড়াগাঁর সম্পর্কে তার বড় ভয়। ধাবমান রেলগাড়ির জানলা দিয়ে পাড়াগাঁর সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়। শিয়ালদহ স্টেশন ছাড়লেই তার মতে বাঙাল-দেশের আরম্ভ, জল-জঙ্গল বাঘ-কুমিরে ভরা ভদ্রমানুষের বাসের অযোগ্য জায়গা। সেই মানুষ আজ পাড়াগাঁয়ে চলেছে একলা। শিয়ালদহ অতিক্রম করে যশোর রোড ধরে যাচ্ছে।

দাদার মোটরটা নিয়ে চলেছে। রেলগাড়ির চেয়ে মোটরে ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পাওয়া যাবে। পাড়াগাঁয়ের উপর বিমলের আকর্ষণ কেন, তার একটু ধারণা পেতে চায়। দুপুরে কলকাতায় ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া করবে, সেই আন্দাজে যেখানে যত দূর খুশি চলুক—এই কথা বলে দিয়েছে ড্রাইভারকে।

মনটা খারাপ লাগছে। ছেলেপুলে হয় নি, স্বামীকে নিয়ে সংসার। তারই সঙ্গে গল্পগুজব, সন্ধ্যার পর কখনো বা হাত-ধরাধরি করে কিছুক্ষণ লেকের ধারে বেড়ানো। আট বছরের বিবাহিত জীবনে এই অভ্যাস মজ্জাগত হয়ে গেছে। বিশ্বভুবনে আর কিছু সে জানে না, জানবার প্রয়োজন বোধ করে না। বিমল শনিবারে রওনা হয়ে যাবার পর এই দুটো দিন সে দাদার বাড়ি গিয়ে থাকে, ভাজেদের সঙ্গে বেশ আমোদ-স্ফূর্তিতে কেটে যায়, সিনেমায় যায় কখনো কখনো। বিমল পৈতৃক বাড়ি গিয়ে মুখ বদলে আসে, কৃষ্ণারও মুখ বদলানো হয় ভাইয়ের সংসারে। তাই সে বিমলের দেশে যাওয়ায় আপত্তি করে না। বরং ভালোই হয়—পাঁচ দিনের পর দুটো দিন ছাড়াছাড়ি হয়ে ভালোবাসার নিবিড়তা যেন নূতন ভাবে অনুভব করে।

কিন্তু এবারের ব্যাপার আলাদা। সোমবারের পর আর তিন দিন কেটেছে, বিমল ফেরে নি। পাড়াগাঁয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে লাভ নেই, চিঠি দিয়েছে। সে চিঠির উত্তর আসার সময় পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারে নি, কাল রাত্রের গাড়িতে সরকার মশায়কে পাঠিয়ে দিয়েছে বিমলের গ্রামে। সারা রাত ঘুমোতে পারে নি, নানা দুশ্চিন্তা বিহ্বল করছে তাকে। সকালবেলা পড়েছে বেরিয়ে। বাইরের হাওয়ায় মন যদি খানিকটা শান্ত হয়।

হু-উ-উ-উ—চলেছে গাড়ি। রাস্তায় মাঝে মাঝে বাধা পাচ্ছে। গোরুর গাড়ি হয়তো পথ আটকে আছে, কিংবা হাটুরে মানুষ গজেন্দ্রগতিতে চলেছে—পথ ছেড়ে সরতেই চায় না। গাড়ি হর্ন বাজিয়ে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। পথের ধারে পুকুরে ছেলেরা জল দাপাদাপি করছে, মাঠে নিড়ানি দিচ্ছে চাষীরা. ঠাকুরতলায় গ্রাম-বধূরা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পুজো দিতে এসেছে। সমস্ত আজব লাগছে কৃষ্ণার চোখে।

মাইল-স্টোনে দেখল, সাতচল্লিশ মাইল এসে গেছে। আর নয়, ফিরবে এবার। বাসন মাজছে একটি বউ ঘাটের পাশে বসে। এক নজর দেখে কৃষ্ণা চমকে ওঠে। লীলার মতো মনে হয়। লীলা এখানে? হ্যাঁ, লীলাই তো। এই হাল হয়েছে লীলার!

কৃষ্ণা আন্তরিক দুঃখ বোধ করে। আবার প্রতিহিংসাবৃত্তিও কিছু কিছু চরিতার্থ যেন হচ্ছে তার। এক ক্লাসে পড়ত—সব দিক দিয়ে খাটো ছিল সে লীলার তুলনায়। লীলার চেহারা রাজরানীর মতো, প্রখর বুদ্ধি-দীপ্তি মুখের উপর। ক্লাসের দিদিমণিরা অধিকাংশ সময় তার দিকে তাকিয়ে পড়াতেন, প্রশ্ন করতেন তাকেই। যেন একমাত্র সে বুঝতে পারলেই হল, সে ছাড়া ক্লাসের মধ্যে আর কেউ নেই। রাগ হত কৃষ্ণার। তার নেভি-ব্লু রঙের অতিকায় মোটরগাড়ি ও নতুন নতুন শৌখিন সাজসজ্জা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ত লীলার গরিবানার সামনে।

লীলাও দেখেছে তাকে। তাড়াতাড়ি রাস্তার উপর এসে কলকণ্ঠে সে অভ্যর্থনা করল, কি ভাগ্যি! এসো, এসো—ঐ বাড়ি আমাদের। ছেলে অন্নপথ্য করবে, হাঁড়িটা তাড়াতাড়ি মেজে নিচ্ছিলাম ভাত চাপাব বলে।

কৃষ্ণা বলে, এই অবস্থায় তোমায় দেখব স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

লীলা জবাব দিল, আমিও ভাই স্বপ্নেও ভাবি নি—মোটর হাঁকিয়ে এই এদ্দূর চড়াও হয়ে দেখতে আসবে আমার দুঃখ-কষ্ট। কি করা যাবে

বলো ! মার্চেণ্ট-অফিসের সামান্য কেরানি উনি—ঝি-চাকর রাখবার সামর্থ্য কোথায় ?

হাসছে, রাগ করে নি। আর মুখে যত দূর দুরবস্থার বর্ণনা করল, তা-ও নয় নিশ্চয়। ঝি আছে। তার উদ্দেশে ডেকে বলল, তোমার আর এক দিদিমণি সারদা—এতটুকু বয়স থেকে আমাদের দুজনের বড় ভাব। আমি হাঁড়ি নিয়ে যাচ্ছি—তুমি দিদি, বাকি বাসনগুলো মেজে ফেলো।

কৃষ্ণা লজ্জিত হল ! সত্যি, এভাবে আরম্ভ করা উচিত হয় নি তার। কোনো দিন সে জিততে পারবে না লীলার সঙ্গে ?

খোকা তিন বছরের। বড় বড় কোঁকড়া চুল পদ্মফুলের মতো মুখখানা ঘিরে আছে। কলরব শুনে জানলা দিয়ে সে উঁকি দিচ্ছিল।

লীলা বলে, এই দেখো। উঠে এসেছ তুমি ? তোমার দুষ্টুমির জ্বালায় যাই কোথায় ? দুষ্টুমি করে জল ঘেঁটে ঘেঁটে জ্বর বাধালে।

নূতন লোক দেখে খোকা ঝুপ করে বিছানায় পড়ে মুখ লুকায়।

চাঁদ আমার, মানিক আমার, লজ্জা কেন ? মাসিমামণি হই যে তোমার !

বিছানায় এসে কৃষ্ণা জড়িয়ে ধরে খোকনকে। বাপ রে বাপ—ক-দিন জ্বরে ভুগল, তবু জোর দেখো ! হাত সরিয়ে দিয়ে দূরে গিয়ে শোয়।

কৃষ্ণা বলে, তোর সন্তান-ভাগ্য দেখে হিংসা হয় লীলা। চোখজুড়ানো ছেলে !···ছেলের বাপকে দেখছি না যে ?

কালো-কুৎসিত বদমেজাজি মানুষ। তাকে দেখে আনন্দ পাবি নে।

মিথ্যে কথা। অমন হেসে হেসে বলতিস না তা হলে। মা-বাপ দুই তোরা সুন্দর। তাই এমন সোনার ছেলে জন্মেছে।

কৃষ্ণা গোপনে দীর্ঘশ্বাস চেপে নেয়।

লীলা জিজ্ঞাসা করে, তোর ছেলেপুলে ক-টা ?

ঘাড় নাড়ল কৃষ্ণা। মুখে বেদনার ছায়া। তারপর বলে, আচ্ছা মানুষ তুই। বাড়ির কর্তাকে ডাক দে, পরিচয় হোক।

বাজারে গেছেন, এক্ষুনি এসে পড়বেন। এসে আবার কলকাতায় ফিরবেন এগারোটার গাড়িতে। খোকা ভাত খাবে, তাই নিজে গেছেন জ্যান্ত মাছ আর ভালো তরিতরকারি কিছু কিনে আনতে। পরকে দিয়ে হয় না।

পাশাপাশি বিমলের কথা মনে পড়ে যায় কৃষ্ণার। কি কাণ্ডটা হবে, যদি একদিন কৃষ্ণা তাকে মার্কেটিং করতে পাঠায় ! অর্ধেক জিনিস আনবে না—

বাকি অর্ধেক যা আসবে, সম্ভবত তা সমস্তই ফর্দের বাইরের। তার ভালোমানুষ স্বামীকে ঠকিয়ে দেয় ঠগ-জোচ্চোর দোকানদাররা। অকস্মাৎ স্নেহে মন গলে ওঠে নিরীহ অবুঝ মানুষটির জন্য। আবার সপ্তাহে সপ্তাহে দেশে যাওয়া আছে জ্ঞাতি-ভাইদের কাছ থেকে সম্পত্তির হিসাব বুঝে নেবার জন্য। কি মাথামুণ্ডু হিসাব তারা বুঝিয়ে দেয়, কৃষ্ণা সঠিক না জানলেও অনুমান করতে পারে। এবার থেকে সে-ও দেশ-ভুঁয়ের একটু খবরাখবর নেবে, বিমলকে সাহায্য করবে। এখন ভালোয় ভালোয় ফিরে এলে যে হয়! আর তাকে যেতে দেবে না একা একা। অন্তুতপক্ষে সরকার মশায়কে সঙ্গে পাঠিয়ে দেবে।

লীলা বলে, তোর বর কেমন হয়েছে--সে কথা বললি না তো কিছু।

মুখে বলে কি হবে, চোখে দেখবি। আমাদের নতুন বাসায় যেতে হবে তোকে। না হয় আমরাই দুজনে একসঙ্গে একদিন হানা দেব এখানে। এমন-কিছু দূর তো নয়! পাড়াগাঁয়ে আসতে ওঁর ভারি স্ফূর্তি—গ্রামের ছেলে কি না!

লীলা বলে, আমাদের উনি ঠিক উলটো। এখানে যেন জলবিছুটি মারে। কলকাতায় মেসে গিয়ে না ঢোকা পর্যন্ত সোয়াস্তি পান না।

একটু চুপ করে থেকে বলে, কারণ অবিশ্যি বুঝতে পারি। ছা-পোষা কেরানির যা হয়! পাজি মনিব—মোটে ছুটি দেয় না। খোকার অসুখে ক-দিন কামাই হচ্ছে, তাই যেন পাগল হয়ে উঠেছেন। সকালবেলা খানিক ঝগড়াঝাটি হয়ে গেল এই নিয়ে।

কণ্ঠস্বরে বেদনার আভাস। এতক্ষণের কথাবার্তায় ভব্যতার ব্যবধান দূর হয়ে গেছে। স্বামীর প্রসঙ্গই চলতে লাগল দুজনের মধ্যে।

কৃষ্ণা বলে, আমাদের বাবুটির ঝগড়া করবারও মুরোদ নেই। সাত চড়ে রা করেন না। তুই বল না ভাই লীলা, পুরুষমানুষের অমন গোবেচারা হলে চলে?

লীলা বলে, অবস্থার গতিকে স্বভাব বদলে যায় ভাই। উনিও কি বদ-মেজাজি ছিলেন আগে? দশ রকম রান্না করিয়ে মানুষজন ডেকে খাওয়াতে ভালোবাসতেন। কত খাইয়েছেন! নিজেও খেতেন খুব। এখন সব গেছে। সাধ্য নেই, সময়ও নেই।

কৃষ্ণা বলে, আমাদের উনি? পাখির আহার—বকে-ঝকে যা দুটো খাওয়াতে পারি। আর্টিস্ট লোক—এমন সুন্দর সুন্দর সব ছবি আঁকেন! ধুলো আর যেসব মানুষ ধুলো ঘাঁটে, তাঁদের উপর ওঁর বিষম ঘৃণা।

বিমলের এক বেয়াড়া অভ্যাসের কথা মনে পড়ে কৃষ্ণা টিপিটিপি হাসতে

লাগল। বলে পৃথিবী ধুলোয় না হয়ে কার্পেটে মোড়া হলে ভালো হত ওঁর পক্ষে। কি রকম ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে হাঁটেন, সে যদি দেখিস! দেশের উপর এত টান—কিন্তু যাবার সময় এই গরম কালেও ফুল-মোজা এঁটে গিয়েছেন।

কথাবার্তায় ছেদ পড়ল।

ঐ যে—বাজার থেকে এসে গেলেন! গল্পে গল্পে ভাত চাপানো হয় নি, সর্বনাশ!

লীলা রান্নাঘরে ছুটল। খালি গা—বিমল কাঁধের ঝুড়ি আর ডানহাতে-ঝোলানো মাছের খালুই নামিয়ে দাওয়ায় রাখল। কয়েকটা সিঙিমাছ খলবল করে উঠল খালুয়ের মধ্যে।

লীলা বলে, অনেক দেরি করে ফেললে—

খানিকটা তেল মাথায় থাবড়ে বিমল বলে, দশটা বেজে গেছে। একটা বেগুন পুড়িয়ে দাও, ব্যস—হয়ে যাবে।

কৃষ্ণা বাইরে এল। নিস্তব্ধ। ঝড়ের আগেকার থমথমে ভাব।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সামলাবার চেষ্টা করছে কৃষ্ণা। তারপর কথা বলল—অতি শান্ত কণ্ঠ। বলে, এগারোটার গাড়ি যায় যাকগে।

আমার মোটর রয়েছে। খোকামণি অন্নপথ্য করবে, তার খাওয়া আগে হয়ে যাক। তিন দিন কামাই হয়েছে, আর একটা দিনে চাকরির এমন ক্ষতি হবে না।

রান্নাঘরের দিকে চেয়ে বলে, লীলা ভাই, তোর বাড়ি খাব কিন্তু আমি। কলকাতা ফিরতে অসময় হয়ে যাবে। তোর কর্তাকে গাড়িতে নিয়ে যাব, নিয়ে ওঁর মেসে পৌছে দেব।

কণ্ট্রোল-আমলে

রামে রাম, রামে দুই, রামে তিন—

দাঁড়িপাল্লা ধরে নিজের হাতে এক সের দু-সের চাল-ডাল নুন-তেল বিক্রি করি দাদা। আর দ্বিজবর পালিত দোমহলার উপর দেখুনগে গড়গড়া টানতে টানতে খবরের কাগজ পড়ছে। দ্বিজবর ইংরেজি কাগজ পড়ে—বুঝুন!

বিকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ঘণ্টাখানেক সে কাগজখানার এপাতা-ওপাতা উলটাবেই। খাতির বাড়ে ওতে জনসমাজে।

দ্বিজবর হয়তো ভালো করে আমায় চিনতেই পারবে না, কিন্তু একদা অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলাম আমরা। এক মহাজনের গদিতে একসঙ্গে ছিলাম, তারপর বেরিয়ে এসে একই পট্টিতে দুই দোকান ফেঁদে বসেছি। লড়াই আর দুর্ভিক্ষের দরুন দেখতে দেখতে দোকান জেঁকে উঠেছে। দোকানের পাশে ভাঁট-আশশ্যাওড়ায় আচ্ছন্ন পতিত জায়গাটুকু প্রায় তীর্থভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে, অহরহ মানুষ ধন্না দিয়ে থাকে সেখানে। ভাদ্রমাস—টিপটিপে বৃষ্টি লেগেই আছে, তা বলে কিছুতেই কেউ জায়গা ছেড়ে নড়বে না। সকালবেলা পাঁচ আনা দরে এক সের হিসাবে চাল দেওয়া হয়, শেষ রাত থেকে লাইন দিয়ে বসে আছে তার জন্য।

বারো বস্তা করে আমার দৈনিক বরাদ্দ। সপ্তাহের মাল একসঙ্গে পাই, সাঙড় বোঝাই করে গুদামে এনে তুলি। সকালবেলা বিক্রির সময় কনেস্টবল এসে দাঁড়ায়, সিভিক-গার্ডরা আসে, একজন ইন্সপেক্টর বস্তা গুনে দেখে হুকুম করেন চাল ঢেলে ফেলতে। স্তূপীকৃত চালের দিকে চেয়ে কিউয়ের ভিতরে প্রত্যাশীগুলোর চোখ চকচক করে ওঠে। মাপ করে দিতে আর পয়সা গুনে নিতে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে যায় দোকানের মানুষ। শেষ হতে বারোটা-একটা বেজে যায়। তখন দেখতে পাবেন, পাশের জায়গাটায় অসংখ্য ইট-পাটকেল আর বাঁশের টুকরো ছড়ানো। না দাদা, সে সব কিছু নয়—না খেয়ে মানুষ মরছে, তা বলে মারামারি করতে যাবে কেন? ঐ ইট-পাটকেল হল ওদের বসবার আসন, জায়গার নিশানা। একটা-কিছু টেনে নিয়ে তার উপর বসে বসে শেষরাত্রি থেকে বৃষ্টিবাদলার ভিতর ঝিমোয়।

ইন্সপেক্টর বাবুটি মিশুক লোক—নাম পরিতোষ চক্রবর্তী। এখানকার সিনেমায় গেটম্যান ছিলেন আগে, গুণ্ডা ঠেকাতেন। বস্তাগুলো গুনে দিয়ে আমার গদির কোণে তিনি বসে পড়েন।

কি মশায়, চা-টা খাওয়াবেন তো দেখুন—

ছুটে একজন গিয়ে বিপিন ময়রার রসগোল্লার রসে তৈরি চা নিয়ে আসে। গল্পগুজব চলে। সন্ধ্যার সময়ও এক-একদিন তিনি আসেন, দ্বিজবর আসে। পাশার ছক পেতে চতুর্থ লোকের জন্য নবীন সরকারের কাঠগোলায় খবর পাঠাই। নবীনকে বরাবর দেখে আসছি পাশার নামে পাগল। ইদানীং

হয়েছে—খেলতে বসে কেবলই উসখুস করে, একটা বাজি কোনো রকমে শেষ করে নানা অজুহাত দেখিয়ে পালিয়ে যায়।

দ্বিজবর বলে, কেন ডাকাডাকি কর? তিন হাজার খাটের অর্ডার পেয়েছে, তিরিশ জন মিস্ত্রি খাটাচ্ছে। মরবার সময় আছে ওর?

চক্রবর্তীর গা টিপে আমি বললাম, দেখে আসুন গে একবার গোলার ভিতর ঢুকে। আমকাঠের পায়ায় চার ফালি করে তক্তা জুড়ে আহা-মরি খাট বানিয়ে বানিয়ে রাখছে। ওর উপরে নেয়ার বোনা হবে, সৈন্যেরা শোবে নাকি তার উপর। নেয়ারের ভারেই মশায় খাট ভেঙে পড়বে, সৈন্য ওঠার সবুর সইবে না।

দ্বিজবর স্তম্ভিত হয়ে যায়। বলো কি—দেখে নিচ্ছে না উপরওয়ালারা?

চক্রবর্তী বললেন, বন্দোবস্ত রয়েছে। আমকাঠ শাল-সেগুন হয়ে দাঁড়াচ্ছে বন্দোবস্তর গুণে।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, নিশ্বাস ফেলেন কেন? স্রেফ তোড়-জোড়ের ব্যাপার। যে যেমন বাগিয়ে নিচ্ছে। পয়সা উড়ে বেড়াচ্ছে বাজারে—ধরে নেবার কায়দা খুঁজুন।

দ্বিজবর আহত কণ্ঠে বলে উঠল, কাজ নেই ভাই, বেশ আছি। ধর্মের কড়ি—না হয় এক বেলা আধপেটা খেয়ে দোকান চালাব।

সপ্তাহের প্রণামী চক্রবর্তী একদিনে হিসেব করে নেন। এবারে বেঁকে বসলেন, রেট না বাড়ালে চলবে না। নবীন সরকার কত করে দিয়ে থাকে জানেন?

কাতর হয়ে বললাম, পেটে খেলে পিঠে সয়। আমাদের পোড়া ব্যবসায়ে আমকাঠ তো সেগুন বলে চালানো চলে না।

চক্রবর্তী বললেন, ঐ এক জিনিস দেখে এসেছেন—সেইটেই শুধু ধরে আছেন। গলিঘুঁজি অনেক রকমের আছে—বুদ্ধি করে পথ খুঁজে নিতে হয়। সত্যযুগের মানুষ আপনারা—কিচ্ছু হবে না আপনাদের দ্বারা।

ব্যঙ্গের দৃষ্টি হেনে চক্রবর্তী উঠে দাঁড়ালেন। খপ করে তাঁর হাত দুখানা জড়িয়ে ধরলাম।

তিনি বলেন, করছেন কি? সরকারি মানুষ আমি, ওঝা হয়ে ঝাড়তে এসেছি। বিষের খবর দেওয়া উচিত হবে কি আমার? না, না—ওসবের মধ্যে আমি নেই।

একরকম টানতে টানতে তাঁকে পিছনে গুদাম-ঘরের ভিতর নিয়ে গেলাম। বিপিন ময়রার দোকান থেকে শুধু চা নয়—রসগোল্লাও এল। বেরুবার মুখে খান পাঁচেক নোট গুঁজে দিলাম চক্রবর্তীর পকেটে।

পরদিন থেকে—চুপি চুপি বলছি দাদা, বাজারে যেন চাউর হয়ে না পড়ে—রাত্রে ফিরবার সময় মুটে আমার পিছু পিছু দু-বস্তা করে চাল বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে। সকালবেলা বারোর জায়গায় দশ বস্তা মাল বেরোয়, চক্রবর্তী গুনে গেঁথে ঠিক আছে বলে রায় দেন। বস্তা কেটে চাল ঢেলে ফেলা হয়। অতিরিক্ত খালি দুটো বস্তা পাশে পড়ে থাকে। কোনো অফিসার যদি হঠাৎ এসে পড়ে, কিংবা চাল তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবার দরুন খদ্দেরের ভিতর থেকে তেরিয়া মেজাজের কেউ এসে দেখতে চায়, গুনে দেখবে ঠিক আছে—বারো বস্তাই।

বেশ চলল ক-দিন। কিন্তু ঘরশত্রু বিভীষণ রয়েছেন। সদরে যাব বলে সকাল-সকাল বাড়ি ফিরেছি, উঠানে পা দিয়ে পাথর হয়ে গেলাম। রাত্রিবেলা আমি দাদা, টিপিটিপি বস্তা এনে জমাই—আর সকালে আমার দোকানে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে উনি বস্তার মুখ কেটে সদাব্রত শুরু করে দেন। দস্তুরমতো লাইন হয়ে দাঁড়িয়েছে বাড়িতেও। আপাতত কোনো গতিকে উঠানের মধ্যে কুলিয়ে গেছে। কিন্তু খ্যাতি ছড়াতে দেরি লাগবে না। উঠান ছাড়িয়ে লাইন। রাস্তায় পৌঁছল বলে। আর পাড়ার মধ্যে সার্কেল-অফিসারের বাসা—স্ত্রীর দানশীলতার পুণ্যে টুঁটি চেপে অচিরে তিনি আমায় কাঠগড়ায় তুলবেন, সন্দেহ নেই।

খুব খানিকটা বকাবকি করে নিজেই শেষটা হাঁপিয়ে পড়ি। চক্রবর্তীকে বলি, সত্যি বলেছেন মশাই। সত্যযুগের মানুষ—পোড়া অদৃষ্টে কিছু হবে না। আপনার আগের প্রণামী বহাল হল আবার।

বেশ, বেশ! সাচ্চা কাজই তো ভালো—

বলে মুখ কালো করে চক্রবর্তী তারিফ করতে লাগলেন।

সদরে আমাদের নিয়মিত দর্শন দিয়ে আসতে হয়, নইলে সেখানকার দেবতারা রুষ্ট হন। স্টেশনে নেমে এবার কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে। তারপর মনে পড়ে গেল, আকাশভেদী দেয়ালের মতো হয়ে ছিল প্ল্যাটফর্মের দক্ষিণ দিকটায়। মাস চারেক ধরে অসংখ্য বস্তা সাজিয়ে রেখেছিল—সে সব সরিয়ে নিয়ে গেছে, তাই অমন লাগছে।

গেল কোথায় বলুন তো? টিকিটবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম।

নিলাম হয়েছিল। তুলসীরাম মাড়োয়ারি জলের দরে কিনে নিয়েছে।

সোনার দামে চাল বিকোচ্ছে, জলের দাম কি জন্য?

বৃষ্টিবাদলা খেয়ে মাল লাট হয়ে গেছে। এ চাল খাওয়া যাবে না, কোনো কাজেই আসবে না।

টিকিটবাবু আদার ব্যাপারি—একটা মাছ, দুটো কাঁচকলা কিংবা নগদ দু-আনা চার-আনার কারবার করেন—তিনি বলে দিলেন, কোনো কাজে আসবে না। কাজে আসবে না তো তুলসীরাম পয়সা দিয়ে কিনে তার উপর আবার পয়সা খরচ করে সরিয়ে নিয়ে গেছে কেন? যাই বলুন—চক্রবর্তী আমার গুরু এ পথে, মনের উপর থেকে বিবেকের পাষাণ-ভার তিনি সরিয়ে দিয়েছেন! তুলসীর সঙ্গে দেখা করলাম, কথাবার্তা হল। আপাতত এক চালান পাঠিয়ে দেবে আগামী রবিবারে। অন্ধকারে আমার গুদামঘরের নিচে গিয়ে নৌকো লাগবে, মাল বদলাবদলি হবে—যত বস্তা উঠবে, ঠিক তত বস্তা বেরিয়ে আসবে তুলসীর নৌকোয়।

খুশি হয়ে ফিরলাম। চক্রবর্তীর তোয়াক্কা রাখি না। স্ত্রী-রত্নটিকে নিয়ে সামাল-সামাল হতে হবে না, অফিসারদের যার যখন ইচ্ছা গুদামে ঢুকে বস্তা গুনে চলে যাক। মোক্ষম বুদ্ধি বের করেছি।

যে মাঝির নৌকোয় আনা হবে, তার সঙ্গে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে এলাম। মাঝি বলেছিল, বড্ড কড়াকড়ি লাগিয়েছে, আপনাকে কিন্তু সঙ্গে যেতে হবে বাবু। পাকুড়তলার বাঁকে দাঁড়িয়ে থাকবেন, সেখান থেকে তুলে নেব। আপনি সঙ্গে না থাকলে গঞ্জের ধারে নৌকোই লাগাব না মোটে।

অতএব প্রহর দেড়েক রাত্রে রওনা হয়ে পড়লাম। মাঝি বলেছিল, দেড়-পো জোয়ার হয়ে যাবে পৌঁছুতে। তার মানে, পাকুড়গাছের দো-ডালা অবধি জল উঠে যাবে। পাকুড়-ছায়ায় বাঁধের উপর চুপচাপ আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে খরস্রোত নদীর উপর নজর রেখে। বাতাস থাক বা না থাক, পাল তুলে যাবে সেই নৌকো। দাঁড়গুলো তোলা থাকবে ছইয়ের উপর, শুধুমাত্র হাল বাইবে।

মাঝি বলেছিল, নৌকো দেখলেই অমনি হাঁক পাড়বেন বাবু। ভয় করবেন না, খুব জোরে হাঁক দিয়ে বলবেন, পার করে দাও ও মাঝি, জলমার হাটে যাব। জলমার হাট—কথাটা মনে থাকে যেন, জবাব আসবে, গোন বয়ে

যাচ্ছে, পারব না। আপনি বলবেন, ন্যায্য পারানি দেব—মাংনা নয়। টাকা-পয়সার কথা নয় বাবু, বলবেন পারানি।

তাই সই, মুখস্থ করে নিয়েছি কথাগুলো—প্রক্রিয়াটা আন্তন্ত আওড়াতে আওড়াতে যাচ্ছি। মনের উদ্বেগে সকাল সকাল বেরিয়েছি। জোয়ারের দেরি আছে। স্টীমার-ঘাট এখানটায়—লড়াইয়ের জন্য স্টীমার বন্ধ। ঘাটের লোহালক্কর অবধি তুলে নিয়ে গেছে। কত দোকান-পাট ছিল—চালাগুলো রয়েছে, একটিমাত্র লোক থাকে শুধু এখন। রান্না করছিল সে। খ্যাপাটে মানুষ—ত্রি-সংসারে কেউ নেই, ঠিকমতো জ্বাল দিতেও পারে না। চালের বাখারি টেনে টেনে উনুনে দিচ্ছে। ভিজে বাখারি বড় ধোঁয়াচ্ছে। গান ধরছে লোকটা মাঝে মাঝে। নির্জন ঘাটের ধারে উনুনে ফুঁ পাড়তে পাড়তে তার ভারি স্ফূর্তি—

কলসি কাঁখে কমলিনী জল আনিতে যায়,
সীমন্তে সিঁদুর শোভে নূপুর শোভে পায়—

বসে আছি আমি একলা পরিত্যক্ত এক পান-বিড়ির দোকানের সামনে বাঁশের মাচার উপর। সাড়াশব্দ দিচ্ছি নে। স্টীমারের কত মানুষ এখানে পা ঝুলিয়ে বসে বসে বিড়ি টানত !

তারপর চাঁদ ডুবে গেল। জোয়ার এসেছে, জল ছলাত-ছলাত করে পাড়ের উপর এসে পড়ছে, এক-একবার পা ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আমার। মেঘ ঘন ঘোর হয়ে আকাশে জমে উঠল। মিশকালো অন্ধকার। চলেছি ডাল-পালা-মেলানো অদূরের পাকুড়গাছ লক্ষ্য করে। আগুন···দপ করে জ্বলে উঠল। শ্মশান এটা। চিতা জ্বলছে, কিন্তু লোকজন কোথায় ? ভাগ্য ভালো মানুষটার —ঠাণ্ডা বর্ষা-রাত্রে আরাম করে আগুনে পুড়ছে। শ্মশানবন্ধুরা কায়ক্লেশে চিতা জ্বালিয়ে দিয়ে পালিয়েছে। আকাশে যে রকমটা আয়োজন করে আসছে—নিশিরাত্রে সাধ করে কে বাদলায় ভিজতে চায় ? বাতাস উঠেছে, নিভন্ত চিতা বাতাসের ঝাপটায় জ্বলে জ্বলে উঠছে। রক্তলোলুপ আলেয়া যেন মুখ খুলছে ঘাড় মটকাবার জন্যে। কিংবা মরা মানুষটাই হাঁ করছে খাদ্যের লোভে, জঠরের আগুন লকলক করে বেরিয়ে আসছে সেই সময়।

আশেপাশে হাড়পাঁজরা ছড়ানো। নৌকো···নৌকোই তো—পাল-তোলা নৌকো ঐ যে !

পার করে দাও, ও মাঝি—

যথারীতি জবাব এল, লারব—গোন বয়ে যাচ্ছে।

চমকে উঠি—লোম খাড়া হয়ে ওঠে শজারুর কাঁটার মতো। চিতার আলোয় দেখলাম, পাক দিয়ে এক মাথার খুলি আমার দিকে ফিরল। উলঙ্গ দু-পাটি দাঁত মেলে ভয় দেখাচ্ছে। আসছে গড়াতে গড়াতে, এগুচ্ছে আমার দিকে। নদীকূল ছেড়ে দ্রুত বাঁধের উপর উঠে দাঁড়াই। পা কাঁপছে ঠক-ঠক করে। ফিরে তাকিয়ে দেখি, মাথার খুলি আমায় লক্ষ্য করে গুটিগুটি আসছে তখনো।

একটা গর্তমতো জায়গা—সেইখানে খুলিটা উলটে গেল। বড় এক কোলাব্যাঙ বেরিয়ে এল, আটকে গিয়েছিল কি রকমে।

মাঝি, মাঝি—

নৌকো তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

ও মাঝি!

ডাকতে ডাকতে পাগলের মতো কূল বেয়ে ছুটলাম। নৌকো বাঁক পেরিয়ে আড়াল হয়ে গেল।

গোটা মানুষ জ্যান্ত অবস্থায় কিছু করল না, আর করোটিখানা আক্রোশে তেড়ে আসছে—এমন হাস্যকর কল্পনা কি করে সেদিন মাথায় এল বুঝতে পারি না। যা বলেছিলেন চক্রবর্তী, অকেজো সত্যযুগের মানুষই বটে! তুলসীরামের কাছে গিয়ে তারপর অনেক ধরা-পাড়া করেছি। সে মাথা নেড়ে বলল, উপায় নেই—লটসুদ্ধ বিক্রি হয়ে গেছে, আরো ভালো দাম পেয়েছি।

তখন জানতে পারি নি—সম্প্রতি তুলসীর এক কর্মচারীর কাছে শুনলাম, কিনেছিল আমাদের দ্বিজবর। আজ দোমহলার উপর পা ঝুলিয়ে সে খবরের কাগজ পড়ে, আর আমি দাঁড়ি-পাল্লা ধরে একসের দু-সের চাল-ডাল বিক্রি করছি। শুনছি নাকি, আবার লড়াই বাধবে, জবর দুর্ভিক্ষও আসতে পারে? খাঁটি খবর তো দাদা, না আমার কপালে শেষ পর্যন্ত ঝুটো হয়ে দাঁড়াবে?

লঙ্গরখানা

(১)

ভাত দাও মা চাড্ডি।

ওরে হারামজাদা গোবিন্দ, কানে যাচ্ছে না ?

উঠোনের দিকে ঝুঁকে গোবিন্দ বলে, চেঁচাচ্ছিস কেন রে বাপু ? বোস। নিয়ে যাচ্ছি।

উঁহু, এখানে নিয়ে আয়। ভাত নয়—ফ্যান।

গোবিন্দ ফ্যান নিয়ে এল।

গরম আছে তো ? ঢেলে দে বেটাদের মাথায়। এত খাওয়াচ্ছি—তবু ডাকে, 'মা'—'মা'—'মা'! মুখস্থ করে এসেছে!

(২)

নমিতা শুনে হেসেই খুন।

ভাত জুটছে না, তাই এখন ফ্যান চালাচ্ছে ? লাগাও খিচুড়ি আমাদের এখানে, সঙ্গে মাছ-ভাজা।

খবর পৌঁছে গেল। রক্তচক্ষু সুবল বলে, বটে! লাগাও এখানে পোলাও-কোপ্তা-কাবাব। মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি তুই গোবিন্দ, পোলাও-কোপ্তা-কাবাব—চেঁচিয়ে বলবি। দেখি কে যায় ও-বাড়ি!

(৩)

তবু যাচ্ছে বাবু।

আগুন হয়ে সুবল বলল, তুইও যা চলে—

গোবিন্দ দাঁড়িয়ে আছে। গলা খাটো করে সুবল বলল, চুপিচুপি ওদের মধ্যে বসে দেখে আয়, কেমন খাওয়াচ্ছে।

ফিরে এসে গোবিন্দ বলে, ভাঙা-মুসুরি, ইয়া মোটা-মোটা চালের খিচুড়ি আর কুচোচিংড়ি-ভাজা। থুঃ—

তবে মানুষে যায় কেন আমাদের পোলাও ছেড়ে ?

হেসে হেসে কথা বলে কিনা! হিংসুটে মেয়ে বাবু, কিন্তু হাসিটা ভারি মিষ্টি।

(৪)

কাজকর্ম চুকে যাবার পর গোবিন্দ অদৃশ্য হচ্ছে ইদানীং। রাগে রাগে সুবল চলে গেল নমিতার ওখানে।

হাতে বালতি, গোবিন্দ খিচুড়ি পরিবেশন করছে।

নমিতা বলে, সমস্ত চুকে গেছে। আমাদের খাওয়া-দাওয়া এইবার। বারান্দায় জায়গা হয়েছে, বসে যান।

ঘুরে দাঁড়িয়ে সুবল পা বাড়াল।

না খেয়ে যাবেন, সে হবে না। গেট বন্ধ করো, এই রামদীন।

রামদীন পৌঁছবার আগে নিজেই নমিতা ফটক আটকে দাঁড়াল।

শুধু হিংসুটে নয়, দস্তুরমতো মিলিটারি মেজাজ মেয়েটার। খাওয়াচ্ছে সামনে বসিয়ে—যেন জঙ্গিলাট বাহাদুর হুকুম চালাচ্ছেন এক হাবিলদারের উপর।

(৫)

সন্ধ্যাবেলা কেউ যখন নেই, সুবল আবার গেল।

দেখুন, একটা পরামর্শ হওয়া উচিত। সেইজন্য এসেছি। কমপিটিশনে দু-পক্ষেরই লোকসান।

নমিতা বলে, লঙ্গরখানা আপনি একাই চালান। আমি বন্ধ করে দেব ভাবছি।

টাকাকড়ি ফুঁকে গেল?

উলটে হাজার দশেক দেনা। নালিশ করেছে। আদালতের সমন দিয়ে গেল এই।

সমন পড়ে দেখে, মামলার মাসখানেক বাকি।

(৬)

ভিখারি-ভোজন তুলে দিলে নাকি, সুবল?

একজনকেই দিয়ে দিলাম যা ছিল সমস্ত।

ভিতরে আসতে বোমার মতো ফেটে পড়ল নমিতা।

লোকের কাছে আমায় ভিখারি বলছ?

নমিতার মাথায় সিঁদুর, হাতে নোয়া।

দাঙ্গার একটি কাহিনী

হাসপাতাল। পাশাপাশি দুটো বেড। এক ছোকরা আর এক বুড়ো রোগি —খুব ভাব হয়ে গেছে দুজনের মধ্যে। কথাবার্তা হচ্ছে।

ছোকরা বলে, চাষবাসের অবস্থা ভালো না। এক ফোঁটা পানি নেই, ভুঁই-খেত চৌচির হয়ে আছে। শুনলাম, পাকিস্তান হয়ে যাচ্ছে এবার— মোছলমান হলেই একটা না একটা কাজে লাগিয়ে দেবে। ঘরবাড়ি ছেড়ে সেই লোভে বাবু শহরে চলে এলাম। এসে এখন এই হাসপাতালে।

বুড়ো লোকটি বলে, আহা, ঘর-বাড়ি আমারও ছিল, বাগবাগিচা পুকুর সমস্ত ছিল, অনেক দিন খোঁজখবর রাখি নে। মাঝে মাঝে বড্ড ইচ্ছে হয় গাঁয়ে গিয়ে থাকতে। হবার জো নেই। কাচ্চাবাচ্চা অনেকগুলো, ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। নইলে একটা দিনও থাকি পোড়া শহরে! সুন্দরবনের চেয়ে সাংঘাতিক হয়েছে কলকাতা, এ আর মানুষের বসবাসের মতো নেই।

বাড়ি কোন্ গাঁয়ে মুরুব্বির ?

অনেক দূর। হরিহর গাঙের উপর—কেশবপুর গঞ্জের নাম শুনেছ ?

হাঁ, হাঁ। গাঁয়ের নামটা বলেন।

রায়পাশা। চেন ?

চিনি নে ? হরিহরের আড়পারে হল আমাদের বাড়ি—খানপুর।

আহা-হা, কি জল গাঙের! দশ হাত জলের নিচের পাটা-শেওলা আর বালিমাটি দেখা যেত। এখন আছে সেই রকম ? ছেলেবয়সে বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে তোমাদের খানপুরে যেতাম শেয়াখুল খেতে। সুতোয় কুচোচিংড়ি বেঁধে গাঙের ধারে ধারে কাঁকড়া ধরে বেড়াতাম।

সব যেন উড়ে-পুড়ে গেল। আমরাও বাবু কত দেখেছি! তরিতরকারি কেউ পয়সা দিয়ে কিনত না। এখন সজনের খাড়া বিক্রি হচ্ছে পয়সায় দু-গাছা করে।

ঘোর কলি! ধর্ম দেশ ছেড়েছেন। এই দেখো না কেন—আগে একটা খুনখারাপি হলে অঞ্চলময় তোলপাড় পড়ে যেত, এখন দিন দুপুরে শহরের বুকের উপর কচু-কাটা করছে।…পিঠের উপর ঘ্যাচ করে বসিয়ে দিল, আর ইঞ্চিটাক ঢুকে গেলে আজকে এই শুয়ে শুয়ে গল্প করতে হত না তোমার সঙ্গে।

ছোকরাটি আন্তরিক দুঃখিত হয়ে বলে, বড় বাঁচা বেঁচে গেছেন বাবু। ছোরা মেরেছে—নজর রেখে চলাচল করলে ছোরায় তেমন বেকায়দা করতে পারে না। আমার দেখেন বন্দুকের গুলি। পঞ্চাশ হাত দূর থেকে দেওড় করল, মুখ থুবড়ে পড়লাম ট্রামরাস্তার উপর।

সর্বরক্ষে বাবা, হাঁটুতে লেগেছে—বুক কি কপাল ফুটো করে দেয় নি।

চিরকাল খোঁড়া হয়ে থাকতে হবে বাবু। কাজের চেষ্টায় এসেছিলাম, খোঁড়া মানুষকে কে কাজ দেবে? লাঙল চষব, খেত-খামারের কাজ করব, সে উপায়ও আর রইল না।

আমার চাকরিটাও গেল এইবার বাবা। বয়স হয়েছে, ম্যানেজারের মন যুগিয়ে টিঁকে ছিলাম কোনোক্রমে। এর পর আর উঠে আমায় দশটা-পাঁচটা আপিস করতে হবে না। তোমার তবু যাই হোক গ্রামে একটা আস্তানা আছে—হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে আমি যে কোন্ চুলোয় গিয়ে উঠব, ভেবে পাই নে। বাপ-দাদারা ঘর-বাড়ি করেছিলেন—ভিটের উপর নাটার জঙ্গল হয়ে আছে শুনতে পাই।

বাপ-দাদার ঘর না থাক, উঠবার জায়গার অভাব হবে না বাবু। তাই চলেন, এক জায়গার মানুষ কলকাতার খুরে সেলাম দিয়ে একসঙ্গে বেরুই। আমাদের দলিচঘরে থাকবেন, ঢেঁকিশালে রান্নাবান্না হবে। দু-মাস ছ-মাস স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন। ধীরে সুস্থে ঘরদুয়োর বেঁধে নেবেন নতুন করে। আমরা খানপুরের সর্দাররা আর রায়পাশার মিত্তিররা আলাদা ছিলাম না কোনোকালে।

তা সত্যি। লক্ষ্মীপুজোর পরদিন বাবা সর্দারদের দাওয়ায় বসিয়ে খাওয়াতেন। ছেলেবেলা বরাবর দেখে এসেছি। তোমাদের বিয়ে-থাওয়ায় বরযাত্রী যেতেন কর্তারা। দস্তুরমতো সমাজ-সামাজিকতা ছিল। আজকে সব উঠে গেছে।

উঠে গেছে কে বলল? শহরে এসেই শোনা যায়। ভাবি, আমাদের মতোই বুঝি সকলে! তারা ঠিক আছে, মরেছি বাবু আমরা।

* * *

অফিস-ঘরে থানা-অফিসার আহত দুজনের খবর নিতে এসেছেন।

হাউস-সার্জনকে বলছেন, করেছেন কি ডাক্তারবাবু, পাশাপাশি বেডে দিয়েছেন? ছোকরা ঐ বুড়ো লোকটিকে ছোরা মারে; মিলিটারির গুলিতে ছোকরাও জখম হল সঙ্গে সঙ্গে। একসঙ্গে দুজনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

স্বাধীন ভারতে

হরিপদ বাঁড়ুজ্জে মিনিস্টার হয়েছেন। জেল দেখতে গেছেন। জেলের সঙ্গে অনেক পুরোনো সম্পর্ক। এক-একবার যখন বেরিয়ে আসতেন, কয়েদিরা সসম্ভ্রমে নমস্কার করত।

খবর কি পাঁচু ?

এবারে যখন আসবেন বাবু, আমি যেন রান্নার কাজটা পাই। এরা হাড় জ্বালিয়ে খেল। বছির আকলু নীলকেষ্ট—সবাই পেয়েছে, আমার ভাগ্যে জুটল না।

আর কদ্দিন বাকি আছে তোর ?

দশ বচ্ছর। তার মধ্যে কতবার আপনারা আসা-যাওয়া করবেন বাবু !

সেই হরিপদ জেল দেখে বেড়াচ্ছেন আজকে। জেলার 'আজ্ঞে, আজ্ঞে—' করে পিছনে হাত কচলে বেড়াচ্ছেন।

হরিপদ বলেন, ভালো আছেন রায় সাহেব ?

ও আর বলবেন না স্যার। রায় সাহেব উপাধি ছেড়ে দেব। বিদেশির দেওয়া উপাধি নামের সঙ্গে জুড়তে অপমানে গা জ্বালা করছে।

কিন্তু বিশ বছর ধরে ভোগ করে আসছেন, এখন শুধু হারানবাবু বললে চিনতেই পারবে না লোকে।

পারবে স্যার, খুব পারবে। দু-শ বছরের ব্রিটিশ-ভারত রাত বারোটায় স্বাধীন-ভারত হল, সাদা সাহেবগুলো কালা-আদমিদের তোয়াজ করে বেড়াচ্ছে—সবাই সব পারছে, আমি পারব না ? হারান মজুমদার হয়ে দিব্যি খদ্দর পরে বেড়াব, দেখতে পাবেন।

তারপর খোশামুদির হাসি হেসে বলে, আঙুল ফুলে স্যার শালগাছ হয়ে গেল, দেশি মানুষ সব লাট-বেলাট হয়ে যাচ্ছে—বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে না ?

কি চান ?

প্রমোশন। দিয়ে দেখুন, আপনাদের ঠেঙিয়েছি—সাহেবগুলোকে কি করে ঠেঙাই এবার !

পাঁচু সেখানে ছিল। সে বলে, না বাবু, চোর বলে কয়েদে পুরুন ওদের। ঠেঙিয়ে নিয়ে বেড়াব আমরাই। আমরা হলাম ধরুন ভাইব্রাদার—এক জেলে বরাবর কাটিয়ে এসেছি।

মুখস্থ বক্তৃতা

উনিশ শ সাত সালের কথা।

একটা ধুতি টাঙানো ছিল হরসুন্দরের উঠানে। ধুতিটা বিলাতি। ছেলেরা সেটা নিয়ে গিয়ে আগুনে ফেলে দিল। হরসুন্দরের সম্বন্ধী-পুত্র বলাই বারংবার নিষেধ করেছে, কেউ তা কানে নেয় নি। গ্রামের সব বাড়ি থেকেই এমনি বিলাতি কাপড় জড়ো করে আগুন দিয়েছে।

কিন্তু সব বাড়ির মানুষ আর হরসুন্দর এক নন। গ্রামের তালুকদার তিনি—সবাই তাঁর প্রজা। বলাইর মুখে আত্মন্ত শুনে তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট গ্রামের প্রান্তে বিলের ধারে তাঁবু খাটিয়ে আছেন পাখি-শিকারের জন্য। হরসুন্দর ইতিমধ্যেই মুর্গি, মর্তমান কলা ও ভাঙা হিন্দি সহযোগে সেলাম দিয়ে এসেছেন একবার। সাহেবের কাছে ছুটলেন তিনি। ভাঙা হিন্দির সম্বলে এত কথা বোঝানো যাবে না, সেজন্য ইংরেজিনবিশ সুহৃদ হৃষীকেশ-দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

সাহেব মামলা সম্পর্কে হাঁ-না কিছু বললেন না, কিন্তু হরসুন্দরকে খাতির করলেন। এটা সম্ভবত হৃষীকেশকে সঙ্গী করে আনার দরুন। হরসুন্দরের অবোধ্য অনেক কথা সে ইংরেজিতে বলল—হরসুন্দরের প্রশংসা নিশ্চয়ই। নইলে এত অধিক সমাদর কেন? কিছু না খাইয়ে ছাড়বেন না। হরসুন্দরের ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা রকমে তিনি সাহেবকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। অবশেষে অনেক বলে-কয়ে এবং হৃষীকেশের সুপারিশে তাঁবুর বাইরে এসে মুক্তির নিশ্বাস ফেললেন।

একেবারে মুক্তি পান নি কিন্তু। ক-দিন পরে ডাক পড়ল তাঁবুতে। তার পরে প্রায় প্রতিদিনই।

সাহেব বললেন, আপনি এমন চমৎকার মানুষ! আপনার এলাকায় 'বন্দে মাতরমের' হামলা—আমার বিস্ময় লাগছে।

হরসুন্দর গদগদ কণ্ঠে বললেন, হুজুর সীসা গলিয়ে যদি কানের মধ্যে ঢেলে দেন, সে বরঞ্চ সইতে পারব—কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' শুনলে পিত্তি-নাড়ি অবধি জ্বলে ওঠে। প্রতিকারের জন্যই তো এসে পড়েছি হুজুরের চরণে।

হৃষীকেশ-দারোগা ইংরেজিতে নয়—এবারে হিন্দি-বাংলায় মিশিয়ে প্রস্তাব করলেন, এই গ্রামে স্যারের শুভ-পদার্পণ উপলক্ষে হরসুন্দরবাবু একটা

সংবর্ধনা-সভা করতে চান। স্যার যদি এই উপলক্ষে নির্বোধ প্রজা-সাধারণকে আন্দোলনের কুফল বুঝিয়ে দু-দশ কথা বলেন—

সাহেব সম্মত হলেন। হরসুন্দরের পিঠ চাপড়ে বললেন, যদিও তিনি সম্পূর্ণ বে-সরকারি সূত্রে এখানে এসেছেন, হরসুন্দরের মতো রাজভক্ত সজ্জন মানুষের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা কিছুতে তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

সংবর্ধনার প্রস্তাব কিন্তু হরসুন্দরের নয়—এ তাঁর মনে ওঠে নি, হৃষীকেশ-দারোগাকে কোনো কথাই বলেন নি তিনি এ সম্পর্কে। তবু হৃষীকেশ তাঁর হয়ে বলে বসলেন সাহেবের কাছে। তুখোড় লোক, হরসুন্দরের পরম শুভানুধ্যায়ী—করেছেন অবশ্য ভালোই। সভার মধ্যে স্যার একবার এমনি যদি পিঠ চাপড়ে দেন, লোকে তাজ্জব হয়ে যাবে—এক শ গুণ খাতির বাড়বে দেশের মধ্যে, ছোঁড়াগুলো হুট করে উঠানে ঢুকতে সাহস পাবে না আর কখনো।

হাটখোলায় সভার আয়োজন হল। হরসুন্দর ও তাঁর পাইক-গোমস্তা এবং তৎসহ হৃষীকেশ ও তাঁর চৌকিদার-কনেস্টবল উঠেপড়ে লেগে জন-সমাগমের ব্যবস্থা করলেন। বলাই বাঁধুনি দিয়ে দিয়ে খাসা লেখে—হরসুন্দর তাকে দিয়ে বক্তৃতা লিখিয়ে নিয়েছেন। সারারাত জেগে তাই মুখস্থ করলেন। শক্ত শক্ত কথা, কিন্তু চমকদার—মানে না বুঝলেও যত আবৃত্তি করছেন, ততই বিমোহিত হচ্ছেন তিনি। বলাইটা ভাগ্যিস কুটুম্ব-বাড়ি এসে পড়েছিল, নইলে বক্তৃতা লেখাতে সদর অবধি দৌড়তে হত। আর সে সব পেশাদারি লোকের কলমে এমন জিনিস কক্ষনো বেরুত না।

সভার প্রথমেই হরসুন্দরের বক্তৃতা—

> কূটবুদ্ধি নিষ্ঠুর ঘাতকের কঠিন আঘাতে মাতৃঅঙ্গ ছিন্নভিন্ন। সত্যসন্ধ ভক্ত সন্তান কে কোথায় আছ, প্রতিরোধ করো।

শুধু এই আরম্ভিকাটুকু—আর কিছু শোনা গেল না। সে কি তুমুল উচ্ছ্বাস! আকাশ-বিদারী 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি। হরসুন্দর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। জনতা এমন হয়ে উঠল কেন, বুঝতে পারছেন না।

ক্রোধে সাহেবের মুখ রাঙা। হৃষীকেশকে কাছে ডেকে কি জিজ্ঞাসা করলেন। জবাব পেয়ে গলার মালা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি; সেই মুহূর্তে সভা ছেড়ে চলে গেলেন।

কয়েকটা ছোকরা এদিকে লাফাতে লাফাতে এসে হরসুন্দরকে কাঁধে তুলল। খোদ ম্যাজিস্ট্রেটের মুখের উপর এমন করে স্পষ্ট কথা ক-জনে শোনাতে পারে? কোনো মানা শুনল না তারা—হরসুন্দরকে কাঁধে নিয়ে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করল। আর 'বন্দে মাতরম্' চিৎকার। মোটের উপর কিন্তু হরসুন্দরের ভালোই লাগছে এ সমস্ত।

কিন্তু গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরে বিছানার উপর ছটফট করতে লাগলেন তিনি। ঘুম হল না। সকালবেলা ছুটলেন সাহেবের তাঁবুতে। করজোড়ে ক্ষমা চাইবেন। নকুড়-গুরুর পাঠশালায় শিশুশিক্ষা অবধি বিদ্যা—তিনি কি বোঝেন এত সমস্ত? বলাইটার শয়তানি। কুটুম্বর ছেলে—ডুবে ডুবে জল খায়, তা কে জানত?

কিন্তু সাহেবের সঙ্গে দেখা হল না, সদরে চলে গেছেন তিনি। লোকজন তাঁবুর খোঁটা তুলছে। মাসখানেকের মধ্যেই একটা বোমা আবিষ্কৃত হল হরসুন্দরের ছাইগাদার ভিতর। এবং জমিজমাও একের পর এক নিলামে উঠতে লাগল।

এই মাসখানেক মাত্র আগে আমি হরসুন্দরকে আবিষ্কার করেছি। না করলেই ছিল ভালো। খবর পেলাম, বিধবা মেয়ের বাড়িতে আছেন তিনি। সংসারের মধ্যে ঐ তাঁর একমাত্র আপন। সে গ্রাম এখান থেকে ছ-ক্রোশ দূরে। খোঁজে খোঁজে চলে গেলাম।

বাড়ি ঢুকবার আগেই তাঁকে দেখলাম। তখন চিনতে পারি নি, বলে না দিলে চিনবার ক্ষমতা নাই কারও। বলে দিলেও বিশ্বাস হওয়া শক্ত, ইনি সেই মানুষ। বয়স সত্তরের উপর হয়েছে। গৌরবর্ণ দেহ শণের দড়ির মতো—মনে হয়, খুশিমতো বাঁকানো ও পাকানো যেতে পারে। গামছা পরে পাট-পচানো দুর্গন্ধ নালায় একহাঁটু পাঁকের মধ্যে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা মালসার সাহায্যে জল ছেঁচে ফেলছিলেন দু-পাঁচটা চাঁদা-পুঁটি সংগ্রহের প্রত্যাশায়।

তাঁর মেয়ে গিয়ে ডেকে আনল। পুকুরে ডুব দিয়ে খানিকটা ভদ্র রূপে তিনি এসে বসলেন।

বললাম, ছাব্বিশে জানুয়ারি সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। আমরা উৎসবের আয়োজন করেছি। মস্ত বড় সভা—আপনি তার সভাপতি।

মেয়ে হাঁ-হাঁ করে ওঠে। কত লোক রয়েছে, ওঁকে কেন? ওঁর কি সে ক্ষমতা আছে

বলি, ওঁর চেয়ে যোগ্যতর কেউ নেই এ অঞ্চলের মধ্যে। দেশের কাজে নির্যাতনভোগী সকলেই প্রায় গত হয়েছেন। তাই এদ্দুর এসেছি।

হরসুন্দরের দেখলাম খুব উৎসাহ সভাপতি হতে। বললেন, বাগড়া দিস নে তুই অন্ন। আলবত্ পারব—না পারলে উনি এসেছেন কেন এত মুল্লুক ঠেলে? তুই ভেবে রেখেছিস, বাবা কেবল মাছ ধরতে পারে—আর কোনো কর্মের নয়।

এক কথায় তিনি রাজি হয়ে গেলেন।

তারপরে মশায় এই বিপত্তি। ফুলের মালা গলায় দিয়ে এবং সামনে অগণিত মানুষ দেখে পুরানো স্মৃতি মনে পড়ল বুঝি বুড়োর---বাঁধ-ভাঙা জলস্রোতের মতো মানুষ উচ্ছ্বসিত আনন্দে সেই একদিন তাঁকে কাঁধে তুলে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেছিল। বক্তৃতা আরম্ভ করলেন, তেতাল্লিশ বছর আগেকার মুখস্থ বক্তৃতা—

কূটবুদ্ধি নিষ্ঠুর ঘাতকের কঠিন আঘাতে মাতৃঅঙ্গ ছিন্নভিন্ন···

দন্তহীন-মুখ-নিঃসৃত একটি বর্ণ কেউ বুঝতে পারছে না। বুড়োও বলতে পারলেন না আর-কিছু। হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। ক্ষিপ্ত হয়ে সকলে চেঁচামেচি করছে: ঘাড় ধরে নামিয়ে দাও উজবুকটাকে। আমি লজ্জায় অধোবদন। বুড়োর কোটরগত দুটি চোখ ছাপিয়ে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। দেখে কষ্ট হয় না, রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বলছে।

বেশি কিছু অঘটন না ঘটে—অন্নর বাড়ি হরসুন্দরকে নির্বিঘ্নে ফেরত পৌঁছে দেবার দায়িত্ব তো আমার—তাড়াতাড়ি পাঁজাকোলা করে তাঁকে প্লাটফর্ম থেকে নামিয়ে নিলাম। রায় বাহাদুর (না, রায় বাহাদুর আর নন, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর উপাধি পরিত্যাগ এবং খদ্দর পরিগ্রহণ করেছেন তিনি) নিবারণ মল্লিক বসলেন সভাপতি হয়ে।

এতক্ষণে হরসুন্দর অবস্থা বুঝতে পেরেছেন।

অমন মারমুখি হয়ে উঠল কেন বাবা? সেবার তো এই শুনে কাঁধে তুলে নাচিয়েছিল।

তিক্তকণ্ঠে বললাম, তখন ইংরেজ ছিল—এখন স্বাধীন হয়েছি। আনন্দোৎসবে মড়াকান্না কে সহ্য করতে পারে?

বুড়ো অপ্রতিভ মুখে চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। শেষে বললেন, মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ—মুখস্থ বক্তৃতা, মানে বুঝতে পারি নে। সেকালে ধন-জন ছিল, কম বয়স ছিল—তখন নিজের সর্বনাশ ঘটিয়েছি, এবারে তোমার মুখ হাসালাম।

বুড়োর আক্ষেপোক্তিতে কতকটা শান্ত হয়ে বললাম, বক্তৃতা যা-ই হোক—হঠাৎ অমন ডুকরে কেঁদে উঠলেন কেন?

হরসুন্দর বললেন, শয়তান বলাইটার কথা মনে পড়ল বাবা।

সেবার সেই সাত সালেই বলাইর ফাঁসি হয়েছিল এক সাহেবকে গুলি করার অপরাধে।

রাজবন্দী

কুমুদনাথকে জেলে নিয়ে পুরল। জেলার বিনোদ সমাদ্দার অতিশয় ভদ্রলোক—ফরসা চেহারা, মাথায় টাক। টাকের লজ্জাতেই বোধহয় সব সময় হ্যাট পরে থাকে। অফিসের ভিতর চেয়ারে বসে কাজ করছে—তখনও দেখা যায় মাথা হ্যাটে ঢাকা। কুমুদনাথকে নিয়ে সে শশব্যস্ত হয়ে উঠল।

ইণ্টারভিউর দিন ভয়াবহ কাণ্ড। কুমুদের স্ত্রী ইন্দুরানী এবং ছোট ভাই নিখিল আসে দেখা করতে। এই দুজনকে ভিতরে আসতে দেওয়া হয়। কিন্তু বাইরে লোকারণ্য। কুমুদের জন্য বহু জিনিসপত্র গেটে জমা দেয়। নানা রকমের মিষ্টি, ঘরে তৈরি চন্দ্রপুলি, বই, ফুল, কাপড়-চোপড়, যে সময়ের যে ফল—ইত্যাদি ইত্যাদি। উপহার-সম্ভার দেখে স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যায়, বাজারে এ সময়টা সেরা জিনিস কি কি পাওয়া যাচ্ছে। ষোলো আনা যে কুমুদের কাছে পৌঁছয়, তা নয়। যা পৌঁছয়, তাতে তার শুধু নয়—জেলখানায় উৎসব পড়ে যায় সকল শ্রেণীর বন্দীদের মধ্যে। দেখা করে বেরুবার সময় অপেক্ষমাণ জনতা ইন্দুরানীদের ঘিরে ফেলে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের কাছ থেকে প্রতিটি কথা শোনে। কেমন আছে কুমুদ, কী রকম তার চেহারা হয়েছে, কী কথা বলল সে। এক কথা বার বার শুনেও যেন তৃপ্তি পায় না।

বিনোদের কোয়ার্টার জেল-গেটের সংলগ্ন দোতলায়। বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে সে কাণ্ড দেখে, দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। মাত্র গোটা তিন-চার দেয়ালের ব্যবধানে কুমুদ এসে দাঁড়িয়েছে—এই উপলব্ধি চঞ্চল করেছে বিপুল জনতাকে। শত শত কণ্ঠে জয়ধ্বনি। লোকের ইচ্ছা—এত কাছাকাছি যখন কুমুদনাথ এসে গেছে, মুখোমুখি দেখা না-ই বা হল—তাদের ভালোবাসা ও একাত্মতা গলার জোরে পৌঁছে দেবে তার কানে। এই অসংখ্য মানুষ এখনো তার অনুগামী, তারই কথা ভাবে, একটুখানি চোখের দেখা পাবার জন্য একান্ত লালায়িত তারা—জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে মনের সেই আকূতি প্রকাশ করে।

বিনোদের বুড়ি মা সভয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন।

কি হয়েছে বাবা? অত চেঁচায় কেন?

বিনোদ বলে, একজন রাজবন্দী এসেছেন অফিস-ঘরে—

ওরে বাবা! কোন রাজাকে বন্দী করেছিস, কত প্রজা তার—সমস্ত ভেঙে-চুরে ফেলবে যে! তোদের ওরা গেল কোথায়—বন্দুক-টন্দুক নিয়ে দাঁড়াক।

বিনোদ বলে, তুমি ঘরে যাও মা, এখানে দাঁড়িও না। কিচ্ছু করবে না, চেঁচিয়ে গলা ব্যথা হলে আপনি চলে যাবে।

বাঁধ দিয়ে জলস্রোত আটকে রাখার উপমা বিনোদের মনে এসে যায়। উদ্ধত ইটের পাঁচিলে কুমুদনাথকে আলাদা করে রেখেছে মানুষের সান্নিধ্য থেকে। প্রবল বিক্ষোভের সামনে পাঁচিল যেন থরথর করে কাঁপছে।

মাসখানেক পরে জানা গেল, নূতন কৌশল উদ্ভাবন করেছে ঐ সমস্ত লোক। জেলখানার পুব দিকে এক খাল। খাল চওড়া বেশি নয়, কিন্তু স্রোত আছে। ওপারে সারবন্দি দালানকোঠা। বাড়িগুলোর সামনে সদর রাস্তা, পিছনের অংশটা এই খালের দিকে। অনেক বাড়ি থেকে পাকা সিঁড়ি নেমে গেছে খালের জলে; বাড়ির লোক খালে স্নান করে, বাসন মাজে।

বিনোদ খবর শুনল—তারপর এক সময় নিজে গিয়ে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করল—খাল-পারে ঐ সব বাড়ির উঠানে সকালবেলা লোক জমায়েত হচ্ছে। দু-তিন শ লোকের কম হবে না। দোতলার পুবের বারাণ্ডায় কুমুদনাথ এসে দাঁড়ায়—শুভ্র খদ্দরে আবৃত দেহ, প্রভাত-সূর্যের আলো ঠাকুর-দেবতার মতো

তার মুখের চারিপাশে আভা বিস্তার করে। কুমুদকে চাক্ষুষ দেখে নমস্কার করে লোকজন বিদায় হয়ে যায়।

এ পর্যন্তও সহ্য করা চলে। কিন্তু সাহস ক্রমশ বেড়ে চলেছে লোকের। সুউচ্চ কণ্ঠে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছেন ?

কুমুদনাথ হেসে জবাব দেয়, ভালো—

শেষে যুক্তি-পরামর্শও চলতে লাগল এপারে-ওপারে।

সরকারি তোড়জোড় বড্ড বেশি আপনারা জেলে আসবার পর থেকে। কেশবপুর থানার উপর তবু এখনো জাতীয়-পতাকা উড়ছে। একদিন গুলি চালিয়েছিল, কিন্তু সুবিধা করতে পারে নি।

কুমুদনাথ বলে, এই শেষ-যুদ্ধ। নেতার মুখ চেয়ে থেকো না। করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা !

খালের ওপার থেকে শত শত কণ্ঠে চিৎকার ওঠে, করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা !

বিনোদের বুকের মধ্যে গুরগুর করে ওঠে। পারতপক্ষে এদের নিয়ে সে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চায় না, চোখে দেখেও যথাসম্ভব চোখ বুজে থাকে। নেবু বেশি কচলালে তেতো হয়ে যায়, চাকরি-জীবনে ঠেকে ঠেকে এই তার শিক্ষা। উপরওয়ালার কানে এ সব তুলতে নেই। রাজবন্দী বড় বেয়াড়া চিজ—রাজ-রাজড়ার মতোই এদের মেজাজের হদিস পাওয়া দায়। মিষ্টি করে বুঝিয়ে বলতে গেলেও অনেক সময় উলটো-উৎপত্তি ঘটে। হয়তো বেঁকে বসবে—পুবের বারাণ্ডা থেকে ঘরেই ঢুকতে চাইবে না আর। হয়তো বা খাওয়া বন্ধ করবে। আর খবরের কাগজগুলো অমনি ঢাক পেটাতে শুরু করবে। তখন সামলাও ঠেলা ! অতএব সে একটা কথাও বলল না কুমুদনাথকে অথবা আর যারা বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ায়। কিংবা পুলিশ দিয়ে খাল-পারের জনতাকে তাড়াহুড়ো করল না। শুধু জেল-বিভাগে এক প্রস্তাব পাঠাল, পুবের দেয়াল আরও উঁচু করা আবশ্যক। রাজবন্দীরা থাকে ঐদিকে, তাদের পক্ষে পাঁচিল টপকে পালানো একেবারে অসম্ভব নয়। এমনি একটা দৃষ্টান্ত যখন দেখা গেছে হাজারিবাগ জেলে।

গাড়ি গাড়ি ইট বালি সিমেণ্ট এসে পড়ল। জন কুড়িক মিস্ত্রি এক সঙ্গে কাজে লেগেছে। কাজটা তাড়াতাড়ি সমাধা হওয়া দরকার।

বিনোদ ওদিকে গেলে ছেলেরা কলরব করে ওঠে, কি মশায়, কত উঁচু করবেন আর ?

বিনোদ বলে, কি করি বলুন। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। চেয়ে চেয়ে আকাশ দেখুন না যত খুশি—চাঁদ-সূর্য, কালো মেঘ, সাদা মেঘ। বাইরে তাকিয়ে মুশকিল করেন কি না! দেয়ালেরও কান আছে, কে কোত্থেকে রিপোর্ট করেছে।

পাঁচিল আকাশচুম্বী হয়ে আড়াল করে দিল ওপারের মানুষ। তবু সকালবেলা জনসমুদ্রের গর্জন ক্ষীণ হয়ে এপারে আসে। ভয় লাগে বিনোদের। রক্ষা এই, মুখের গর্জনই শুধু—কামানগর্জন নয়। এ গর্জনে মনে পীড়া দেয়, কিন্তু পাঁচিল ভাঙে না। মন আরও শক্ত করা প্রয়োজন, তখন কিছুই বিঁধবে না আর মনে।

*　　　*　　　*

পাশা উলটেছে। দেশ স্বাধীন। কুমুদনাথ একজন মন্ত্রী। ইন্দুরানী হেসে বলে, রাজবন্দীর বন্দী-দশা কাটল। এবারে রাজা।

কুমুদনাথ জবাব দেন, তুমিও ইন্দুরানী নও আর। ইন্দুটুকু বাদ দিয়ে ডাকব এবার থেকে।

ইংরেজ এত বড় রাজত্ব ছেড়ে যাবে, স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

কুমুদনাথ বলে, ইচ্ছে করে কি গিয়েছে? এ দেশে থাকা একেবারে অসম্ভব দেখে তখনই পাত্তাড়ি গুটোল।

ভ্রূ কুঁচকে ইন্দু বলে, ভারি ক্ষমতা তো তোমাদের! অস্ত্রের মধ্যে মুখের বক্তৃতা আর কাজের মধ্যে জেলে গিয়ে বহাল-তবিয়তে ভালোমন্দ খাওয়া, খেলাধূলা করা, ঘুমানো।

কুমুদনাথ স্বীকার করে নেয়, তা সত্যি। আমরা কে? ইংরেজ তাড়াল হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ জেলের বাইরে যারা ছিল, তারাই। রাজা বলতে গেলে—ওরাই তো! আমাদের ভালোবাসে, বিশ্বাস করে—ওদেরই সেবার জন্য তাই এই চাকরি দিয়েছে।

পুরো বছর কেটে গেছে। সরকারি বাড়িতে আছে এখন তারা। বড় বড় হল, বিশাল কম্পাউণ্ড, কার্পেট-বিছানো সুপ্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি। ইন্দু-রানীর ষোলো বছর একটানা কেটেছে ভাড়াটে বাড়ির একখানা ছোট ঘরে। সকাল-বিকাল উনুন ধরাতে নাকের জলে চোখের জলে হত। সে সব এখন দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়।

সোম আর বৃহস্পতিবার সকাল আটটা থেকে সাড়ে নটা অবধি কুমুদনাথ দেখা করে সাধারণের সঙ্গে।

কাতার দিয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে যায়। নিখিল পার্সন্যাল-সেক্রেটারি হয়েছে—বিচার-বিবেচনা করে জনকয়েককে একের পর এক নিয়ে আসে দোতলার বসবার ঘরে। টং করে ঘড়িতে আওয়াজ হয় সাড়ে নটা বাজবার। নিখিল বাইরে এসে বলে, আজকে এই অবধি। আসুন তবে আপনারা। জয় হিন্দ!

ইন্দুরানী থই পাচ্ছে না এই অনভ্যস্ত পরিবেশে। রোগা একফোঁটা মানুষটি এত বড় বাড়ির মধ্যে যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে যায়। জেলে না থাকা সত্ত্বেও কুমুদনাথের সঙ্গ তিলার্ধকাল পাওয়া যায় না। জরুরি কাজের জন্যে কোনো কোনো দিন সন্ধ্যার আগেই সোজা সে বাড়ি ফেরে। ফিরে এসে ফাইলের মধ্যে ডুবে যায়। ইন্দুরানী রেকাবিতে ফল-মিষ্টি নিয়ে এসে দরজার ধারে দাঁড়ায়। পায়ের শব্দে কুমুদ এক নজর তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে, কি খবর?

ইণ্টারভিউয়ে এলাম অনেক খোশামুদি করে আমাদের নিখিলবাবুকে। সেই যেমন সেকালে করতে হত, মনে নেই?

বোসো—

ইন্দুরানী বসল সামনের চেয়ারটায়। সেদিন সকালে এক ব্যাপার হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গ আনাগোনা করছিল ইন্দুরানীর মনের মধ্যে। বলে, আচ্ছা—মানুষ মানুষের কাছে আসবে, তার জন্য এত কড়াকড়ি কেন তোমাদের?

কাজকর্মের অসুবিধা হয়। তা ছাড়া, কত লোকের কত রকম মতলব থাকতে পারে। সবাইকে তো খুশি করতে পারি নে। করা সম্ভবও নয়।

ইন্দুরানী বলে, অনেকেই তো খুশি নয় দেখলাম। ফটকে এত লোক এসে হল্লা করে গেল, কি ভয় করছিল যে আমার!

কুমুদ বলে, ভয়ের ব্যাপারই হয়ে উঠেছিল। খেতে পাচ্ছে না, কাপড় জুটছে না—মরীয়া হয়ে উঠছে মানুষ। নিখিল ফোন করে দিতে দু-লরি আর্মড-পুলিশ এসে পড়ল। তখন সুড়সুড় করে সব পালাল।

ইন্দু বলে, পুলিশ-পাহারায় এইরকম থাকতে হবে আমাদের?

শয়তান মানুষের অভাব নেই। সাবধানে থাকাই ভালো।

ইন্দুরানীর একবার ইচ্ছা হল—বলে, ছেড়ে দাও এ চাকরি; যেমন ছিলে চলো তেমনি ভাড়াটে-বাড়ির একতলায়। কিন্তু সে-জীবনের কথা ভাবতে গেলে এখন শিউরে ওঠে সে। এই প্রাসাদ, এমন রাজভোগ, এত খাতির-প্রতিপত্তি সব জায়গায়!

সে শুধু বলল, ঐ যে ওরা ডান হাতের মুঠো আকাশে ছুঁড়ে হুমকি দেয়—প্রতিকার করো এর একটা।

গম্ভীর হয়ে কুমুদনাথ বলে, হবে বই কি! নিশ্চয় হবে।

ভারে ভারে ইট-বালি-সিমেণ্ট এসে পড়ল। ইন্দুরানী ঠাট্টা করে বলে, পাঁচিল উঁচু করে রাজাকে বন্দী করবার আয়োজন বুঝি?

কুমুদ বলে, যত সব বজ্জাত লোক—নিচু পাঁচিল টপকে হয়তো বা কম্পাউণ্ডের ভিতরই ঢুকে পড়বে। কিছু বলা যায় না ওদের কথা।

এমনি সময় নিখিল এসে বলল, কণ্ট্রাক্টর একবার দেখা করতে চাচ্ছে। পাঁচিলের এদিকে কাঁটা-তারের বেড়া কি রকম ভাবে হবে, সেইটে ভালো করে বুঝে নিতে চায়।

ইন্দুরানী সরে গেল। গান্ধিটুপি-পরা কণ্ট্রাক্টর—ফরসা চেহারা। কুমুদনাথ তার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

মাথা নিচু করে সসম্ভ্রমে নমস্কার করে কণ্ট্রাক্টর বলে, আমায় স্যার চিনতে পারছেন না? রিটায়ার করার পর কণ্ট্রাক্টরি করছি আজকাল।

মাথার গান্ধিটুপি খুলে ফেলল। টাক চকচক করছে। বিনোদ সমাদ্দার।

গান্ধিটুপি

বিপিন গুহর বিষম ভয় হল। কি কাণ্ড রে বাবা! চিরদিন যাদের বেপরোয়া লাঠি-পেটা করে এসেছে, জেল-দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছে, তারাই কর্তা হয়ে বসছে। গবর্নমেণ্টের দহরম-মহরম এখন তাদেরই সঙ্গে, আর সকলকে বাদ দিয়ে তাদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ চলছে। এটা চরম কৃতঘ্নতা বলে মনে হচ্ছে বিপিনের। ইংরেজ চলে যাবার সময় তাদের কথা একটুও ভাবছে না—যারা আপন-পর সকলের কাছে নিন্দিত হয়ে বরাবর কর্তাদের মন যুগিয়ে এসেছে। আর বিপিনের ভাগ্যে শুধু নিন্দা নয়—গালের উপর চপেটাঘাত-প্রাপ্তিও ঘটেছিল। মেরেছিল একটা পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। মেয়ে বলে সে রেহাত করবার লোক নয়। কিন্তু মুরুব্বি রতিপতি চাটুজ্জের কাছে আত্ম-

পূর্বিক নিবেদন করবার পর দেখতে পেল, চাটুজ্জে টিপিটিপি হাসছেন। মেয়েটার বয়স কত, তা-ও জিজ্ঞাসা করলেন একবার। শেষে উপদেশ দিলেন, চেপে যাও বাপু। মেয়ে-ঘটিত ব্যাপার, কত ক্যাকড়া বেরুবে এই নিয়ে। স্বদেশিদের অসাধ্য কাজ নেই।

কিন্তু এবারে এই আসন্ন দুর্যোগের সঙ্গে তুলনাই হয় না সেবারকার কিংবা দীর্ঘ চাকরি-জীবনের অপর কোনো ঘটনার। অকূলে পড়ে বিপিন আবার সদরে রতিপতির কাছে গেল।

কাণ্ডটা শুনছেন রায় সাহেব?

পরম নির্বিকার ভাব রতিপতির। অন্তত বাইরে থেকে সেই রকম দেখায়। একগাল হেসে তিনি বললেন, দেশি লোকের রাজত্ব হচ্ছে—ভালোই তো, আমরাও কিছু বিদেশি নই। চাকরি তো নয়—পেটের দায়ে রীত-রক্ষে করেছি। চুটিয়ে দেশ-সেবা করা যাবে এইবার।

দেখা গেল, কথাবার্তা শুধু নয়—অঙ্গের ভূষাও বদলে গেছে রায় সাহেবের। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আছেন—আধ-ময়লা, চটের মতো মোটা খদ্দরে তৈরি।

বিপিনকে বলে দিলেন, এসেছ তো কতকগুলো নিশান কিনে নিয়ে যাও। থানায় টাঙিয়ে দিও পনেরোই আগস্ট।

পনেরোই আগস্ট দিনটা ভালোয় ভালোয় কাটল। দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে—অঘটন কিছু ঘটে নি এখনো। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আছে বিপিন। ছোট গঞ্জের উপর থানা—স্বাধীনতার ঢেউ এতদূর অবধি পৌছতে সময় লাগবে। কিন্তু পৌছবে নিশ্চয়ই একদিন—তখন যে কি হবে, ভাবতে তার হৃৎকম্প লাগে!

ইতিমধ্যে সদরের পুলিশ-ক্লাব থেকে ছাপানো এক নিমন্ত্রণ-পত্র এল। রতিপতির পদোন্নতি হয়েছে। সাহেব-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিদায় হয়ে সেইখানে বহাল হয়েছেন তিনি। ক্লাবের তরফ থেকে সেই জন্য উৎসবের আয়োজন হয়েছে।

গিয়ে দেখে-শুনে বিপিন তাজ্জব! পুলিশ-ক্লাবের সভায় বেশির ভাগই কংগ্রেসি মানুষ। কয়েক জন বিশেষ পরিচিত তার—এক সময়ে কত পিছন পিছন ঘুরেছে! উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ জোটে নি, আর ইংরেজ-গবর্নমেণ্ট অত্যন্ত সদাশয় বলেই ফাঁসিতে লটকানো যায় নি। আজকে দেখা গেল,

এদের সঙ্গে রতিপতি হরিহর-আত্মা। ছোট একটু বক্তৃতাও করলেন রতিপতি। এরই মধ্যে এমন জ্বালাময়ী ভাষা রপ্ত করে ফেলেছেন—স্বকর্ণে শুনেও বিপিনের বিশ্বাস হতে চায় না। চিরদিনই সে পরম বশংবদ—আজ সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে।

করলও তাই—লোকজন তখন বিদায় হয়ে গেছে। বলে, স্বদেশিরা তবে তো লোক নিতান্ত খারাপ নয় রায় সাহেব। অনেকখানি দুর্ভাবনা কাটল।

রতিপতি নিচু গলায় বললেন, চিরকাল জেলে জেলে কাটিয়েছে, কাজকর্ম বোঝে কাঁচকলা। যেমন ছিলাম, তা-ই রয়ে গেলাম। বরঞ্চ ভালোই হল—মাথার উপরের সাদা ভূতগুলো নেমে গেছে, আমাদের পোয়া-বারো। কিন্তু রায় সাহেব বলে আর ডেকো না, খবরদার! উপাধি আমি ছেড়ে দিয়েছি।

বিপিন অবাক হয়ে তাকাল। মুচকি হেসে রতিপতি বলতে লাগলেন, পুরানো হাল-চাল বদলাতে হবে। যে বিয়ের যে মন্তোর। আচ্ছা, নৃপেন বিশ্বাস মশায় কেমন আছেন বলতে পার? এত করে লেখা হয়েছিল—তিনি এলেন না তো আজকের ব্যাপারে!

নৃপেন বিশ্বাস নামটা চেনা-চেনা লাগছে বিপিনের, সঠিক ধরতে পারছে না।

রতিপতি বললেন, তোমারই এলাকায় তো—বুধহাটায়। খবর রাখ না? নাঃ—তুমি এখনো সেই পরাধীন-ভারতে পচে মরছ। কিচ্ছু হবে না তোমার।

এখন মনে পড়েছে, সে লোকটার নাম নৃপেনই ছিল বটে! কিন্তু একেবারে ভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন এলাকায়। ফেরারি আসামির খোঁজ পেয়ে সমস্ত রাত তারা ডোবার ধারে বাঁশতলায় গুঁটিসুঁটি হয়ে ছিল। বাড়িটায় থাকতেন এক বুড়ি আর তাঁর মেয়ে—নৃপেনের আত্মীয়ও তাঁরা নন। বন্দুক-পিস্তল নিয়ে খুব সতর্ক হয়েই তারা জেগে ছিল। কিন্তু কোনো-কিছুরই প্রয়োজন হল না, ভোরবেলা কড়া নাড়তে চোখ মুছতে মুছতে নৃপেন দরজা খুলে দিল। প্রস্তুত হয়েই ছিল সে যেন। বুড়ি এত সব জানতেন না—পুলিশ-দলের হাতে-পায়ে ধরতে লাগলেন, মেয়ের ও তাঁর যেন বিপদ না ঘটে। অকথ্য গালিগালাজ করতে লাগলেন নৃপেনের উদ্দেশে। মেয়েটা কিন্তু মায়ের মতো নয়। বিপিনের নজরে পড়ল, কাপড়ের ভিতর কি নিয়ে গোয়ালের পাশ দিয়ে সে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে। ছুটে গিয়ে তার হাত চেপে ধরল। ধরতেই বজ্জাত মেয়েটা বাঁ-হাতে বিরাশি সিক্কার চড় কষিয়ে দিল তার গালে···

এ নৃপেন যে সেই লোকই, তার মানে নেই। এক নাম কতজনের থাকতে পারে! আর হলেই বা কি—এবার যাচ্ছে তোয়াজ করতে। খোশামুদির মন্ত্রে দেবতাকে অবধি প্রসন্ন করা যায়, এরা তবু মানুষ।

খোঁজে খোঁজে বিপিন বুধহাটায় গেল। থানা থেকে নৌকোয় যেতে হয়। থানার দারোগা স্বয়ং এসেছেন শুনে নৃপেনের বুড়ো বাপ ত্রিলোচন তটস্থ হয়ে উঠলেন। কি করবেন, কোথায় নিয়ে বসাবেন—ভেবে পান না।

বিপিন বলল, আলাপ-পরিচয় করতে এলাম নৃপেনবাবুর সঙ্গে! ধরুন, ওঁরাই তো মনিব এখন। না হবেন কেন, কম কষ্ট করেন নি তো দেশের জন্য! তা কি করতে পারি বলুন আপনাদের?

ত্রিলোচন বললেন, আমি পেনশন পেতাম আঠারো টাকা বারো আনা করে। ছেলের দোষে বন্ধ করে দিয়েছিল। আবার দরখাস্ত করব ভাবছি। আপনারা যদি একটু সুপারিশ করে দেন, সহজে হয়ে যাবে।

বিপিন হেসে বলল, নিশ্চয় আমি করব, একশ-বার করব। কিন্তু এ-সমস্ত কিচ্ছু লাগবে না। কাক-পক্ষীর মুখে একবার আপনার ছেলের নামটা পেলে হয়। পেনশন ডবল হয়ে যাবে—সুদ সমেত দিয়ে দেবে অ্যাদ্দিন যত বকেয়া পড়ে আছে।

নৃপেন কোন দিকে গিয়েছিল, বাড়ি ফিরল এই সময়। শশব্যস্তে বিপিন উঠে দাঁড়াল। কিন্তু বিপিন চিনলেও নৃপেন তাকে চেনে নি। বিপিনের হঠাৎ সেই আদালতের ঘটনা মনে পড়ে গেল। সাক্ষির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিপিন সত্য-মিথ্যায় মিশিয়ে ওদের সম্বন্ধে উপন্যাস রচনা করেছিল, আর আসামিরা সে সময় হাসাহাসি করছিল নিজেদের মধ্যে। বয়ে গেছে ওদের তার মতো তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্পাইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখবার! অত নিচুতে ওদের নজর পড়ে না।

ত্রিলোচন সসম্ভ্রমে বলে উঠলেন, আমাদের থানার ও. সি. ইনি। কী দরকারে তোমার কাছে এসেছেন।

কৌতুক-কণ্ঠে নৃপেন জিজ্ঞাসা করল, কি মশায়, সমন-টমন আছে নাকি?

বিপিন বলে, কী যে বলেন হুজুর! সবাই আসছে, আমিও তাই এলাম।

চালচুলোহীন বাউণ্ডুলেরা আসে। আপনাদের মতো মহাজনদের পায়ের ধুলো পড়লে এখনো গা কেঁপে ওঠে।

বিপিন জিভ কেটে বলল, ছি-ছি, কী বলছেন! আমরা হলাম কীটস্য

কীট। আপনারা দেশের গৌরব—আকাশের চাঁদ-সুয্যির সঙ্গে তুলনা হয় আপনাদের।

বটে! এমন হয়ে গেছি এরই মধ্যে? অ্যাদ্দিন অবিশ্যি ছিলাম না।

ছিলেন চিরদিনই। বিলাতি শয়তানগুলোর জন্য মুখের বার করি নি। বুক ফেটেছে, মুখ ফোটে নি।

ভূমিকা বেড়ে উতরেছে—বিপিন আসল কথা পাড়ল এইবার। থানার মাঠে নৃপেনের সংবর্ধনা-সভা করবে, তাই সে জানাতে এসেছে।

নৃপেন ঘাড় নাড়ে। উঁহু—কাজ নেই। ভালোবেসে দেখা করতে এসেছেন, ঐ তো হল। জেল থেকে বেরিয়ে অবধি শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। জ্বর হচ্ছে—অত্যন্ত দুর্বলতা বোধ করছি।

বিপিন বলে, সভার এখনো হপ্তা তিনেক বাকি। ততদিন সেরে যাবে। অনুমতি দিয়ে দিন, উয্যুগ-আয়োজনে লেগে যাই।

নাছোড়বান্দা একেবারে। নৃপেনের হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। ত্রিলোচনের মধ্যস্থতায় অনেক কষ্টে অবশেষে তাকে রাজি করা গেল।

* * *

সভার দিন ভোরবেলা বিপিন বড় পানসি নিয়ে বুধহাটার ঘাটে পৌছল। তেরঙা নিশান আর পদ্মফুলে পানসির আষ্টেপিষ্টে সাজানো। এই পানসিতে করে নৃপেনকে নিয়ে যাবে। বাড়ির দরজায় পৌছল, তখন কেউ ওঠে নি। বিপিনের আর-একদিনের কথা মনে পড়ে, যেদিন সদলবলে ধরতে গিয়েছিল ফেরারি নৃপেনকে।

সাড়া পেয়ে ত্রিলোচন বাইরে এলেন।

কেন এসেছেন দারোগা বাবু, কাকে নিয়ে সভা করবেন? কাল দুপুরে বুড়ি-বারুণিতে রেখে এসেছি যে তাকে!

হাউ-হাউ করে বুড়ো কাঁদতে লাগলেন। এ অবস্থায় কি করবে, কি বলে সান্ত্বনা দেবে, বিপিন ভেবে পায় না।

এমন সময় স্নেহ-কণ্ঠের ডাক এল, বাবা—

সদ্য-বিধবার বেশে বউটি বেরিয়ে এল। চোখের কোণে অশ্রুর দাগ এখনো শুকিয়ে আছে।

বাবা, এই যে বললেন, আর কান্নাকাটি করবেন না, শান্ত হয়ে থাকবেন। নয় তো বলে দিচ্ছি, আমরাও যেদিকে হয় চলে যাব।

বিপিনের দিকে চোখ পড়ে সে থেমে গেল। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, কি বলছেন উনি বাবা ?

থতমত খেয়ে বিপিন বলে উঠল, এ তো কেউ আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।···তা কি করতে পারি বলুন এখন ?

তীব্র কণ্ঠে বউটি বলল, মাথা থেকে গান্ধিটুপিটা নামিয়ে ফেলুন। অত পাপ ঢাকা পড়বে না ঐটুকু টুপিতে।

বিপিন চিনল—এই তো সেই মেয়ে, চড় মেরেছিল যে একদিন।

প্রথম কথা

ফণিভূষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বাহিরে ঝুপঝুপ অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। মেয়েরা যে যার বাড়ি চলিয়া গিয়াছে। ঘুমের ঘোরে একখানা হাত গিয়া পড়িল বধূর গায়ে। চোখ মেলিয়া দেখে বধূ তারই দিকে চাহিয়া আছে। তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া বধূ মুখ ফিরাইয়া শুইল। লজ্জিত ফণিভূষণ আরও হাত দুই ফাঁক হইয়া তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া পাশবালিশটা মাঝখানে দিল, পরের মেয়ের গায়ে হাত যাহাতে আর না পড়িতে পারে।

তবু জাগিয়া জাগিয়া ভাবিতে লাগিল, যদি সে একটা কথা বলিয়া উঠে !···

প্রথম যে কথাটি নববধূ তোমার কানে কানে কহিয়াছিল, তাহা মনে আছে কি ? মনে পড়িবে না। বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করিতেছিল, দু-হাতে প্রাণপণ চেষ্টায় বুক চাপিয়া বসিয়া ছিলে, কেবলই অনুভব হইতেছিল, ইহা আলাপন নয়—অচেনা কিশোরী তার মর্মের সকল মধু কানের মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে।··· সেদিনের কথা ভাবিয়া দেখিও।

বৈঠকখানায় বরযাত্রীর দল শুইয়াছিল। জানলা-দরজার ছিদ্রপথে শতঘ্নী বাণের মতো রোদ আসিয়া গায়ে বিঁধিতে লাগিল। বাজনদারের দল ওদিকে এমনি বিক্রম শুরু করিয়াছে যে, কান বাঁচাইতে হইলে বখশিশ দিতেই হইবে। কেদার মুখুজ্জে মহাশয় উঠিয়া দরজা খুলিলেন। তারপর সকলে উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করিয়া ফণিভূষণ সেখানে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। মেয়ের বাপ নাই, মামাই কন্যাকর্তা। আয়োজন

প্রচুর। বাটি বাটি চা শুইয়া থাকিতেই শিয়রে আসিয়া পৌছায়। চন্দ্রপুলি ক্ষীরের-ছাঁচের ব্যবস্থাও আছে।

মুখুজ্জে মহাশয়ের লোভ হইল, চা জিনিসটা এই সুযোগে কিঞ্চিৎ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। এক বাটি লইয়া মাঝে মাঝে উষ্ণতা পরীক্ষা করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন, কতক্ষণ আর অপেক্ষা করিতে হইবে! এমনি সময়ে হঠাৎ অন্তঃপুরে কান্নার রোল।

ব্যাপার কি? কেদার চারিদিক তাকাইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ফণী? ফণী কোথায় গেল?

মণীন্দ্র তাঁহার বড় ছেলে, ফণীর প্রায় সমবয়সি। সে বলিল, আবার তাকে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গেছে। মেয়েরা ঘিরে বসেছেন।

তবেই হয়েছে! কেদার শুষ্কমুখে গাড়ু-হাতে উঠানে নামিলেন। গলা খাটো করিয়া বলিলেন, বাঁচতে চাও তো বসে থেকো না বাবারা। আমি যাচ্ছি ঐ বাঁশ-বাগানে। এমন-তেমন বুঝলে ওখানে গাড়ু ফেলে গিয়ে নৌকো খুলে দেব।

সকলেই চঞ্চল হইয়া অন্তঃপুরের দিকে ঘন ঘন তাকাইতে লাগিল। কন্যার মামা লাঠি লইয়া আসিয়া পড়েন বুঝি!

কেদার মুখুজ্জের অনুমান মিথ্যা নয়।

নানারূপ কথাবার্তার মাঝখানে একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, জামাইবাবু, আপনি কি কাজ করেন?

ইহার জবাব পূর্বাহ্ণেই তালিম দেওয়া ছিল, বাড়ি থাকিয়া সে বিষয়-আশয় দেখে। ফণিভূষণ নির্ভুল উত্তর দিল।

আর কিছু করেন না?

ও-অঞ্চলের উৎকৃষ্ট ঘোড়সওয়ার বলিয়া ফণীর খ্যাতি আছে। এমন মজলিসে সেই বাহাদুরিটুকু না লইয়া সে পারিল না। বলিল, আর ঘোড়ায় চড়ি।

না, ঘোড়ার ঘাস কাটেন?

তা-ও কাটি।

মাইনে কত?

মাইনে দেয় না, চড়তে দেয়।

মেয়েদের হাসি থামিয়া গেল। বেশ বোঝা গেল, ঠাট্টা-তামাশার কথা ইহা নয়। জামাই সত্যই ঘোড়ায় চড়িয়া থাকেন এবং কৃষ্ণের জীবের জন্য প্রত্যহ ঘাস কাটিয়া আনেন। ঘোড়ার মালিক মণীন্দ্র মুখুজ্জে। সে বিবেচক ব্যক্তি, মাঝে মাঝে ফণীকে চড়িতে দিয়া থাকে।

জেরার মুখে আরও প্রকাশ পাইতে লাগিল, যে দোতলা বাড়ি কন্যাপক্ষকে দেখানো হইয়াছিল, বাপ মরিবার সময়ে সেটা ফণীরই ছিল বটে, কিন্তু তাহার পর দেনার দায়ে কেদার মুখুজ্জে দখল করিয়াছেন। তা বলিয়া সে নিরাশ্রয় নয়, পুকুরপাড়ের কসাড় বৈঁচির জঙ্গল কাটিয়া কেদারই নিজ খরচে এক খড়ের ঘর তুলিয়া দিয়াছেন। আবার গত বছর জমাজমি যা-কিছু ছিল সমস্তই কেদারকে লিখিয়া দিয়া সে একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট হইয়াছে। কিন্তু বিয়ের উৎসাহ বড় প্রবল ; কেদারও প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, ভালো জায়গায় সম্বন্ধ ঠিক করিয়া দিবেন।

কনের মা জানলায় কান রাখিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতেছিলেন, তিনি ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মামা আসিয়া পড়িলেন, আরও লোক জমিতে লাগিল। সমস্ত কথা শুনিয়া মামা ঘাড় নাড়িলেন, বিশ্বাস হয় না। তা ছাড়া বিয়ে-বাড়িতে আত্মীয়-কুটুম্বের ভিড়ে—এ সব চুকিয়া যাক, দশের মধ্যে মান তো বাঁচুক—সকল কথা তারপর ভাবা যাইবে।

মেয়ের মুখ সেই হইতে অন্ধকার। কনে-বিদায়ের সময় বলির শেষে কবন্ধ পশুর মতো সে আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতে লাগিল। মা-ও আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্রাবণ মাস। দিনভোর বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু রাত্রিবেলা মেঘ কাটিয়া দিব্য জ্যোৎস্না ফুটিল। চারিদিক ভিজে-ভিজে, কে যেন বড় কান্না কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া এখন চুপ করিয়াছে। প্রহরখানেক রাতে জোয়ার আসিল। পাশের নৌকায় বুড়ারা বিপুল চিৎকারে পাশায় মাতিয়াছেন। দুই নৌকা পাশাপাশি বাঁধা হইল। এ নৌকার এক কামরায় বধূ ও ঝি, আর একটিতে ফণিভূষণ ও বরযাত্রীর দল। নরম চকচকে বালুময় তীরভূমি। সকলে নামিয়া সেইখানে মাদুর পাতিয়া হারমোনিয়াম লইয়া বসিল। ফণিভূষণ উঠিল না, নৌকার মধ্যে চুপচাপ শুইয়া।

মাঝের দরজাটা একবার ফাঁক করিয়া সে দেখিল, ঝি নাক ডাকাইতেছে। বধূও সম্ভবত ঘুমাইতেছে, অন্যদিকে মুখ ফেরানো। মুখ তুলিয়া একটা বাক্স

যদি কোনোরকম একটু আলাপ করিত! অনেকক্ষণ সে তাকাইয়া রহিল, অনেক ইতস্তত করিল। অবশেষে মুখ বাড়াইয়া চুপিচুপি ডাকিল, ওগো—

চমকিয়া বধূ মুখ ফিরাইয়া তাকাইল। ঘুমায় নাই, চোখে কান্নার দাগ শুকাইয়া আছে। এক নজর চাহিয়া আবার মুখ গুঁজিয়া পড়িল। সাহস করিয়া ফণী আরও একবার চেষ্টা করিল। বধূ সাড়া দিল না।

ইতিমধ্যে পাশাখেলা ভাঙিয়া কেদার মুখুজ্জেও নৌকার গলুয়ে আসিয়া বসিয়াছেন। ফণীকে ডাকিলেন। তটস্থ হইয়া সে বাহিরে দাঁড়াইতে কেদার সগর্বে বলিতে লাগিলেন, যে কথা সেই কাজ—দেখলে তো? কত সুহৃৎ তোমার কাছে চুকলি কেটেছিল, কেদার মুখুজ্জে বোকা পেয়ে ঠকিয়ে নিচ্ছে—বিয়ে-থাওয়া কিচ্ছু দেবে না। বলো এখন, কথা রেখেছি কি না?

বিনয় ও কৃতজ্ঞতায় ফণী অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

উপর হইতে মণীন্দ্র ডাক দিল, ফণীদা, কি করছ ওদিকে? শোনো—

হারমোনিয়ামের কোলাহল হইতে নিভৃতে এদিকে সরিয়া আসিয়া মণীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, একা-একা কি করছিলে বলো দিকি? বউদির সঙ্গে ভাব জমাচ্ছিলে? কি বললে বউ?

নিরতিশয় ম্লানমুখে ঘাড় নাড়িয়া ফণী বলিল, কিছু না—

তুমি বোকা। ওরা কি আগে কথা বলে? কত সাধাসাধি করতে হবে, তবে তো! আগে কথা বললে তুমিই আবার ভাববে, কি রকম বেহায়া বউ!

আমি তো কতবার ডাকলাম, তবু কথা বলে না।

মণীন্দ্র অভয় দিয়া বলিল, বলবে, বলবে—এখনো বাকি আছে। ও অনেক খোশামোদ করতে হবে—সোজা নয়।

তারপর আসল কথা পাড়িল। খাওয়া-দাওয়ার কি হবে এ বেলা? ক্ষিধে লাগছে যে?

ফণী চুপ করিয়া রহিল। বধূর অশ্রুম্লান মুখখানি বড় মনে আসিতে লাগিল। খাওয়ার কথা এ সময়ে তার ভালো লাগিল না।

মণীন্দ্র বলিল, মিছে আলসেমি করে কি হবে দাদা, দুটো ভাতে-ভাত চাপিয়ে দাও চরের উপর। চাল-ডাল আছে—সমস্ত রয়েছে—

কেদার মুখুজ্জে নামিয়া আসিতেছিলেন। শেষ কথাটি কানে গেল। বলিলেন, না—ওকে দিয়ে রাঁধিও না। ও হল বর—আজকের দিনটে আর কেউ রান্না করুক।

মণীন্দ্র হাসিয়া বলিল, ঢেঁকির আবার স্বর্গবাস! চিরকাল করে এল, বর হয়েছে তো শিঙ বেরিয়েছে নাকি?

কিন্তু শিঙ বাহির না হইলেও ফণীর কি-যেন একটা হইয়াছে। ঘাড় নাড়িয়া—কোনোদিন যাহা করিতে সাহস পায় না—তাহাই করিল। বলিল, আমি পারব না।

মণীন্দ্র বিস্মিত হইল। তবু মৃদু হাসিয়া বলিল, আমরা না হয় উপোস করলাম, কিন্তু বউ পরের মেয়ে—তার ভাবনা ভাবতে হয় একবার!

কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে ফণী নৌকার মধ্যে চুপচাপ গিয়া বসিল। জোয়ার-জল কলকল করিয়া কূল ছাপাইয়া উঠিতে লাগিল। চোখ বুজিয়া সে ভাবিতে লাগিল, বধূর শুকনা মুখখানির কথা। তারপর ভাবিল, কি হইবে আলস্য করিয়া? ভাত রান্না হইতে কতক্ষণই বা সময় লাগিবে! ও-পাশের কামরায় নিঃসাড় হইয়া বধূ তেমনি পড়িয়া আছে; ওখানেই চাল, ডাল, রাঁধিবার সমস্ত মালমসলা। পা টিপিয়া টিপিয়া সেখানে গিয়া সমস্ত গোছাইল। তারপর ফিরিয়া দেখে, ইতিমধ্যে কোন সময়ে উঠিয়া বধূ দরজা চাপিয়া বসিয়া আছে।

বধূ কথা বলিল—কিছুমাত্র সাধাসাধি করিতে হইল না—এমন লজ্জার কাণ্ড কেহ কখন শুনিয়াছ কি? বেহায়া বউ নিজ হইতে কথা বলিল, দরজায় পিঠ দিয়া পথরুদ্ধ করিয়া বলিল, আপনি যাবেন না রাঁধতে—

মণীন্দ্র ডাকিতেছে, উনুন ধরিয়েছি ফণীদা, এসো শিগগির।

বধূ বলিল, আপনি যদি যান ওখানে, আমি এই গাঙে ঝাঁপ দিয়ে মরব।

তাহার গৌর গণ্ড দুটি বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

আংটি

পান-তামাক তো মুহুর্মুহু। তার উপর বেলা একটু গড়াইয়া আসিতেই রেকাবি-ভর্তি লুচি ইত্যাদি আসিয়া হাজির। গণেশচরণ খাসা লোক, দৃষ্টি সকল দিকে। পাশার ছকটা আপাতত গুটাইয়া রাখা গেল।

এই সময়ে নিধিরাম ভারি ব্যস্ত ভাবে গণেশকে আসিয়া কি বলিল। গলা

খাটো করিয়াই বলিয়াছিল, এবং আমরাও রেকাবির দিকে কিঞ্চিৎ বেশি মনোযোগ দিয়াছিলাম, কথাটা ভালো রকম কানে যায় নাই। মোটের উপর সেই পুরানো ব্যাপার। অর্থাৎ আশুদাকে লইয়া পুনশ্চ কি এক কাণ্ড বাধিয়াছে।

গণেশ হন্তদন্ত হইয়া ছুটিল। ফিরিতে অনেক দেরি। আমি ছাড়া আর সকলে তখন সরিয়া পড়িয়াছে। আসিয়া হাতপাখা লইয়া খুব খানিকটা বাতাস খাইল। বলিতে লাগিল, ছি-ছি-ছি! আমার মাথা কাটা যায়, তা বুঝবেন না। এমন দুর্ভোগ আমার!

মাথা-কাটার হেতুটা ক্রমশ ব্যক্ত হইতে লাগিল। ক্রোশ পাঁচেক দূরে কোথায় নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া আশুর কলেরা হইয়াছিল। বাড়ির কর্তা যা করিবার করিয়া বুড়াকে গোরুর গাড়ি করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে। এখন তাহাকে উপরের ঘরে শোয়াইয়া গোরুর গাড়ির ভাড়া মিটাইয়া দুই মেয়ে ও মেজ ছেলেকে পাশে বসাইয়া রাখিয়া তবে আসিতে হইল। তাই এত দেরি।

আশুতোষ গণেশের বৈমাত্র বড় ভাই। তাকে লইয়া বেচারার দুর্ভোগের পার নাই সত্য। আট টাকা মাহিনায় তহ্‌শিলদারি করিতে করিতে গণেশ এখন নিজেই ছোটখাটো কয়েকটা তালুক লইয়া বসিয়াছে। এ অঞ্চলে মানসম্ভ্রম যথেষ্ট। পয়সা হইয়াছে—তবু বড় ভাইকে যেমন মান্য করে, এই কলিযুগে তাহা নিতান্ত দুর্লভ। কিন্তু আশুর চিরদিনের উদ্ভট স্বভাব—এমন চক-মিলানো বাড়ি, ছেলে-মেয়ে, চাকর-বাকর, এতসব সুখ-আরামে বুড়োর যেন গায়ে জ্বালা চড়িয়া যায়। এই দেখা গেল, দিব্যি আছে, খায়দায় ঘুমায়—হঠাৎ বিকাল হইতে আশুর আর দেখা নাই⋯খোঁজ্‌ খোঁজ্‌—কোথায় পাইবে? তিন-চারিদিন পরে পান চিবাইতে চিবাইতে হাসিমুখে আসিয়া হাজির। বলে, কি করি বলো, তিনকড়ি মিস্তিরের সঙ্গে আজকের চেনা তো নয়! ন-মেয়ের বিয়ে—বলল, দাদা, দেখেশুনে শুভকর্মটা সেরে দিয়ে যাও—

রাগ করিয়া গণেশ বলে, চেনা না হাতি! কাকপক্ষীর মুখে শুনে দাদা দৌড়ও—বলি, এ বাড়িতে কি ভাত জোটে না? লোকে যে আমায় নিন্দে করে।⋯বলো, কি খেতে চাও? বাড়িতে বলে না পাও যদি—

বুড়া হাসিয়া প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া দেয়, আচ্ছা আচ্ছা—আর যাব না। হল তো? কিন্তু এ কেবল মুখের কথা। নিমন্ত্রণের নূতন খবর আসিতে যে ক-টা দিন দেরি!

গণেশের অনুরোধে আমরাও কখন কখন বুঝাইতে গিয়াছি, না আশুদা, ও সব রীত ছেড়ে দিন। হাজার হোক গণেশের পজিশন আছে। আপনি তার ভাই—ছিঃ—

ইহার ফল উলটা হইত। বুড়া রাগিয়া অগ্নিশর্মা। দুই হাতের অঙ্গুষ্ঠ নামাইয়া বলিত, আমার এই কলা! ঘোড়ার ডিম হবে আমার! বউ নেই, ছেলেপিলে নেই—কিসের তোয়াক্কা? সুখের পায়রা—যেখানে স্ফূর্তি, সেইখানে আছি। ভাই-বেরাদার কেউ কারও নয়—সব ডোণ্টো-কেয়ার করি—

দিন কয়েক পরে যথারীতি পাশা খেলিতে গিয়া শুনি, গণেশ বাড়ি নাই। এক ছিলিম তামাক খাইয়া চলিয়া আসিব, তামাক সাজার হুকুম দিয়া দিয়াছি। এমন সময়ে ফটফট জুতার শব্দ করিয়া আশু সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল। ছেঁড়া ময়লা জিনের কোটের উপর কোঁচানো চাদর উঠিয়াছে। নিমন্ত্রণের বেশ না হইয়া যায় না! পেছনে গণেশের বড় মেয়ে নীহারকে দেখিয়া আর সন্দেহমাত্র রহিল না। মেয়েটা আমাকেই মধ্যস্থ মানিয়া বসিল।

বুঝুন চাটুজ্জে মশায়, এই সেদিন এ-রকম হল। আবার কি যাওয়া উচিত? আর অত্যাচার সইবে না শরীরে।

হঠাৎ আশু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। খুব সইবে, খুব—খুব। কত সয়েছে জানিস না তো!

নীহার তখন হাত ধরিয়া ফেলিল। উঠে আসুন, জেঠামশায়—

বুড়া উঠিল না, বাহির হইয়াও গেল না। ধপ করিয়া তক্তাপোশের উপর বসিয়া ঠোঁট চাপিয়া হাসিতে লাগিল। মেয়েটি আবদারের সুরে বলিতে লাগিল, কোনোদিন—কোথাও আপনার আর যাওয়া হবে না। জানেন, এই ইয়ে—আমি গার্জেন হয়েছি। যদি যান, কি যাবার চেষ্টা করেন--দেখবেন কি করি—

আচ্ছা তাই। তোর বাবাকে আংটি ফিরিয়ে দিতে বল্।

হঠাৎ বুড়ার চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বলিতে লাগিল, বিশ বছর হয়ে গেল, দেয় না কেন? দিয়ে দিক। তারপরে যদি যাই কোথাও···এই চাটুজ্জে মশাই ব্রাহ্মণ মানুষ—পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি।

সভয়ে পা টানিয়া লইলাম। আংটির কথা বুড়ার মুখে আরও যেন দু-একবার শুনিয়াছি। কথাটা জানিতে কৌতূহল হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসের আংটি আশুদা?

গজমোতির—আশু বলিবার আগে নীহার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

তারপর গলা নামাইয়া বলিল, মিছে বকবক করে কি হবে জেঠামশায়? উপরে চলুন।

আমার প্রশ্নটা চাপা দিতে পারিলে সে যেন বাঁচে। বুড়া কিন্তু ছাড়িবার লোক নয়। বলিল, শুনবেন? সে এক সাতকাণ্ড রামায়ণ চাটুজ্জে মশাই। বিয়ের আংটি। ঐ যে আমার ভাইটি—সামনে ভিজে বেড়াল—ঐ বাপের কুপুত্তুর আমার আংটি চুরি করেছে। এত বলি—কিছুতে বের করবে না।

নীহার এক মুহূর্তে ছিটকাইয়া হাত দশেক দূরে রণরঙ্গিণীর মতো দাঁড়াইল। বলিল, বাবার কিনা আংটির অভাব! নিজে হারিয়ে ফেলে বাবার নামে কলঙ্ক। কেউ ও-কথা বিশ্বাস করবে না। ভারি তো বিয়ে, তার আবার আংটি!

বস্তুত বিশ্বাস করিবার কথাও নয়। কি এমন আংটি যে গণেশচরণবাবু যাইবে তাহা চুরি করিতে!

বুড়ো কিন্তু সমান তেজে জবাব দিয়া চলিতেছে, বিয়ে যা-ই হোক—বিয়ের কথা তো হচ্ছে না। হচ্ছে আংটির কথা।

তারপর আমার দিকে চাহিয়া তার গলার স্বর ভারি হইল, চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। বলিতে লাগিল, সত্যি বলছি চাটুজ্জে মশাই, বউ মরায় কষ্ট হয় নি—নাপিতে-পুরুতে মিলে সাত পাক ঘুরিয়ে দিল। আধ-মরা এক মেয়ে—ঐসব ধকল আর সামলে উঠতে পারল না। কিন্তু আংটি তো আর মরা সোনার ছিল না মশাই। যেদিন আংটি গেল, আমি সামলাতে পারি নি, কেঁদে ফেলেছিলাম—

ইহার অনেক পরে আশুদার বিয়ের কাহিনী শুনিয়াছিলাম। গণেশ তখন তহশিলদারিতে দু-পয়সার মুখ দেখিতে শুরু করিয়াছে। আশুর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি—যাত্রার দলে অ্যাক্টো করিয়া বেড়ায়। গণেশের বিয়ের কথা-বার্তা হইল—বেশ ভালো সম্বন্ধ—দেনাপাওনা ভালোই। কিন্তু মুশকিল আশুকে লইয়া। বড় ভায়ের এইরকম অবস্থা—সে ঘরবসত না করিলে ছোট ভাই কি করিয়া করে? গণেশ নিজে উদ্যোগী হইয়া আশুর বিয়ের ঘটকালি করিল। ছয় বেহারার পালকিতে দাদাকে তুলিয়া পালকির আগে আগে লণ্ঠন হাতে একমাত্র বরযাত্রী হইয়া সে-ই চলিল। আশু খুব খুশি। রাজা রুক্মাঙ্গদ সাজিয়া রানীকে যে-সব সম্ভাষণ করিত, নিধিরামের সঙ্গে যুক্তি করিয়া তাহারই দু-চারিটা বাসরঘরের জন্য শানাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু সময়কালে দেখা গেল,

অসুবিধা নানাবিধ। এক নম্বর, বধূর বয়স মাত্র সাত-আট—যুক্তাক্ষরবহুল সম্বোধন শুনিয়া সে বেচারি কাঁদিয়া আকুল। দুই নম্বর ক্রমশ প্রকাশ পাইল, কান্নার হেতু কেবল যুক্তাক্ষরের আতঙ্ক নহে, ঐ সঙ্গে উদরব্যাপী প্লীহার কষ্ট। বাড়ি গিয়া গণেশকে আশু বিষম তাগিদ দিতে লাগিল, একটা ডি. গুপ্ত কিনে দাও ভাই, বিকেল হলে তোমার ভাজ-ঠাকরুনের গায়ে আগুন ছোটে।… আজ কাল করিতে করিতে খবর আসিল, গায়ের আগুন পাকাপাকি রকম নিভিয়াছে, ডি. গুপ্তর আর আবশ্যক হইবে না।

গণেশ অভয় দিয়া কহিল, বেশ তো দাদা, আর কুলের হাঙ্গাম রইল না। মৌলিকের মেয়ের অভাবটা কি? ফাল্গুনের দিকে ফের দেখা যাবে।

ইতিমধ্যে গণেশচরণের বউ আসিল, ছেলে হইল, ছেলের অন্নপ্রাশন হইয়া গেল, তারপর ছেলে-মেয়ে আরও পাঁচটা হইয়াছে—অনেক ফাল্গুনই আসিয়া গিয়াছে। আশুর তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। কিন্তু বিয়ের আংটি হাতে ছিল, সেইটা যে কোথায় গিয়াছে—ইদানীং যত বয়স হইতেছে, বুড়া খেপিয়া যাইতেছে। যার তার কাছে বলে, আংটি হারিয়েছে বুঝি? রামোঃ, চুরি হয়েছে। শোনো তবে সাতকাণ্ড রামায়ণ—

কিন্তু সপ্তকাণ্ড শুনিবার লোক মেলে না।

বাপের অপমানে নীহারের কিন্তু ভারি লাগিয়াছে। সে ব্যঙ্গের সুরে বলিতে লাগিল, কি রকম আংটি সেটা? কত টাকা দাম? আপনার শ্বশুর খেতে পেত না, বাবার কাছ থেকে আড়াই কুড়ি টাকা বাজিয়ে নিয়ে তবে মেয়ে বেচেছিল। সে কি হাজার-দুহাজার টাকার আংটি দিয়েছিল? বলুন, আমার দিকেই ফিরে বলুন না—

কিন্তু আশু উহার সকল প্রশ্ন অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে বলিতে লাগিল, পাথর-বসানো ঝকমকে আংটি চাটুজ্জে মশাই। মতি বেনের দোকানে আট টাকায় কেনা—শ্বশুর আমায় নিজ মুখে বলেছিলেন। আংটি ফিরিয়ে দিক। আপনি ব্রাহ্মণ-সন্তান—আপনার সামনে দিব্যি করছি, ওর মুখ হেঁট হয় তেমন কাজ আমি কক্ষনো করব না।

ইতিমধ্যে গণেশ কখন আসিয়াছে, টের পাই নাই। সে থামাইয়া দিল। থামো দাদা, থাম্ না খুকি—

কাছে আসিয়া আশুকে একেবারে তুলিয়া ধরিল। বলিল, চলো দাদা ওপরে। চুরি করে থাকি, করেছি। সে তো আট টাকার আংটি। তোমাকে

আমার নিজের আংটিটা দিয়ে দিচ্ছি। হল তো? কিন্তু এ-রকম পথে পথে বেড়াতে পারবে না। নিজে কষ্ট পাও, আমাদেরও ভাবিয়ে মার।

সত্যই সে হাতের আংটি খুলিয়া দিল। গণেশচরণের মতো মানুষ ভূ-ভারতে হয় না। একদিন আশুদাকে একা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কেমন? আর তো আংটির দুঃখ নেই? খুশি হয়েছ?

কিন্তু বুড়া কি খুশি হইবার লোক? নাক সিঁটকাইয়া বলিল, কিসে আর কিসে! সে আংটি আমার ঢের ভালো ছিল মশাই।

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলাম, মীনা-করা হীরার আংটি—অবশ্য কম-দামি হীরা—তবু আট টাকার আংটির শোক ইহার পর আর কোনোক্রমে পুষিয়া রাখা চলে না।

অকস্মাৎ এক নিদারুণ শোকের ব্যাপার ঘটিল। কপাল-ভরা সিঁদুর লইয়া নীহারের মা তিন দিনের জ্বরে সতীলোকে চলিয়া গেলেন। গণেশ আমাদের সামনে কাঁদিয়া খুন। তারপর সকল কাজকর্ম ছাড়িয়া বিবাগী হইয়া বসিল। পাশার আড্ডা উঠিল।

এমন করিয়া তো চলে না। মাস দুই পরে জবরদস্তি করিয়া গণেশকে লইয়া মেয়ে দেখিতে গেলাম। কিন্তু শুভকর্মে সে রাজি নয়। আশু তখন রুখিয়া উঠিল, বিয়ে করবে না—বললেই হল? আমি বর্তমান থাকতে ভাই আমার ভেসে বেড়াবে? ওর কথা কে শুনছে? তোমরা ঠিকঠাক করো।

বরযাত্রী আমরা দশ-বারো জন। বিধবার মেয়ে—নিতান্ত গরিব। বিয়ে তো চুকিয়া গেল। আশু এতক্ষণ বরকর্তার যেমনটি হইতে হয়—অতিশয় গম্ভীর ভাবে মন্ত্রপাঠ শুনিতেছিল, মাঝে মাঝে সমঝদারের মতো মাথা নাড়িতেছিল। হঠাৎ ইশারায় আমাকে ও নিধিরামকে কাছে ডাকিয়া কহিল, ইয়ে—ঐ যে আংটি দিয়েছে···ঐ দেখো না গণেশের হাতে—আমার ছিল ঠিক ঐ রকম।

নিধিরাম মুখ বাঁকাইয়া কহিল, আ মরি-মরি—কি আংটি দিয়েছে জামাইকে! সোনা নয়, ও কেমিকেল। সোনা কি ঐরকম হয়?

তৎক্ষণাৎ বিরক্তিতে তার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া আশু ফিসফিস করিয়া আমার কানে কানে কহিল, ঐ আংটিটা আমায় দিতে বলো। তা হলে আর ঘোরাঘুরি করে বেড়াব না। তুমি ব্রাহ্মণ মানুষ, এই তোমার পা ছুঁয়ে বললাম। ওর হীরের আংটি ও নিকগে, ওতে আমার দরকার কি?

হীরার আংটি আশু আঙুল হইতে খুলিয়া ফেলিল।

শাস্তি

পেট-কাটা ঘরের পাশে ডুমুরতলা। তার ওদিকে উঠানে বিস্তর মানুষ জমায়েত হইয়াছে। অতএব আর আগাইয়া আসা চলে না। ঐ ডুমুরতলায় দাঁড়াইয়া নানারূপ নির্বাক ভঙ্গি করিয়া হাত নাড়িয়া নাড়িয়া কমলা ভাইটিকে ডাকিতেছিল।

কিন্তু পান্নালালের যাইবার উপায় নাই।

দিদির সঙ্গে ইতিমধ্যে দু-একবার চোখোচোখি হইয়াছেও। কিন্তু এক মহা আশ্চর্য কাণ্ড! একটা লোক গুঁটিখেলা দেখাইতেছে। এই দেখা গেল, লোকটার হাতের মধ্যে একটিমাত্র গুঁটি; সেটা দুই-তিন-চারিটি হইয়া যায়। একবার গোটা দুই-তিন গালে ফেলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়া কান দিয়া পেট-গলা-হাত-পা যে যে-অঙ্গের নাম করিতেছে, সেইখান হইতে গুঁটি বাহির হইতে লাগিল। চারিপাশে ছেলেবুড়োর ভিড়। লোকটার বুজরুকি ধরিয়া ফেলিতে কাহারও চেষ্টার কসুর নাই। কিন্তু কিছুতে কিছু হয় না।

কমলা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষে ফিরিবার জন্য পা বাড়াইয়াছে। এমন সময় কোন দিক দিয়া হারান পালিত আসিয়া উপস্থিত। বুড়া চেঁচাইয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, কি গো বড়মানুষের গিন্নি, এমন চুপচাপ যে! তোমার দলের সবাই ওখানে, তুমি একলাটি…আনন্দময়ীর মুখ এমন শুকনো কেন গা—কি হয়েছে?

এই বুড়াটি সহজ পাত্র নয়। এতটুকু কাল হইতে কমলাকে যা জ্বালাইয়া আসিতেছেন! তখন বুঝিত না, কাঁদিয়া ভাসাইত—এখন পলাইয়া বেড়ায়। ইদানীং আবার বুড়ার ভাণ্ডারে তাহার সম্বন্ধে নূতন বিশেষণ জুটিয়াছে—বড়মানুষের গিন্নি। সলজ্জ হাসিয়া কমলা মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

পরম গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে হারান বলিলেন, তা বটে—এখন পাখনা যে কাটা! নাতজামাই মানা করেছে? তখনই বললাম—দিদি, বিদেশিরে মন দিও না, বুড়োর সঙ্গে স্বয়ংবরা হও।

দায় পড়িয়াছে নাতজামায়ের মানা করিতে! আর করিলেই বা কে শোনে? কমলা যাইবে না—তাহার খুশি তাই যাইবে না। শেষে ওখানে দশজনের মধ্যে তুমি বুড়া এই রকম ফের শুরু করিয়া দাও!

হারান হাসিতে হাসিতে উঠানে ঢুকিলেন। কমলা কহিল, দাদামশায়,

পান্নুকে একবার পাঠিয়ে দেবেন। একবার শুনে যাক, মোটে একটা কথা—তারপর আবার গিয়ে দেখবে ঐসব—

একটু পরেই খেলা ভাঙিল। পান্নু লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া দিদির হাত ধরিয়া উৎসাহভরে কি বলিবার উপক্রম করিতেছিল—কমলা অমনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, আচ্ছা ছেলে তো তুমি···সেই কখন এসেছ, আর ফিরবার নামটি নেই। যা বলেছিলাম মনে আছে?

পান্নু খুব সপ্রতিভ ভাবে ঘাড় নোয়াইয়া বলিল, হাঁ—

কি বল্ দিকি?

তুই মার হাঁড়ি থেকে চুরি করে আমসত্ত্ব দিবি—

তা দেব। আর, আসল কথাটা?

আমসত্ত্বের কথার উপরেও আসল কথা যে আর কোনটা হইতে পারে, তাহা পান্নালাল ভাবিয়া পাইল না। অবাক হইয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কমলা কহিল, আমসত্ত্ব দেব না কচু দেব তোমাকে। বললাম, পোস্টাপিসে গিয়ে চিঠি দেখে এসো—

গিয়েছিলাম। হঠাৎ বিস্মৃত কথা মনে পড়িয়া পান্নালাল চমকিয়া দাঁড়াইল। কহিল, দিদি, চিঠি এসেছিল।

তাই এতক্ষণ নিয়ে বসে আছিস তুই? একদৌড়ে দিয়ে আসতে বলি নি? কার চিঠি, দেখি।

পান্নু কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, উঠোনে বুঝি ফেলে এসেছি! তুই দাঁড়া—আমি এক্ষুনি নিয়ে আসি—

বলিয়া সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠানের দিকে দৌড়িল।

কমলা দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে দেখা গেল, পান্নু ফিরিতেছে। খালি হাত, কাঁচুমাচু মুখ দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে বাকি রহিল না। মুখ ঘুরাইয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কমলা কহিল, বেশ, লক্ষ্মী ছেলে! খুইয়েছ তো? যেখানে পাস, সেখান থেকে এনে দিতে হবে তোকে! নইলে আজ কেটে দু-খানা করব—তখন দেখবি ছেলে!

পান্নু নিরুত্তর। কমলা বলিতে লাগিল, পইপই করে বলে দিলাম, একছুটে আমায় দিয়ে যাবি···পাজি ছেলে—

পান্নু ভয়ে ভয়ে মৃদুস্বরে জবাব দিল, আসছিলাম তো! এমন সময় ডুগডুগি বাজিয়ে খেলা দেখাতে এল যে—

যাও, আবার দেখে এসোগে। আমি দাঁড়াচ্ছি এখানে। যাও—

আরও একবার খোঁজাখুঁজি করিয়া অনেক পরে সে ফিরিয়া আসিল। চিঠি পাওয়া গেল না।

ভাই-বোনে নির্বাক হইয়া পথ চলিতে লাগিল। খানিক পরে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, কার চিঠি? কি রকম ধারা চিঠি রে?

খাম—

সবজে খাম?

সাদা।

গন্ধ-মাখা?

তা আমি শুঁকে দেখি নি। খেলা দেখাতে এল, আমি চিঠি হাতে নিয়ে বসেছিলাম।

অবশ্য সাদা এবং নির্গন্ধ খাম হইলেই যে নীরেনের চিঠি হইতে পারে না, এমন নয়। এমনি উন্মনা ভাবে খানিকটা চলিতে চলিতে কমলা কহিল, কোথায় ফেললি বল দিকি পানু, কার হাতে পড়বে···ছি-ছি! একবিন্দু কাণ্ডজ্ঞান নেই তোর।

দিদির নরম স্বরে পানু সাহস পাইল। ঝড়টা বুঝি কাটিয়া গিয়াছে! আগাইয়া আসিয়া কমলার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া আবদারের স্বরে বলিল, আমসত্ব এখন দিবি তো? ও দিদি, গিয়েই?

দিচ্ছি—বলিয়া কমলা তাহার গালে কষাইয়া দিল এক চড়। তারপর আর একটা। আর পানু অমনি বাঘের মতো তাহার উপর পড়িয়া মারিয়া আঁচড়াইয়া চুল টানিয়া কাপড় ছিঁড়িয়া একাকার করিয়া তুলিল। কমলা আর সামলাইতে পারে না।

রও ছেলে, গুরুজন না আমি? মাকে বলে তোমার মজা দেখাচ্ছি। চলো বাড়ি—

কিন্তু তাহার আগেই 'ও মাগো'—বলিয়া গগনভেদী চিৎকার তুলিয়া পানু গৃহাভিমুখে ছুটিল। এবার কমলার ভয় হইল। মায়ের বকুনি—সে যাহা হয় এক রকম হইবে, কিন্তু হতভাগা ছেলে পত্র-ঘটিত সব কথা যদি বলিয়া দেয় কেলেঙ্কারির আর-কিছু বাকি থাকিবে না। জোর পায়ে আগাইয়া কাছে গিয়া ডাকিল, পানু!

পানুও গতিবেগ বাড়াইল এবং কান্না আর-এক পর্দা উঁচুতে উঠাইল।

পিছন হইতে কমলা কাতরভাবে ডাকিতে লাগিল, ও পানু, দাঁড়া একটু ভাই —লক্ষ্মীটি, দাঁড়া। এক্ষুনি বাড়ি গিয়ে আমসত্ত্ব দেব।

পানু একমুহূর্ত পিছনে তাকাইল। কথাটা প্রত্যয় করিতে পারিল না। কান্নাজড়িত কণ্ঠে টানিয়া টানিয়া কহিতে লাগিল, পোস্টাফিসে আমি তো গিয়েছি, তবু কেন তুই মারলি? শুধু শুধু কেন মারবি তুই আমায়? আমি মাকে বলে দেব—

কাছে আসিয়া ভাইয়ের চোখ মুছাইবার চেষ্টা করিতে করিতে কমলা বলিতে লাগিল, চুপ···চুপ! কাউকে কিছু বলতে নেই—

পানু জো পাইয়া গেল। এক্ষুনি গিয়ে সব বলব—

না—বলে না, ছিঃ!

এক্ষুনি—

এ ভাবে হয় না দেখিয়া কমলা ধমক দিয়া উঠিল, কি হয়েছে? কি বলবি তুই?

পানুর রাগ একটু যা শান্ত হইয়া আসিতেছিল, পুনরায় তাহা মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। বলিল, বলে দেব আমি—বলে দেবই—তুই মার হাঁড়ি থেকে আমসত্ত্ব চুরি করে দিস, কতদিন দিয়েছিস, সব আমি বলে দেব—

এই কথা? তা বলগে যা—বলিয়া কমলা হাসিয়া ফেলিল। নির্ভাবনায় পাশে কুন্তীদের বাড়ি ঢুকিয়া পড়িল। পানু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিল, কি করা যায়। নানারূপ ইতস্তত করিয়া সে-ও দিদির পিছু লইল।

মেটে-ঘরের অন্ধকার কোণে দুই সখী মহানন্দে গল্প করিতেছিল। পানু সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। কেহই মনোযোগ করিল না।

কেহ কিছু বলে না দেখিয়া অবশেষে পানুই কথা বলিল। আস্তে আস্তে বলিল, আমি বলে দেব না দিদি—

আচ্ছা—বলিয়া কমলা কুন্তীর সহিত যে প্রসঙ্গ হইতেছিল, তাহারই কি একটা জবাব দিল। দুজনে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

পানু দাঁড়াইয়া আছে। ক্ষণপরে কহিল, ও দিদি, চল্। সাড়া না পাইয়া পুনরায় কহিল, বেলা যে পড়ে গেল—কখন যাবি?

কোথা?

হাসিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিসফিস করিয়া পানু বলিল, সেই যে বললি বাড়ি গিয়ে আমসত্ত্ব দিবি—যাবি নে?

হাসিমুখে কুন্তী জিজ্ঞাসা করিল, কি বলে ?

রসভঙ্গে কমলা বিরক্ত হইয়াছিল। বলিল, কোথাও একদণ্ড থির হয়ে বসবার জো আছে ? রাক্ষস ছেলের কেবল খাবার বায়না। বলছে, আমসত্ত দাও।

তার আর কি হয়েছে ! তুমি বোসো পানুবাবু, আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি। কত খাবে খেও—বলিয়া কুন্তী আমসত্ত আনিতে বাহির হইয়া গেল। কমলাও সেই সঙ্গে। ফিরিয়া আসিয়া দেখা গেল, পানু নাই—চলিয়া গিয়াছে।

কমলা কহিল, বাড়ি চলে গেছে। ঐ যে তোর সামনে রাক্ষস বললাম—ভায়ের আমার মান গিয়েছে। সত্যি কুন্তী, আমি ভাবি অনেক সময়, অনেকদিন নেব-নেব করছে—গিয়ে সেখানে থাকব কেমন করে ? পানুকে সঙ্গে নিয়ে যাব—

কুন্তী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পারবি লো পারবি—একবার বরের ঘর করে দেখ—শেষে আর ভাই-টাই কিছু মনে থাকবে না—

কমলা আপন মনেই বলিয়া চলিল, তার উপর আজ আবার খামকা মেরে বসলাম। মুখখানা একেবারে রাঙা হয়ে গেছে—পাঁচটা আঙুলের দাগ পড়ে গেছে···আজ একখানা চিঠি হারিয়ে ফেলেছে।

চিঠি ? কবে এল রে ? কি লিখেছে, দেখালি নে আমায় ?

কমলা বিমর্ষ মুখে বলিতে লাগিল, আমিই বড় দেখতে পেলাম ! বড্ড ভাবনা হয়েছে ভাই, এখন একটু ইয়ে চলছে—মানে সেই চিঠির পর থেকে। আমার অপরাধ, একবার দু-দিন দেরি হয়েছিল চিঠি দিতে—তাই হেনো-তেনো কত কি লিখল ! আমিও তেমনি কড়া কড়া জবাব দিয়েছি।

কুন্তী বলিল, বেশ করেছিস, খুব করেছিস। ওদের ঐ কেবল লম্বা লম্বা কথা। মুরোদ তো ভারি ! আবার দেখিস, সামনে এসে কি রকম করবে—

কিন্তু কমলা ইহাতে বিশেষ ভরসা পাইল না। বলিতে লাগিল, কি যে মতিগতি হল, কেন যে লিখলাম ! বড্ড ভয় হচ্ছে ভাই, যদি রাগের মাথায় দেশান্তরী হয়ে যায়। পানু হতভাগা চিঠিখানা হারিয়ে এল, আজকে আবার কি লিখেছে কে জানে ?

বলিয়া চিন্তাকুল মুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, বাড়ি যাই—কেউ যদি চিঠি কুড়িয়ে পেয়ে বাড়ি দিয়ে এসে থাকে—

অবমানিত পান্নু বাড়ির কাছাকাছি গিয়া আবার সশব্দে কান্না জুড়িয়া দিল। মা ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন।

কি হল রে? কে মেরেছে?

দিদি—বলিয়া পান্নালাল রোয়াকের উপর আছড়াইয়া পড়িল। যেন একদম খুন হইয়া গিয়াছে এইরকম ভাব।

মা বলিলেন, আসুক আগে হতচ্ছাড়া মেয়ে! তুমি লক্ষ্মীমানিক, কেঁদো না। জামাইবাবু এসেছে, ঐ বৈঠকখানায় রয়েছে, কি মনে ভাববে—কাঁদতে নেই।

পান্নু চমকিয়া চুপ করিল।

তারপর মা কাজকর্ম করিতে লাগিলেন, পান্নু পিছনে পিছনে ঘুরিতে লাগিল এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিদির অপরাধের বিবরণ দিতে লাগিল। এক-একবার জিজ্ঞাসা করে, ও মা, শুনছিস?

কর্মব্যস্ত মা উত্তর করেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ—আসুক আগে আজ—

কিছু পরেই কমলা বাড়ি ঢুকিল। পান্নু তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। একবার মায়ের সামনে পড়িলে হয়! দিদি তো জানে না, কি নিদারুণ অস্ত্র ইতিমধ্যে তার জন্য শানাইয়া রাখা হইয়াছে! এক-একবার ভাবে, অত করিয়া নালিশ না করিলেও হইত। একটা থামের আড়ালে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইল, ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করিতে লাগিল।

মা ক্রুদ্ধভাবে চাপা গলায় তর্জন করিয়া উঠিলেন, সন্ধ্যে হয়ে যায়, ধিঙ্গি মেয়ের বাড়ির কথা মনে থাকে না। জামাই এসেছে—নিয়ে যাক এইবার চুলের মুঠি ধরে। এমন কথার অবাধ্য তুমি!

সন্ধ্যার আবছা আলোয় ভালো করিয়া ঠাহর হয় না—তবু পান্নালালের কেমন মনে হইল, গালাগালি খাইয়া দিদির মুখ-ভাব যেরূপ হইবার কথা, ঠিক তেমনটি হইল না।

মা পুনশ্চ বকিয়া উঠিলেন, হাত-পা কোলে করে দাঁড়িয়ে রইলে, গা-ধোয়া চুল-টুল বাঁধা হবে না? বাক্স খুলে ঢাকাই শাড়ি বের করে নাও।

বলিয়া ঝনাত করিয়া চাবির গোছা ফেলিয়া মা চলিয়া গেলেন।

পান্নু তো অবাক! শাস্তির পালা শেষ হইয়া গেল নাকি?

কমলা কহিল, চল্ পান্নু, খিড়কির পুকুরে একটু দাঁড়াবি।

পান্নু জোরে ঘাড় নাড়িল।

কমলা কাছে আসিয়া ভাইকে আদর করিয়া মান ভাঙাইয়া চুপিচুপি

কহিল, শুনলি তো, আমার চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবে—নিয়ে গেলে তখন তো আর বলব না! চল্ ভাই—

অতঃপর নিরাপত্তিতে পান্নু পিছে পিছে চলিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দিদি, জামাইবাবু বড্ড খারাপ লোক—না?

কমলা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, হ্যাঁ। মনে মনে ভাবিল, মিথ্যাও বড় নয়—সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া যে রকম রাগারাগি করে! বলিল, আমি চলে গেলে তুই বাঁচিস, না রে পান্নু?

পান্নু সে কথার জবাব না দিয়া বলিল, সত্যি কি জামাইবাবু তোর চুল ধরে টেনে নিয়ে যাবে?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যেন কত দুঃখে কত ভাবনায় কমলা কহিল, নিয়ে গেলেই বা করছি কি ভাই বল্? তুই তো ওদের সঙ্গে গায়ের জোরে পারবি নে—

পান্নুও ইহার উপর কিছু ভরসা দেখিতে পাইল না।

কমলা আপন মনে গা ধুইতেছে এবং আসন্ন রাত্রির জন্য মনে মনে মুশাবিদা করিতেছে, এমন সময় পিছনে আঘাটার দিকে ঝপ করিয়া কি পড়িল। তাকাইয়া দেখে, পান্নালাল কাপড় খুলিয়া রাখিয়া জলে নামিয়াছে এবং সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া কলমিদামের মধ্যে খুব উৎসাহের সহিত ছুটাছুটি লাগাইয়াছে।

ও কি হচ্ছে রে?

দিদি, মাছ…মাছ—উৎসাহের প্রাবল্যে সে ভালো করিয়া উত্তরই দিতে পারিল না। অনতিদূরে নলবনের দিকে জল ভাঙিয়া চলিতে লাগিল।

যাস নে পান্নু, ও দিকে সাপ থাকে। লক্ষ্মীসোনা, কথা শোন্—

কিন্তু কে কার কথা শোনে? অবশেষে কমলা গিয়া হাত ধরিয়া ফেলিল। উঠে আয় লক্ষ্মীছাড়া, উঠে আয় শিগগির—

বেগতিক দেখিয়া পান্নু দিল দিদির হাত কামড়াইয়া। তখন কান ধরিয়া পিঠে আর-একটা কিল দিয়া কমলা তাহাকে ডাঙায় তুলিয়া দিল। পান্নু ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখনই মনে পড়িল, বাড়িতে জামাইবাবু—কাঁদিতে নাই। পাড়ের উপর গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া সে বসিয়া রহিল।

গা ধোয়া সারিয়া কমলা হাত ধরিয়া টানিল। বাড়ি চল্—

বারুদে আগুন লাগার মতো পান্নু একেবারে ছিটকাইয়া উঠিল।

মুখপুড়ি, তুই মর—এক্ষুনি মর—বাড়ি গিয়ে আমি সব বলে দেব।

কমলা হাসিয়া কহিল, বলিস—খুব বলিস, আমার বয়ে গেছে। তুমি এতক্ষণ কিছু না বলে ছেড়েছ—তেমনি লক্ষ্মীধন কিনা ?

পানু বলিল, তোর চুলের মুঠো ধরে নিয়ে যাবে জামাইবাবু। খুব হবে—আমি মজা দেখব।

কিন্তু মনে মনে মায়ের বিচার-পদ্ধতির উপর পান্নালালের সত্যসত্যই অনাস্থা জন্মিয়া গিয়াছিল। এবারে দিদির সঙ্গে সে আর খিড়কিতে ঢুকিল না ; সোজা বৈঠকখানায় উঠিল। ঘরে আলো দিয়া গিয়াছে, নীরেন একাকী পড়িয়া পড়িয়া চুরুট টানিতেছিল।

এই যে ! এসো এসো বড়বাবু, এতক্ষণ দেখি নি—বলিতে বলিতে নীরেন উঠিয়া বসিল। বলিল, কান্না শুনছিলাম কার ?

কান্নার কথায় পানু খুব লজ্জিত হইল। নীরেনের প্রতি শ্রদ্ধাও হইল। জিমনাষ্টিক-করা দিব্য লম্বা-চওড়া গোঁফ-পাকানো প্রকাণ্ড চেহারা। হাঁ—নালিশ করিতে হয় তো এই লোকের কাছেই। নির্ঘাত শাস্তি।

পানু বলিল, জামাইবাবু, দিদি আমাকে মেরেছে—

বটে ? ভারি অন্যায় তো !

উৎসাহিত হইয়া পান্নালাল কহিল, দু দু-বার মেরেছে। আপনি ওকে আচ্ছা করে মেরে দেবেন।

নিশ্চয়ই, কোথায় তোমার দিদি ?

উপরের ঘরে আছে ঠিক—

নীরেন উঠিয়া দাঁড়াইল। এত বড় নালিশের পর বিচারকের পক্ষে অবহেলায় সময় কাটানো চলে না। কহিল, আর কে কে আছে সেখানে ?

কেউ নেই। মা রান্নাঘরে।

আচ্ছা—বলিয়া নীরেন বীরবিক্রমে অগ্রসর হইল। আয়োজন দেখিয়া পানুও একটু ঘাবড়াইয়া গেল। কিন্তু দু দু-বার মার খাইয়া প্রতিহিংসায় মন জ্বলিতেছিল, সে আর কিছু বলিল না। নীরেন বাহির হইয়া গেল।

কমলার প্রসাধন তখনও শেষ হয় নাই। পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া একটু ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নীরেন মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তারপর কহিল, এক শো মাইল দূর থেকে এলাম। ভদ্রলোককে একবার বসতেও বলছ না। খুব ভদ্রতা শিখেছ।

কমলার জবাব নাই, ঘোমটাও কমে না।

আমায় দেখে তোমার রাগ হয়েছে কমলা? আচ্ছা, এই যাচ্ছি চলে—বলিয়া চলিয়া যাইবার ভাব দেখাইতে কমলা কথা কহিল। মৃদুস্বরে কহিল, তাই বলেছি বুঝি আমি?

একটা কথা বলছ না, মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে—অবশ্য তোমাকে দোষ দিতে পারি নে—

নীরেনের কণ্ঠস্বর অতিশয় কাতর হইয়া উঠিল, বলিতে লাগিল, এতে আমি তোমাকে একবিন্দু দোষ দিই নে কমলা। মহাপাষণ্ড আমি—তাই ঐ রকম মর্মঘাতী চিঠি লিখতে পেরেছি। তুমি আমায় ক্ষমা করো—

বলিতে বলিতে—সে কথা জনসমাজে খুলিয়া বলা উচিত নয়, সেই মহাবলবান জিমনাষ্টিক-করা যুবক তার সাত ফুট লম্বা দেহ লইয়া একেবারে কমলার সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, রাগের মাথায় চিঠি ডাকে ফেলে দিয়ে তারপরেই বুকে যেন মুগুর মারতে লাগল। ভাবলাম, এ চিঠি পেয়ে অভিমানিনী আমার আত্মহত্যা করে বসবে। তাই কাউকে কিছু না বলে সকালের ট্রেনে ব্যাগ হাতে করে উঠে বসলাম।

হঠাৎ নীরেন এক টানে কমলার ঘোমটা খুলিয়া ফেলিল। তার সন্দেহ হইয়াছিল, কমলা কাঁদিতেছে বুঝি! ঘোমটা খুলিয়া দেখে হাসি মুখ। দেখিয়া তৃপ্তি পাইল। বলিল, আমার চিঠিটা পড়ে তোমার বড্ড কষ্ট হয়েছে—না?

কমলা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি লিখেছিলে তুমি?

জান তো আমার যত পাগলামি! তুমি চিঠি পড় নি?

না। পানু সে চিঠি হারিয়ে ফেলেছে।

বাঁচা গেছে—বলিয়া নীরেন সশব্দে একচোট হাসিতে যাইতেছিল। কমলা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া উঠিল, আঃ—আস্তে গো আস্তে! নিচে মা রয়েছেন যে!

হাসি সামলাইয়া নীরেন কহিল, তবে তো পানুবাবু খুব বাঁচিয়ে দিয়েছে। আর সেই পানুকে তুমি মেরেছ? শোনো—তোমার নামে মস্ত বড় নালিশ, দু দু-বার মেরেছ তুমি—

কমলা বলিল, ঐ চিঠি হারিয়েছে বলে একবার। আর একবার—

কথা শেষ করিতে না দিয়া নীরেন বলিয়া উঠিল, হারিয়েছে তো বেশ করেছে। সেইজন্য মারবে তুমি? পানু বলেছে, তোমায় খুব করে শাস্তি দিতে। কোনো কৈফিয়ত শুনছি নে আর—

যাও—

না। অত বড় উপকারী যে, তার কথা ফেলব আমি? শাস্তি আমি দেবই—কিছুতে ছাড়ব না। না-না-না—

বলিয়া প্রবল পরাক্রমে শাস্তি দিবার উপক্রম করিতেই পান্নালাল কোথা হইতে মাঝখানে কাঁদিয়া আসিয়া পড়িল।

ও জামাইবাবু, আমার দিদিকে তুমি মেরো না—আমি আর নালিশ করব না।

সন্ত্রস্তভাবে কমলাকে বলিতে লাগিল, শিগগির তুই পালিয়ে আয় দিদি। আমি আর কোনোদিন কাউকে কিছু বলব না—

স্বয়ংবরা

বিষম ফ্যাসাদ। দশ বিঘের চৌধুরি-বাগান উদ্বাস্তুরা দখল করে নিয়েছে। কোথাও কিছু নেই, রাত পোহালে দেখা গেল—পাকা দালানটার ভিতরে এক বুড়া বিভোর হয়ে নিদ্রা দিচ্ছেন, এদিকে ওদিকে পাঁচ-সাতটা নতুন চালা-ঘর, বাচ্চারা ট্যাঁ-ভ্যা করছে, তোলা-উনুনে আগুন দিয়েছে—ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী হয়ে, ঝিলের ঘাটে মেয়েরা বাসন মাজছে কাপড় কাচছে। যেন বাপ-পিতামহের সম্পত্তি—ইচ্ছামতো চিরকাল ভোগদখল করে আসছে এরা।

বিনয় খবরটা নিয়ে এলো। সে হল ম্যানেজার—হিসাব করলে চৌধুরিদের সঙ্গে কিছু আত্মীয়তাও বেরিয়ে পড়ে। রণজিৎ চৌধুরি কতকগুলো দলিল বাছাবাছি করছিলেন, ভারি ব্যস্ত। মুখ তুলে তিনি ভ্রূকুটি করলেন: পুলিন ছোঁড়াটা কি করে? সে তো কাছেই থাকে। এত কাণ্ড হচ্ছে, থানায় গিয়ে খবরটা দিতে পারল না?

বিনয় বলে, কী জানি স্যার। গোড়ায় আমাদেরও কিছু বলেন নি। উড়ো কথা শুনে আমিই জিজ্ঞাসা করে বের করলাম। পুলিনও ঐ বাঙাল দেশের মানুষ—

একটু হেসে বলে, মাইনে অল্প—এই সবেই ওদের রোজগার। কিছু পান-টান খেয়ে থাকবে, আবার কি!

রণজিৎ বলেন, যা করবার তুমি করো বিনয়। আমার সময় নেই। এখুনি ফের পাটনায় যাচ্ছি।

সকালবেলা তো এলেন—

কাগজপত্রগুলো নিতে। এমন অবস্থা, ছেলেমেয়েদের একটু চোখের দেখা দেখব তার সময় হল না। রন্টুর অসুখ করেছিল, নেবুতলায় গিয়ে দেখে এসো একবার। শাশুড়ি ঠাকরুনকে জিজ্ঞাসা করে যা যা দরকার, ব্যবস্থা কোরো। আর ইয়ে হয়েছে—মীরা-ধীরার কি কি বইয়ের দরকার ছোটবাবুকে বোলো, বইগুলো কিনে বোর্ডিং-এ যেন দিয়ে আসে।

দলিলপত্র ব্যাগে পুরে উঠে দাঁড়ালেন। দুটো নাকে-মুখে গুঁজেই স্টেশনে ছুটবেন। বললেন, তুমি নিজে কাল বাগানে চলে যাও, পুলিসের ভরসায় থেকো না। গোলমালে কাজ নেই, মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে-সুজিয়ে দেখগে। দু-পাঁচ টাকা নিয়েও যদি আপসে চলে যায়, সে-ই ভালো। কোলিয়ারি

নিয়ে ওদিকে গণ্ডগোল—সকল দিকে মামলা-মকদ্দমা বাধিয়ে সামাল দেব কি করে ?

অতএব পরের দিনই বিনয় বাগানে গিয়েছে। দালানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পাকা-চুল নাদুসনুদুস সেই বুড়া হাঁকডাক লাগালেন : আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক। আপনি তো ম্যানেজার বাবু—পুলিন তাই বলছিল, খোদ ম্যানেজার আসছেন আজকে। কি করছিস ওরে বীণা, মাদুর পেতে দিয়ে যা। ম্যানেজার বাবু পায়ের ধুলো দিয়েছেন, যাঁদের আশ্রয়ে আমরা এসে উঠেছি।

বীণা এসে রোয়াকের উপর মাদুর পেতে দিল। কুড়ি-বাইশ বছরের স্বাস্থ্যবতী মেয়ে—দুধে-আলতায় রঙ বলে থাকে, সে বুঝি এমনিই। নাক-মুখ-চোখ বিধাতাপুরুষ প্রতিমার মতো ধরে ধরে গড়েছেন। আহা রাজার ঘরে যাকে মানায়, সেই মেয়ে জঙ্গলপুরীতে এসে উঠেছে।

বিনয়ের কথা সরে না। মাদুর পেতে দিয়ে বীণা দালানের ভিতর ঢুকে গেছে, দৃষ্টি তবু দরজার দিকে। খানিক চুপচাপ থেকে শেষে বলে, বড়বাবু বড্ড চটেছেন।

কেন বাবা, চটবার কাজ কি করলাম ?

এই যে না বলে-কয়ে আপনারা বাগানে এসে উঠেছেন।

ঘরবাড়ি মান-ইজ্জত সমস্ত ছেড়ে এসেছি। একেবারে বিনি দোষে বাবা, কারো কাছে কোনো অন্যায় করি নি। বারো ঘাটের জল খেয়ে বেড়িয়েছি ঐ সোমত্ত মেয়ে নিয়ে। শেষটা একজন বলল, চৌধুরিদের বাগানে পাকা-দালান খালি পড়ে আছে। পাকা-দালানে দুয়োর এঁটে দিলে, আর যাই হোক, বেড়া কেটে ঘরে ঢোকার ভয়টা থাকে না। তা চলে যাব বাবা, মেয়ের বিয়ে যেদিন হয়ে যাবে তার পরের দিন দেখবে, বাগান তোমাদের খালি হয়ে গেছে। ঐ যত চালা দেখছ, সকলে আমার গাঁয়ের লোক—সবাই একসঙ্গে ফিরে যাব। ঘেন্না ধরে গেছে তোমাদের হিন্দুস্থানের উপর।

একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, ঘোরাঘুরি বিস্তর হয়েছে বাবা। সেই যে বলে থাকে বারো-উপোসি গেলেন তেরো-উপোসির বাড়ি—মানে, বারো দিন উপোস করে এক বাড়ি গিয়ে অতিথি হলাম, তারা দেখি তেরো দিন খায় নি—আমাদের ঠিক সেই বৃত্তান্ত। চলেই যেতাম অ্যাদ্দিন, এখানে তোমাদের জ্বালাতন করতে আসতাম না—তা ঐ গলার কাঁটা মেয়ে, কাঁটা না উগরে যাই কেমন করে ?

তারপর বিনয়কেই মধ্যস্থ মেনে বললেন : তুমি বলো না বাবা, মেয়ে নিয়ে ফিরে যাওয়া কি ঠিক হবে? ভালো পাত্তোর মেলে না পাকিস্তানে, প্রায়ই তো সব চলে এসেছে।

বিনয় সায় দেয়: তা সত্যি, ভালো পাত্তোর কোথায় পাকিস্তানে? বিয়েথাওয়া দিয়েই তবে যাবেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি। বড়বাবু, মনে হচ্ছে, এ মাসে আর ফিরছেন না। মাসের এই ক-টা দিনের মধ্যে শুভ কাজ চুকিয়ে ফেলুন। ফিরে এসে যদি বাগান বেদখল দেখতে পান, আমার চাকরি যাবে, আপনাদেরও আস্ত রাখবেন না তিনি।

বুড়া খপ করে বিনয়ের হাত জড়িয়ে ধরলেন : তাহলে একটা ভালো সম্বন্ধ জুটিয়ে দাও তাড়াতাড়ি। কিছুই করতে হবে না তোমাদের—কথা দিচ্ছি, আপসে বাগান খালি করে দিয়ে যাব। হাঙ্গামা-হুজ্জুতের মানুষ আমরা নই বাপু।

অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথাবার্তার পর চিন্তান্বিত বিনয় ফিরে চলল। দিন তিন-চার চলল এমনি। রণজিৎ ঠিক যেমনটা বলে গিয়েছেন—মিষ্টি কথায় বোঝাবুঝি হচ্ছে।

এরই মধ্যে বীণা একদিন পুলিনের বাসায় এসে পড়ল।

ও পুলিনদা, ম্যানেজার বিয়ে করতে চায় যে আমাকে। দেড় শ টাকা মাইনে পায়—ছ-মাসের মাইনে বাবাকে দিয়ে দিচ্ছে বিয়ের খরচপত্রের জন্য।

পুলিন বলে, ভালোই তো। করো না বিয়ে।

এলুম গেলুম হালুম-হলুম ওদের কথা। মাগো মা—কথা শুনে হেসে খুন হই, বিয়ে করব কি গো?

হি-হি করে হেসে নিল খুব এক চোট। সামলে নিয়ে অবশেষে বলে, এ কি বিপদ বাধালে তুমি ম্যানেজারটাকে লেলিয়ে দিয়ে!

পুলিন বলে, আমি কিছু জানি নে—আমার কি দায় পড়েছে বলো! বড়বাবু বলে গেছেন, সেইজন্যে আসা-যাওয়া করে। জবর-দখল কলোনি শুধু এই একটা হয় নি। এরা তড়পায়, ওরা তড়পায়; ফৌজদারি-দেওয়ানি রুজু হয়ে যায় আদালতে। এই চলে বছরের পর বছর। মালিকের লোক এসে ঝগড়াঝাটি করে—ভাব জমাতে আসে, বিয়ে করতে আসে, প্রথম এই দেখছি রে বাবা!

কাঁদো-কাঁদো হয়ে বীণা বলে, তাড়াও ওটাকে পুলিনদা। বাবাকে প্রায় পটিয়ে ফেলেছে।

পুলিন একটু ভেবে বলে, যেমন্ বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল হলে ঠিক জব্দ হবে। বড়বাবু নেই—ভালোই হয়েছে, ছোটবাবুকে লাগিয়ে দিচ্ছি।

কুস্তির আখড়ায় গিয়ে ইন্দ্রজিৎকে ধরল।

ছোটবাবু, বড়বাবু বাইরে। আপনিই তো আমাদের মাথা এখন।

ইন্দ্রজিৎ বড় খুশি। লোকজন কেউ ডেকে জিজ্ঞাসা করে না ; বাড়ির পোষা বিড়ালটার যা খাতির, তার সেটুকু নয়। এর জন্য সে মরমে মরে থাকে। দাদা অত্যন্ত রাশভারি, তিনি হাজির থাকতে বলাও চলে না কিছু।

ল্যাঙট-পরা, খালি গা, সর্বাঙ্গে ধুলোমাটি। গায়ে দুটো থাবড়া মেরে ধুলো ঝেড়ে কতক পরিমাণ ভদ্র হয়ে সে বলে, কি হয়েছে ?

পুলিন একটু ভূমিকা করে নেয় : ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে ছোটবাবু। আমি বিল-সরকার, বিনয়বাবু হলেন ম্যানেজার—আমাদের উপরওয়ালা। কিন্তু মুখ দেখানোর উপায় রাখছেন না আর উনি। আপনি অবধি তাই আসতে হল।

অধীর কণ্ঠে ইন্দ্রজিৎ বলে, কি করেছে বিনয় বলো—

করেন নি এখনো। বাগানে উদ্বাস্তুরা এসে উঠেছে, বড়বাবু তাড়িয়ে দিতে বলে গেছেন—তা ম্যানেজার বাবু উলটে বিয়ে করে ফেলছেন তাদেরই একটা মেয়ে।

ঘুস খাচ্ছে। টাকা-পয়সা কোথায় পাবে উদ্বাস্তুরা, তাই মেয়ে ঘুস দিচ্ছে। ঘুস নিয়ে সমস্ত চাপা দিয়ে দেবে, সেইটে ভেবেছে বুঝি বিনয় ?

পালোয়ান মানুষ, গৌরচন্দ্রিকার ধার ধারে না, লহমার মধ্যে বিচার। বৈঠকখানায় ঢুকে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, বিনয় কোথায় ? এদিকে শুনে যাও বিনয়।

পুলিন পিছুপিছু আসছিল ; এক ছুটে আড়ালে গিয়ে কান পাতে।

ইন্দ্রজিৎ বলে, বিয়ে করছ না কি তুমি ?

সহজ দ্বিধাহীন কণ্ঠে বিনয় বলে, হ্যাঁ—

উদ্বাস্তুদের এক মেয়ে ?

উদ্বাস্তু-সমিতির সভাপতি অশ্বিনী ধর মশায়ের মেয়ে।

ইন্দ্রজিৎ বলে, তুমি শুধুমাত্র কর্মচারী নও—আত্মীয়-সম্পর্ক আছে তোমার সঙ্গে। অজানা অচেনা যাকে তাকে বিয়ে করে আনলেই হল ! বিয়ের পুলক হয়েছে, তা মেয়ের কিছু অভাব আছে ? কত গণ্ডা চাই মেয়ে ?

বিনয় মৃদুকণ্ঠে বলে, বাজে লোক নন অশ্বিনীবাবু। সদ্বংশ, আমাদেরই স্বজাতি। পাকিস্তানে ঘরবাড়ি বিষয়সম্পত্তি পশারপ্রতিপত্তি সমস্ত ছিল।

তবু হবে না বিয়ে। আমাদের বুকের উপর চেপে বসে দাড়ি ছিঁড়বার তালে আছে, তাদেরই সঙ্গে ভাব-সাব তোমার। কক্ষনো এসব হতে পারবে না।

এবার একটু চটে গিয়ে বিনয় বলে, ভাব করতে হয়েছে বড়বাবুর হুকুমে। বড়বাবু বলে গেলেন, মামলা-মকদ্দমা না হয়—মিষ্টি কথায় সরিয়ে দিয়ে এসো। নয় তো আমি কোন দিন গিয়ে থাকি আপনাদের বাগানের দিকে ?

তাই বলে দাদা বিয়ে করতে বলেছেন ?

নইলে কিছুতে ওঁরা সরবেন না। অশ্বিনীবাবু বলেছেন যে দিন মেয়ের বিয়ে হবে তার পরের দিনই পাকিস্তানে দলসুদ্ধ ফেরত যাবেন। সেখানে সব আছে, ভালো বরপাত্তোরের অভাব শুধু। কাজকর্ম ছেড়ে আমি এখন কোথায় পাত্তোর খুঁজে বেড়াব বলুন।

ইন্দ্রজিৎ বলে, পাত্তোর খুঁজতে হবে না তোমায় ; পাত্তোর হয়ে বরাসনেও বসতে হবে না। কক্ষনো আর ওমুখো হবে না—এই শেষ কথা বলে দিলাম। আর আমায় তো জানো ভালো করে। আমি ভার নিচ্ছি, যা করতে হয় আমিই সব করব। টুঁটি ধরে ধরে ঐ ক-টাকে রেল-রাস্তার ওপারে ছুঁড়ে দিয়ে আসব। তেড়ে গিয়ে মামলা করবার তাগত থাকবে না—হাসপাতালে যেতে হবে।

আড়াল থেকে শুনে পুলিন প্রমাদ গণে ! এ যে এক বিষম কাণ্ড বিনয়কে তাড়াতে গিয়ে। কাঁচাখেগো দেবতা খেপে উঠেছে, একে সামলাবার উপায় কি ?

জীপ হাঁকিয়ে ইন্দ্রজিৎ বাগানে গিয়ে পড়ল। একা নয়, সঙ্গে বাছা-বাছা চারটি সাকরেদ। আরও সবাইকে বলে এসেছে, আখড়ায় হাজির থেকো, খবর হলে গিয়ে পড়বে।

রশিখানেক দূর থেকেই হাঁক পাড়ছে, অশ্বিনী ধর কোথায় ?

তড়াক করে লাফিয়ে নামল জীপ থেকে। বুড়া অশ্বিনী ছুটে এসে হাত-জোড় করে দাঁড়ান : আসতে আজ্ঞা হোক ছোটবাবু। আপনার পায়ের ধুলো পড়বে—বীণা তাই বলছিল। ওরে বীণা, চেয়ার বের করে দে রোয়াকের উপর। প্যাণ্টলুন-পরা ছোটবাবু মাদুরে বসতে পারবেন না।

ইন্দ্রজিৎ গর্জন করে ওঠে, বসবার জন্য আসি নি। মান থাকতে থাকতে আপসে চলে যাবেন কি না, জানতে চাই। না যান তো ওষুধ আছে। সে-ওষুধ কিছু সঙ্গে আছে, কিছু বাড়ি রেখে এসেছি।

বলে জীপের সঙ্গীগুলোকে সে আঙুল দিয়ে দেখাল।

সে কি কথা! আপসে নয় তো কি হাঙ্গামা করব? তেমন বাপের বেটা নই। সাত পুরুষের হকের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে এলাম—আর এখানে কোন স্বত্ব আছে, কিসের বলে লড়ালড়ি করতে যাব?

বলতে বলতে অশ্বিনীর গলাটা ভিজে আসে। একবার গলা খাঁকারি দিয়ে মেয়েকে ডেকে বললেন, ওরে বীণা, পাঁচ কাপ চা করে দে বাবুদের। অত কাপ না থাকে, হরিদাসের বাড়ি থেকে নিয়ে আয়।

হাতল-ভাঙা কাঠের চেয়ারটা রোয়াকে দিয়ে বীণা উঠান পার হয়ে হরিদাসের বাড়ির দিকে বেরিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে ছিল ইন্দ্রজিৎ, বসে পড়ল ঐ চেয়ারে।

কবে চলে যাচ্ছেন, ঠিক করে বলে দিন। পাকা কথা শুনে যাব।

অশ্বিনী বলেন, ঐ যে চলে গেল—আমার মেয়ে। মেয়েটার বিয়ে দিয়ে তার পরে একদিনও আর থাকব না। সোমত্ত মেয়ে কাঁধে নিয়ে ফিরে যাই কেমন করে বলুন।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ইন্দ্রজিৎ প্রণিধান করল যেন কথাটা। বলে, আসছে ভালো সম্বন্ধ কিছু?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এসেছে একটা। আপনাদের ম্যানেজার বিনয়। অত্যন্ত সৎ ছেলে, বি. এ পাশ—

ইন্দ্রজিৎ খিঁচিয়ে ওঠে, বি. এ. পাশ বলে কপালে শিং উঠেছে নাকি? কর্পোরেশনে ঝাড়ুদার চেয়েছিল—এক-শ বি. এ.-র দরখাস্ত পড়ে গেল সেই চাকরির জন্য।

অশ্বিনী বলেন, কিন্তু বিনয়ের তো ভালো চাকরি। দেড় শ টাকা করে দিচ্ছেন আপনারা। বলছে, আরও ঢের উন্নতি হবে।

দেড় শ কি কত ঠিক বলতে পারি নে। দাদা জানেন। হলই বা দেড় শ—একটা লোকেরই চলে না ও-টাকায়। এই ধরুন, তিরিশ দিনে সের ত্রিশেক মাংস—তাতেই লেগে গেল নব্বুই। কত বাকি থাকে হিসেব করুন এবার। দেড় শ টাকায় বিয়ে করবার শখ হয় আবার মানুষের!

অশ্বিনী চমক খেয়ে বললেন, সর্বনাশ, অত শত ভেবে দেখি নি তো! উদ্বাস্তু মানুষ, এখানকার হিসেবপত্তোর মাথায় ঢোকে না ছোটবাবু। মেয়েটা তো দেখলেন, নিজের মেয়ের সম্বন্ধে জাঁক করে কিছু বলব না—

কথাবার্তার মধ্যে বীণা চা নিয়ে এসেছে। অশ্বিনী তার পিঠের উপর হাত রেখে বললেন, দাঁড়িয়ে যা একটুখানি মা। এই দেখুন মেয়ে। রাজার ঘরে মানায় কিনা, বলুন আপনারা। আপনি বড্ড ভয় ধরিয়ে দিলেন ছোটবাবু। এই সোনার পদ্ম না খেয়ে মারা যাবে যার তার হাতে পড়ে?

বীণা মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথাবার্তা হল। রাত্রি পহরখানেক হতে অবশেষে ইন্দ্রজিৎ দাঁড়াল উঠে। অশ্বিনী আবার বলেন, কি করব ছোটবাবু, আমি যে নিরুপায়। জেনেশুনেও হয়তো শেষ পর্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কাজ করতে হবে। ঐ ছাড়া অন্য সম্বন্ধ তো দেখি নে। আপনারাও বাগান ছেড়ে চলে যাবার জন্য তাড়া দিচ্ছেন।

ইন্দ্রজিৎ বলে, তার চেয়ে মেয়েটাকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েই চলে যান না। তাড়া দিচ্ছি বলেই যে ছুটে পালাতে হবে তার কোনো মানে আছে? আচ্ছা, দেখি আমি একটু ভেবেচিন্তে—ভালো পাত্তোর কেউ মনে আসে কি না।

ভাবনাচিন্তা ইন্দ্রজিৎ অনেক করেছে, চিন্তার চোটে সে রাত্রি ঘুমুতে পারল না। ভোরে উঠে ডনবৈঠক করে, সে সব আজ বাদ পড়ে গেল। জীপের পরোয়া করে নি—খানিক পথ বাসে চড়ে খানিকটা পায়ে হেঁটে বাগানে এসে উপস্থিত। চোখ মুছতে মুছতে অশ্বিনী ধর বেরিয়ে এলেন।

আমি ভেবেচিন্তে দেখলাম ধর মশায়—

বীণা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, এটা কি হল পুলিনদা? চোর তাড়িয়ে ডাকাত পত্তন, বিড়াল তাড়িয়ে বাঘ? ছোটবাবুর সবুর মানছে না—বলে, মাসের এই ক-টা দিনের মধ্যেই বিয়ে দিতে হবে।

পুলিন বলে, কত বড়লোক, জান? গোটা সাতেক কোলিয়ারি, কলকাতায় বাড়ি চারখানা। এই বাগান-বাড়ির মালিক দু-ভাই ওঁরা। বাগানটা বড্ড পছন্দ তোমার—তা বিয়ে হয়ে গেলে তুমিই আট আনা হিস্যার মালিক হয়ে বসবে।

বীণা বলে, রক্ষে করো। বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল—যেন ষাঁড় চেঁচাচ্ছে, বুকের মধ্যে গুরগুর করছিল আমার। বিয়ে করে ভালোবাসার কথা

বলবে, তোমরা ছুটে এসে পড়বে, দাঙ্গা বেধে গেছে বুঝি! ভালোবেসে একখানা হাত যদি ধরে তো গেছি আমি, মটমট করে হাড় চুরমার হয়ে যাবে।

পুলিন বিব্রত ভাবে বলল, এ তো ভারি ফ্যাসাদ। বর পছন্দ হয় না কিছুতে তোমার। ভাবিয়ে তুললে।

বীণা বলে, বিদেয় করো—কায়দা বের করো একটা কিছু। আবার তা-ও ভাবছি, এ তোমার রোগা-পটকা বিনয়বাবু নয়। রেগে গিয়ে ঘুসি-টুসি যদি ছাড়ে, তোমার তো নিশানা পাওয়া যাবে না পুলিনদা।

পুলিন ভেবে বলে, ছুনিয়ার মধ্যে এক বড়বাবু আছেন, তিনিই শুধু ও-লোককে সামলাতে পারেন। এদিকে এত প্রতাপ দেখতে পাও, কিন্তু বড় বাবুর সামনে যেন জোঁকের মুখে মুন পড়ে যায়। বড়বাবু এ মাসটা পাটনায় থাকবেন কিনা, এই ফাঁকে তাই বিয়ের কাজ চুকিয়ে ফেলতে চাচ্ছে। একবার হয়ে গেলে তার পরে আর রদ হবে না তো!

চৌধুরি-বাড়ি গিয়ে পুলিন চুপিচুপি বিনয়কে খবরটা দিল: ছোটবাবুর যে বিয়ে! বাগানবাড়ি ধুমধাড়াক্কা পড়ে গেছে। বড়বাবুকে জানানো উচিত। নয়তো তিনি ছুঃখ করবেন, আমাদের উপরে দোষ পড়বে। ভাই না হয় লজ্জায় লিখতে পারে নি, তোমরা সব ছিলে কি করতে?

বিনয়েরও ঠিক সেই মত। পাটনায় চিঠি চলে গেল। রণজিতের মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে যেন। চিঠি হাতে নিশ্চল হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এই কখনো হতে পারে? একটিমাত্র ভাই—কত সাধবাসনা তাকে নিয়ে! বিয়ের নামে বরাবর তেরিয়া হয়ে ওঠে। হঠাৎ এমন সুমতিই যদি হয়ে থাকে, কত ভালো ভালো সম্বন্ধ রয়েছে—উদ্বাস্তুর জামাই হতে যাবে কোন ছুঃখে?

মামলায় শনিবারের দিনটা সাবকাশ মিলল বিস্তর কষ্টে। রবিবার তো এমনই ছুটি। রণজিৎ চৌধুরি কলকাতা ছুটলেন। বাড়িতে পা দিয়েই ভাইকে ডেকে পাঠালেন।

বিয়ে হচ্ছে, শুনতে পেলাম?

মেজেয় দৃষ্টি নামিয়ে অস্পষ্ট গলায় ইন্দ্রজিৎ বলে, আজ্ঞে—

আমার ভাইয়ের বিয়ের আমি কিছু জানতে পারি না—এ বিয়ের মাতব্বরটা কে জিজ্ঞাসা করি?

ইন্দ্রজিৎ চুপ করে থাকে।

নাম বলো, কে ঘটকালি করছে? পাটনায় নতুন এই জুতোজোড়া কিনেছি —জুতো ছিঁড়ব তার পিঠে। বলো।

ইন্দ্রজিৎ বলে, ঘটক এর মধ্যে নেই দাদা। দলবল নিয়ে বাগানে গেলাম ওঁদের উচ্ছেদ করে আসব বলে—

তার বদলে বিয়ের ঠিকঠাক করে এলে?

কি করব? কন্যাদায়ে অস্থির হয়ে পড়েছেন, বড্ড ধরাধরি করতে লাগলেন অশ্বিনী ধর মশায়—

আরও লোক রয়েছে, তারাও ধরাধরি করছে—আজ নয়, দু-বছর ধরে। ঝামাপুকুরের দে-সরকাররা—শুধু হাতের ধরাধরি নয়, এক শ ভরি সোনা এক সেট জড়োয়া নগদ রূপেয়া আট হাজার—

ইন্দ্রজিৎ মরীয়া হয়ে বলে, আমি কথা দিয়ে ফেলেছি। দিনক্ষণও এক রকম স্থির।

রণজিৎ বলেন, কথা আমারও দেওয়া। ঝামাপুকুরদের বলা আছে, ভাই যদি কখনো বিয়েয় মত দেয় ওখানেই হবে।

ইন্দ্রজিৎ নিঃশব্দে হাতের গুলি দেখছে। রণজিৎ আরো উত্তেজিত হলেন।

জবাব দিতে হবে তোমায়। দুই জনে আমরা কথা দিয়ে বসে আছি—কার কথা থাকবে? তোমার না তোমার বড় ভাইয়ের? কে সংসারের কর্তা? বিয়ের কথাবার্তা বলবার কার এক্তিয়ার?

আজ্ঞে, আপনার—

তা হলে আমার হুকুম রইল, বাগানমুখো কদাপি আর যাবে না। আমি বুঝব ঐ অশ্বিনী ধরের সঙ্গে। শয়তান লোক, নিজে তো বাগানবাড়ি চেপে বসেছে—আবার মেয়ে ঠেলে দিচ্ছে, সেই মেয়ে আমার বসতবাড়িতে বউ হয়ে চাপবে। ভেবেছিলাম মিঠে কথাবার্তায় সরিয়ে দেব। তা এত যখন চালাকি, নিজ-মূর্তি তবে ধরতে হল। আমার একটা মুখের কথা পেলে থানাসুদ্ধ হামলা দিয়ে পড়বে। হোক তবে তাই।

পুলিন লুকিয়ে শুনে গেল। শুষ্ক মুখে অশ্বিনীর কাছে গিয়ে বলে, বড়বাবু আসছেন পুলিস সঙ্গে করে। থানায় ওঁর বড্ড খাতির। এস্পার-ওস্পার করে তবে যাবেন।

অশ্বিনী ভয় পান না, কলরব করে উঠলেন : খোদ রণজিৎ চৌধুরি আসছেন

—বল কি হে পুলিন! রোয়াকের উপর তবে তো একটা চৌকি পেতে রাখতে হয়। এসো, ধরাধরি করে নিয়ে আসি ঘরের ভিতর থেকে। এক টাকার সন্দেশ কিনে আনতে হবে। আর একটা গড়গড়া কোথায় পাই, বলো দিকি?

আগে-পিছে কনেস্টবল ও কয়েকটা পশ্চিমা দরোয়ান নিয়ে দুড়দাড় করে রণজিৎ বাগানে ঢুকলেন। অশ্বিনী গেট অবধি এগিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আসুন বড়বাবু। ঘরবাড়ি ছেড়ে আপনার আশ্রয়ে কোনো গতিকে বেঁচে আছি—এতদিনে তবু যা হোক একবার পদধূলি পড়ল।

পোকামাকড়ের দিকে যেমন তাকায়, রণজিৎ তেমনি দৃষ্টিতে এক নজর দেখলেন। কানেই গেল না যেন কোনো কথা। দারোয়ানদের দিকে চেয়ে হেঁকে উঠলেন, হাঁড়িকুড়ি কাঁথা-মাদুর ছুঁড়ে ফেলে দেবে, উনুন ভাঙবে, মানুষ একটা একটা করে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে গেট পার করে দেবে।

অশ্বিনী বলেন, ঘাড় ধরতে দিলাম আর কি!

রণজিৎ হুঙ্কার দিলেন, দেবেন না? জোরজার করবেন? কার কত জোর দেখা যাক।

অশ্বিনী হেসে উঠে বলেন, এই দেখুন, তাই বুঝি বলছি? পালিয়ে যাব ঘাড় ধরবার আগে। ঐ কাজটা খুব রপ্ত হয়ে গেছে বড়বাবু এই ক-বছরে। বোঁচকাবিড়ে কাঁধে নিয়ে ছেলেপুলের হাত ধরে এখান থেকে তাড়া খেলাম তো ওখানে পালাই। ওখানে তাড়া খেলাম তো আবার অন্য দিকে।

হা-হা করে হাসতে লাগলেন বুড়া মানুষ। কথাবার্তা হতে হতে দালানের সামনে এসে গেছেন। চৌকির উপরে সতরঞ্চি-তোশক-তাকিয়ায় দিব্যি ফরাস পাতা। সেই দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে অশ্বিনী বলেন, বসতে আজ্ঞা হোক বড়বাবু।

রণজিৎ ঘাড় নাড়লেন: বসতে আসি নি গদিয়ান হয়ে। গোলমাল না করতে চান তো এক্ষুনি আমাদের চোখের সামনে চলে যেতে হবে। এই মুহূর্তে। আজ নয় কাল, ওসব শোনাশুনি নেই।

অশ্বিনী কাতর হয়ে বলেন, তা বসে বসেই হোক না কথা। যেমন হুকুম করবেন, ঠিক তাই হবে। বলেন তো এক্ষুনি যাব। ওরে বীণা, কলকেটায় আগুন দিয়ে যা। আর চা-টা কি আছে তোদের, নিয়ে আয়।

এত কথার পরে ফরাসে একটু অঙ্গ না ঠেকিয়ে পারা যায় না। বসতে বসতে রণজিৎ বললেন, চা লাগবে না। যে কাজে এসেছি এখানে—

কিন্তু বলছেন কাকে? দুটো মাদুর হাতে নিয়ে অশ্বিনী ইতিমধ্যে দারোয়ান-কনেস্টবলদের দিকে নেমে গেছেন। আমতলায় মাদুর বিছিয়ে দিয়ে বলছেন, একটু বসতে দেব বাবাসকল, বাড়ির মধ্যে সে জায়গা নেই। তোমাদের বড্ড কষ্ট হয়েছে, ছায়ায় বসে জিরিয়ে নাও।

ফতুয়ার পকেট থেকে বিড়ির বাণ্ডিল বের করে দিলেন। বলেন, বোসো বাবারা। চা দিয়ে যাচ্ছে। বড়বাবু ব্যস্ত হচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাগুলো সেরে ফেলি ওদিকে।

ফুঁ দিতে দিতে বীণা গড়গড়ার মাথায় কলকে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। ফরসা মুখ আগুনের আভায় গোলাপি দেখাচ্ছে। অশ্বিনী ফিরে এসে গরুড়পক্ষীর মতন উবু হয়ে নিচে বসতে যাচ্ছেন—ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রণজিৎ মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, নিচে কেন, ফরাসের উপর উঠে বসুন।

জিভ কেটে অশ্বিনী বলেন, সে কি কথা, আপনার সঙ্গে একাসনে বসতে পারি?

কেন পারবেন না? আপনি মানুষ নন? নিজেকে অত ছোট ভাবেন কি জন্য?

এর পরে অশ্বিনী আর নিচে না বসে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়ালেন।

রণজিৎ বলেন, ঐ মেয়ে আপনার? মেয়ের বিয়ে না দিয়ে যাবেন না এখান থেকে?

জোর করে বলবার তো উপায় নেই হুজুর। আপনার জায়গা-জমি—আপনি যদি সদয় হয়ে আরও ক-টা দিন মঞ্জুর করেন।

সম্বন্ধ এলো কিছু?

ছোটবাবুই বলছিলেন যে—

রণজিৎ রায় দিলেন, হবে না। ছোটবাবুর গার্জেন আমি। ঝামাপুকুরে কথা দিয়ে বসে আছি।

অশ্বিনী বলেন, তার আগে আপনার ম্যানেজার বিনয়বাবুর সঙ্গে এক রকম ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল।

হবে না। বিনয়ের মনিব আমি। ছত্রিশগড়ে নতুন কোলিয়ারি কিনছি, সেইখানে ওকে পাঠাব। এ সময়টা বিয়ের তালে গেলে ওর চাকরি থাকবে না।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে রণজিৎ প্রশ্ন করেন, আর কোথাও?

আজ্ঞে না। আর তো দেখছি নে আপাতত।

রণজিৎ গম্ভীর ভাবে আরও কিছুক্ষণ গড়গড়ার ধোঁয়া ছাড়লেন।

মেয়েটি কেমন?

নিজের মেয়ের সম্বন্ধে কি বলব, ঐ তো চোখেই দেখলেন হুজুর।

চোখে দেখার ব্যাপার নয়। বলি, রীত-প্রকৃতি কেমন? হিংস্থটে-কুচুটে নয় তো? ঝগড়া করবে না? নাকে কাঁদবে না কথায় কথায়?

অশ্বিনী গড়গড় করে এক রাশ পরিচয় দিতে যাচ্ছিলেন। রণজিৎ তাড়া দিয়ে উঠলেন, হাঁ কিংবা না বলুন। অত শোনবার সময় নেই।

আজ্ঞে না, ওসব কিছুই করবে না।

রণজিৎ বলেন, শুনুন, দশ বছর আমার গৃহ শূন্য। বিয়ে করি নি বিমাতা এসে ছেলেমেয়েদের কষ্ট দেবে বলে। এখন তারা বড় হয়ে উঠেছে। কোলের ছেলে রেখে স্ত্রী মারা যায়, নেবুতলায় আমার শাশুড়ির কাছে সেই ছেলে মানুষ হচ্ছে। মেয়ে দুটো বোর্ডিং-এ থেকে পড়ে—বড়টির থার্ড ইয়ার, ছোটটি আই. এসসি দিচ্ছে এবারে। তাই ভাবছি, আপনার মেয়ের রীত-প্রকৃতি সত্যি সত্যি যদি ভালো হয়—এখন বিয়ে করলে বোধ হয় দোষের হবে না।

অশ্বিনী গদগদ হয়ে উঠলেন : পরম সৌভাগ্য আমার বীণার।

বলতে পারেন যে বয়স হয়েছে—

আরে সর্বনাশ, কার ঘাড়ে ক-টা মাথা যে আপনার বয়সের কথা বলতে যাবে?

রণজিৎ মৃদু হেসে বলেন, অবিশ্যি চেহারা দেখে কেউ তা বলবে না। খাড়া হয়ে পথ চলি, একটা দাঁত পড়ে নি, চুল নেই—কাজেই পাকা চুলের কথা ওঠে না। তবু বয়সের কথাটা ভাবতে হবে বই কি। যদি মরে যাই—একটা বাড়ি তাই আপনার মেয়েকে দানপত্র করে দেব। বিয়ের এক মাসের মধ্যেই।

উঃ, বিবেচনা কত দূর! স্ত্রীর ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে। সাধে কি আপনি দেশবিখ্যাত হয়েছেন বড়বাবু!

উচ্ছ্বাস থামিয়ে দিয়ে রণজিৎ বলেন, রসুন, আরো আছে। বিয়ে কিন্তু কালই দিতে হবে। তড়িঘড়ি কাজ আমার।

অশ্বিনী অবাক হয়ে বলেন, শুভকর্মে দিনক্ষণ লাগে। পাঁজিতে যদি দিন না থাকে—

গোধূলি-লগ্নে হবে। গোধূলিতে হলে দিন লাগে না। পরশু সোমবার পাটনা হাইকোর্টে মকদ্দমা। মন্তোর ক-টা পড়েই স্টেশনে ছুটব। ছোট ভাই, ম্যানেজার সবাই তো দেখছি ঘোরাঘুরি করে গেছে। পাটনায় চলে গেলে আবার তারা পাকচক্কোর না মারে সেটা একেবারে শেষ করে রেখে যেতে চাই।

তবু অশ্বিনী ইতস্তত করেন: একটা দিনের মধ্যে যোগাড়যন্তোর হয়ে উঠবে কি? বিয়েথাওয়ার ব্যাপার, বুঝতে পারছেন।

টাকা থাকলে কলকাতা শহরে এক ঘণ্টায় বাঘের দুধের যোগাড় হয়ে যায় মশায়। সেই টাকাই পাবেন। সকালবেলা দু-হাজার টাকা নিয়ে আসব, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমি যোগাড়যন্তোর করব। বরযাত্রীর হাঙ্গামা নেই, আপনারা বাগানের এই কয়েক ঘর মানুষ। দু শ আড়াই শ র মধ্যে এদিক-কার সব মিটে যাবে। বাকি টাকা আপনার। আর শ্বশুর হয়ে গেলে তখন উদ্বাস্তু রইলেন না—কুটুম্ব হলেন। কাজেই এই বাগানে থেকে যেতে পারবেন। তাহলে আর আপত্তি নেই, কেমন?

খুশিতে ডগমগ হয়ে অশ্বিনী বলেন, আজ্ঞে না—

রণজিৎ চটে উঠলেন: জামাইকে কেউ আজ্ঞে বলে না। বলুন—না, বাবাজি।

থতমত খেয়ে অশ্বিনী বলেন, সে তো বটেই। কিন্তু এত বড় লোক আপনি—এক দিনে হবে না, সইয়ে নিতে হবে। কন্যা-সম্প্রদানের পর মুখ দিয়ে বাবাজি বেরুবে।

এই যে কথাবার্তা হয়ে গেল, ঘুণাক্ষরে কারো কানে না যায়। ভাই বলুন, ম্যানেজার বলুন, কাউকে নয়। পুলিন কাছাকাছি থাকে, তাকে হয়তো পারা যাবে না—কিন্তু আগে-ভাগে বরের নাম চাউর করে বসবেন না। শুভ কাজে বাগড়া অনেক। কাজ চুকে গেলে ঢাক পিটিয়ে বেড়াবেন। তখন আর পরোয়া নেই।

যে আজ্ঞে—বলে অশ্বিনী ঘাড় নোয়ালেন।

কিন্তু একজন তো সঙ্গে সঙ্গেই শুনে ফেলল দালানের ভিতর থেকে। পুলিনের বাসায় গিয়ে মুখ অন্ধকার করে বীণা বলে, ও পুলিনদা, সর্বনাশ হয়ে গেল। কাল আমার বিয়ে।

ভালোই তো! ধর মশায়ের দায় উদ্ধার হল। শেষ পর্যন্ত বর কে দাঁড়াল শুনি? ইন্দ্রজিৎ না বিনয়?

ওরা কেউ নয়। তোমাদের বড়বাবু। রণজিৎ চৌধুরি।

পুলিন অবাক হয়ে যায়: বল কি গো? দশ বছর বউঠাকরুন গত হয়েছেন। এই দশ বছর মাসে গড়পড়তা একটা করে ধরলেও বারো দশকে এক শ কুড়িটা সম্বন্ধ এসেছে। কাউকে আমল না দিয়ে বড়বাবু অ্যাদ্দিন তবে তোমারই-জন্যে বসে ছিলেন। কপাল বটে তোমার বীণাপাণি!

হি-হি করে হাসতে লাগল। বীণা তাড়া দিয়ে ওঠে, দাঁত বের করে হেসো না অমন। গা জ্বালা করে। এখন কি করবে, সেইটে ভাবো। ঠেকাও বড়বাবুকে।

পুলিন হতাশ হয়ে বলে, কী মুশকিল! ম্যানেজার ঠেকালাম ছোটবাবুকে দিয়ে, ছোটবাবু ঠেকালাম বড়বাবুকে দিয়ে। বড়বাবুর উপরে আর নেই। এ বরও পছন্দ নয় তোমার? রাজার ঐশ্বর্য, দেশময় নামডাক—

মুখ বাঁকিয়ে তেমনি স্বরে বীণা বলে, মাথাজোড়া টাক। কনে-পিঁড়িতে কিছুতে বসব না, এই বলে দিলাম। তার আগে ঝিলের জলে ঝাঁপিয়ে মরব।

বলে ফরফর করে বীণা চলে গেল। গতিক দেখে পুলিন চিন্তিত হয়েছে। বিশেষ করে ঝিলের ভয় ঐ যে দেখিয়ে গেল।

পরের দিন সকাল সকাল সে চৌধুরি-বাড়ি গেছে। বিনয়ের কাছে গিয়ে বলে, একটা কথা ম্যানেজার বাবু। বড়বাবু ছোটবাবু ছুজনেই আমাদের মনিব—উভয়ের নুন খাই। ঠিক কিনা বলুন।

বিনয় খবরের কাগজ পড়ছিল। অন্যমনস্ক ভাবে বলল, হুঁ—

ছোটবাবুর বিয়ের কথা যেমন বড়বাবুকে জানিয়েছিলাম, বড়বাবুর বিয়েও তেমনি ছোটবাবুকে বলতে হয়। নয় তো বলবেন, একচোখো কর্মচারী।

কাগজ ফেলে দিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিনয় বলে, বড়বাবুর বিয়ে হচ্ছে নাকি? কোথায় হচ্ছে? কবে?

বৃত্তান্ত শুনে বিনয় নিশ্বাস ফেলল: আমাদের সময়ে কুল-শীল গাঁইগোত্তোর গোল্লায় যাচ্ছিল। দেবতার বেলায় লীলাখেলা, পাপ লিখল মানষের বেলা। ওঁরা দেবতাগোঁসাই, ওঁদের কিছুতে দোষ নেই। কিন্তু এমন আনন্দের ব্যাপার কাকপক্ষীকে জানতে দিচ্ছেন না। আমরা না হয় বাইরের লোক, গোলাম-নফর—নিতান্ত আপন যাঁরা, তাঁদের মনের অবস্থা কি হবে?

বিনয় সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। কুস্তির আখড়ায় গিয়ে ইন্দ্রজিৎকে এক

পাশে ডেকে বলে, বড়বাবুর বিয়ে আজকেই—গোধূলি লগ্নে। কিন্তু ধরে নিন, কেউ আমরা কিচ্ছু জানি নে। এ খবর মুখাগ্রে যদি আনেন, ঘাড়ের উপর আমার মুণ্ডু থাকবে না।

ইন্দ্রজিৎ একটুখানি ভেবে নিয়ে অভয় দিল: আমায় পর্যন্ত বলেন নি দাদা। —আমি নিজেই যখন জানি নে, কাকে কি বলতে যাব? নিশ্চিন্ত থাকো ম্যানেজার।

সেখান থেকে বিনয় নেবুতলা ছুটল। রণজিতের শাশুড়ি জাহ্নবী দেবী—এটা-সেটা নিয়ে প্রায়ই আসতে হয় এখানে—জাহ্নবী দেবীকে সে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

এদিকে এসেছিলাম মা, তাই ভাবলাম কেমন আছেন খবরটা নিয়ে যাই।

বেশ করেছ। ডাব পাঠাও নি তো অনেক দিন বাবা। রণ্টু ডাব ডাব করে, বাজারে একটা ডাব চার আনা।

বিনয় হাঁ-হাঁ করে ওঠে, বাজারের কথা উঠছে কিসে? বাগানে কাঁদি-কাঁদি ডাব—রণ্টুরই তো সমস্ত। কি আশ্চর্য, পুলিনকে আমি পরশু দিনও বলেছি। পাঠায় নি? উদ্বাস্তুরা বাগানে এসে ঢুকেছে, তবে গাছগাছালির তারা ক্ষতি করে না। আচ্ছা মা, এক্ষুনি গিয়ে পুলিনকে বাগানে পাঠাচ্ছি ডাব পাড়াতে।

জাহ্নবী দেবী বললেন, ডাব পাড়িয়ে রেখে দিও। আমি তো ফি রবিবার দক্ষিণেশ্বর যাই। ফিরতি মুখে বাগান ঘুরে আসব না হয়।

বিনয় বলে, তা হলে তো ভালোই হয়। নানান কাজে পুলিন দিয়ে যেতে পারে না। ডাব পাড়া থাকবে,—এক কাঁদি দু-কাঁদি যা মোটরে ধরে নিয়ে আসবেন। এই তো ভালো। ফি রবিবারে ফিরতি পথে এক কাঁদি করে যদি নিয়ে আসেন হপ্তার খরচ হয়ে যায়।

আর ওদিকে ইন্দ্রজিৎ সোজা বোর্ডিংএ চলে গেছে। রণজিতের দুই মেয়ে মীরা-ধীরাকে ডাকিয়ে এনে বলে, বাগানে পিকনিকের কথা বলিস, তা আজ তো রবিবার আছে—

দু-বোনে নেচে উঠল: হ্যাঁ কাকামণি, আজকেই। চানটান করে আমরা তৈরি হয়ে নিই, জীপ নিয়ে তুমি চলে এসো।

ইন্দ্রজিৎ বলে, দুটো দুটো খেয়েও নিস বরঞ্চ। এখন এই এত বেলা হয়ে

গেছে—আমি ভাবছি, জেলে ডেকে ঝিলে জাল নামিয়ে দেব। মাছ ধরা দেখবি তোরা। তার পরে সেই মাছ রেঁধে খাওয়া-দাওয়া করতে সন্ধ্যা হয়ে আসবে। এ বেলার মতো বোর্ডিং থেকে খেয়ে যাবি।

সেই ভালো কাকামণি। খেয়েদেয়েই যাব আমরা। আমাদের বন্ধু আরও চার-পাঁচটা মেয়ে যাবে কিন্তু।

অতএব ইন্দ্রজিৎ জেলের সন্ধানে বেরুল। জেলে মিলল না। শেষ অবধি বাজারের মাছ কিনে মীরা-ধীরা ও আর চারটি মেয়ে নিয়ে ইন্দ্রজিতের জীপ অপরাহ্ণে বাগানবাড়ি পৌঁছল। জীপ দেখে রণজিৎ ব্যস্তসমস্ত হয়ে এলেন।

তোমরা ?

ইন্দ্রজিৎ বলে, রবিবার বলে মীরা-ধীরার বোর্ডিং-এ গিয়েছিলাম। তা এরা কিছুতে ছাড়ল না, বাগানে পিকনিক করবে। তোড়জোড় করে বেরুতে দেরি হয়ে গেল। কখন যে কি হবে, জানি নে।

অদূরে দালানের দিকে তাকিয়ে বলে, বিদেয় হয়েছে উদ্বাস্তু বেটারা ? উঃ, কী খাটনিটা যে যাচ্ছে আপনার দাদা ! দুটো দিন পাটনা থেকে এলেন, তা তিলার্ধ জিরোবার ফুরসত নেই। এই এক ছ্যাঁচড়া তালে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে।

মীরা বলে, বাবা, তুমি খাবে কিন্তু আমাদের সঙ্গে।

পাঞ্জাব-মেল ধরতে হবে যে আমায়। কাল মকদ্দমা।

তার মধ্যে রান্নাবান্না হয়ে যাবে। কত তাড়াতাড়ি রাঁধতে পারি, দেখিয়ে দেব। তুমি না খেলে হবেই না। কোন জায়গায় উনুন করা যায় বল তো কাকামণি ?

ধীরা বলে, দালানের রোয়াকে হলে কেমন হয় ? বনজঙ্গলে পোকামাকড়, বিষম নোংরা—খেতে আমার ঘেন্না করে।

রণজিৎ তাড়াতাড়ি বলেন, তবে আর বলছি কি ? দালান উদ্বাস্তুরা দখল করেছে। উঁহু, ওদের ধারে-কাছে যাবি নে তোরা। পদ্মাপারের গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক—কী জানি কি বলে বসবে।

ইন্দ্রজিৎ গর্জে ওঠে : ইঃ, আমার ভাইঝিদের বলবে ! আসুক দিকি বলতে—জিভ টেনে ছিঁড়ে নেব না ?

রণজিৎ বোঝাচ্ছেন, নাম হল যার বনভোজন—বনেই তো খেতে হয় রে !

বনজঙ্গলে ঘেন্না করিস তো বোর্ডিং-এর ডাইনিং রুম তো ভালো—বাগানে আসা কেন? উই যে পাঁচিলের ধারে জামরুলতলা—ঐ দিকে উনুন খুঁড়ে নিগে যা।

সন্ধ্যার কাছাকাছি দক্ষিণেশ্বর ফেরত জাহ্নবী দেবীর মোটর এসে পড়ল। দিদিমার সঙ্গে রুণ্টুও এসেছে।

বাবা ঐ যে। ও বাবা, বাবা গো, তুমি এখানে?

ছেলে ছুটে গিয়ে বাপের হাত জড়িয়ে ধরল।

জাহ্নবী দেবী বলেন, পুলিন কোথায় গো? ডাব পাড়িয়ে রাখবার কথা—ও পুলিন, ডাব আমার গাড়িতে তুলে দাও।

পুলিন বেকুব হয়ে বলে, গণ্ডগোলে হয়ে ওঠে নি। আজকে আবার এখানে বিয়ের ব্যাপার কিনা! একটুখানি বসুন মা, এক্ষুনি আমি পাড়ানি ডেকে আনছি।

ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে, রণজিৎ হাত ইশারায় ডাকলেন।

উঁহু, তুমি বেরুলে হবে না। দাঁড়াও, কাজ আছে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বললেন, পাড়ানি ডাকতে অন্য কাউকে পাঠাও। বিয়েটা তোমাকেই করতে হচ্ছে পুলিন।

পুলিন আকাশ থেকে পড়ে: বীণাকে আমি বিয়ে করব?

তা ছাড়া তো উপায় দেখি নে। মেয়ে ছুটো এসেছে, তাদের সঙ্গে ফাউ এসেছে, আরও এক গণ্ডা। শাশুড়ি এসেছেন। আমি বরাসনে বসতে গেলে গজকচ্ছপের লড়াই বেধে যাবে। মেয়ের আব্যুতিক হয়ে গেছে, বিয়ে না হলে ওরাও এখন ছেড়ে কথা কইবে না।

পুলিন বলে, ছোটবাবু স্বয়ং যখন উপস্থিত রয়েছেন, তাঁকে বাদ দেওয়াটা কেমন যেন লাগছে বড়বাবু।

রণজিৎ চটে উঠলেন: ঝামাপুকুরের এক শ ভরি সোনা, এক সেট জড়োয়া, নগদ আট হাজার—এই সমস্ত বাদ দিতে বলো তুমি?

পুলিন চুপ করে যায়। রণজিৎ একটুখানি ভেবে বলেন, বিনয়টা কাছাকাছি থাকলে বরং—উঁহু, তা-ও হবে না, তাকে নতুন কোলিয়ারিতে পাঠাব, বিয়ের রঙ্গে মাতলে এখন চলবে না। ভেবেচিন্তে দেখছি পুলিন, তুমি ছাড়া গতি নেই। গোধূলিও হয়ে এলো, মাথায় টোপর চড়িয়ে চট করে বসে পড়োগে।

পুলিন নিজের সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রণজিৎ গরম হয়ে বললেন, চাকরি রাখতে চাও তো কথা শোনো, গড়িমসি কোরো না।

পুলিন বলে, আজ্ঞে না—অন্য কিছু নয়। কাপড়খানা ছেঁড়া, জামাটাও বড্ড ময়লা।

সিল্কের জোড় কিনে এনেছি—তোমারই কপালে আছে। পরে ফেলগে যাও।

অশ্বিনীর কাছে গিয়ে রণজিৎ বললেন, আমায় ট্রেন ধরতে হবে, সময় নেই। কথাবার্তা যা হয়েছিল, তার নড়চড় হবে না। খরচপত্রের দু-হাজার টাকা, এই বাগানবাড়িতে বসবাস—সমস্ত ঠিক। বরটা শুধু পালটে যাচ্ছে—আমি নই, পুলিন। তা পুলিনের সঙ্গেই তো দহরম-মহরম আপনাদের।

অশ্বিনী বলেন, আমার মেয়েকে বাড়ি লিখে দেবার কথা—সেটার কি হবে বড়বাবু?

আর একবার রণজিৎ চতুর্দিক তাকিয়ে দেখলেন। মীরা-ধীরা ও তাদের সহপাঠিনী মেয়ে চারটি মহোৎসাহে রান্না চাপিয়েছে, ইন্দ্রজিৎ কাঠকুটোর যোগাড় দিচ্ছে। নারিকেলতলার ওদিকে শাশুড়ি ঠাকরুন ডাব পাড়াচ্ছেন। রণ্টু কোন দিক দিয়ে ছুটে এসে দু-হাতে আবার তাঁকে বেড় দিয়ে ধরল।

বিপন্ন রণজিৎ বলেন, আচ্ছা—দেখব সেটাও। কলকাতার বাড়ি না হোক, এই দমদমার দিকে ছোটখাট একটা-কিছু করে দেওয়া যাবে। পুলিন কাপড় বদলাতে গেছে। মন্তোর পড়তে লাগিয়ে দিয়ে আমি স্টেশনে রওনা হব। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না মশায়, কাজে লেগে যান।

যে আজ্ঞে—বলে অশ্বিনী তৎক্ষণাৎ বিয়ের ব্যবস্থায় ছুটলেন।

সিল্কের ধুতি পরে সিল্কের চাদর গায়ে জড়িয়ে পুলিন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সংক্ষিপ্ত বিয়ে; এই উদ্বাস্তু ক-ঘরের যে ক-টি মেয়ে, তাঁরাই শুধু আসবেন। শাঁখ বাজলে চলে আসবেন তাঁরা। বীণাকে দেখতে পেয়ে পুলিন বলে, বরের যে চন্দন-টন্দন মাখতে হয় গো! কে-ই বা দেয় মাখিয়ে!

বীণা বলে, আয়না ধরে যা-হোক করে সেরে নাও। আমি দিতে গেলে লোকে কি বলবে!

পুলিন সেটা প্রণিধান করে: তা বটে, তোমার নিজেরও তো সাজগোজের বাকি।

কাছে এসে চুপিচুপি বলে, এটা কি হল বল তো? কত বড় বড় সম্বন্ধ এলো—বিদ্যেয় বড়, নামে-ডাকে টাকা-পয়সায় বড়, গায়ে-গতরে বড়—সমস্ত বাতিল হয়ে গিয়ে সেই আমি!

বীণা মুখ বাঁকিয়ে বলে, কোনোটার টাক-মাথা, কোনোটার অসুরের চেহারা, কোনোটা বাঘের মতন হালুম-হুলুম করে—উঃ কী বাঁচাটাই বেঁচে গেলাম!

তবে আর অ্যাদ্দিন ধরে বারো ঘাটের জল ঘোলানো কেন? এ তো হাতের মুঠোয় ছিল।

বীণা মিষ্টি হেসে মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলে, নানান রকমের বর দেখে নিলাম। বর নয় ওরা, এক-একটা বাঁদর।

মনোজ বসুর

॥ উপন্যাস ॥

আগস্ট ১৯৪২   এক বিহঙ্গী

ওগো বধূ সুন্দরী   জলজঙ্গল

নবীন যাত্রা   বকুল

বাঁশের কেল্লা   বৃষ্টি বৃষ্টি

ভুলি নাই   শত্রুপক্ষের মেয়ে

সবুজ চিঠি   সৈনিক

॥ ভ্রমণকাহিনী ॥

সোবিয়েতের দেশে দেশে

চীন দেখে এলাম : দুই খণ্ড

পথ চলি

॥ নাটক ॥

রাখিবন্ধন   বিপর্যয়   নূতন প্রভাত

প্লাবন   বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং   শেষ লগ্ন

গল্প-সংগ্রহের পরবর্তী খণ্ডগুলি যন্ত্রস্থ